কলিকাতা দর্পণ

রাধারমণ মিত্র

কলিকাতা-দর্পণ ২

কলিকাতা-দর্পণ

দ্বিতীয় পর্ব

রাধারমণ মিত্র

২০০৪

সুবর্ণরেখা

কলকাতা

KOLIKATA-DARPAN
by Radharaman Mitra

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৩

সম্পাদনা : তরুণ পাইন

॥ মূল্য ১৬০.০০ টাকা॥

প্রচ্ছদপট : প্রবীর সেন

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার

সুবর্ণরেখা॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

মুদ্রক : ক্যালকাটা ব্লক অ্যান্ড প্রিন্ট, ৫২/২ শিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৪

অক্ষর বিন্যাস : সাধনা প্রেস, ৪৫/১ এফ, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা ৬

ভূমিকার পরিবর্তে

কলিকাতা দর্পণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময়ে কয়েকটি কথা মনে এল যা জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রকাশনা ও বই-ব্যবসার লোক হিসেবে আমার পরিচিতি ; এই সূত্রে বিদ্বান ও সমৃদ্ধ-মনের সান্নিধ্য পেয়েছি, বন্ধুত্বের সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। সুবর্ণরেখার এই ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুরনো-নতুন বইয়ের গাদায় যশস্বী, কৃতী কত মানুষ এসেছেন, আজও আসেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার অশেষ ঋণ। এসবের পরেও যখন কোনও বিশিষ্ট মানুষের কথা ওঠে, মনে পড়ে রাধারমণ মিত্রের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। কালের হাওয়ায় অনেক শব্দই তরল হয়ে গেছে, কিন্তু রাধারমণ মিত্র ছিলেন দেবদুর্লভ অনন্য গুণের অধিকারী এক সহজ, স্পষ্ট মানুষ। মিথ্যাকে মিথ্যা বলে ঘৃণা করতে দ্বিধা নেই তাঁর, সত্যকে গ্রহণ করেছেন নিজের জীবনের মূল্যে। অসমবয়েসি কোনও তরুণতরকে হৃদয়বত্তার জোরে সাথী করেছেন। বাল্য-কৈশোরের দারিদ্র্য তাঁকে ছেড়ে যায়নি কোনও দিনই, তা বলে স্বাচ্ছন্দ্যের সহজ পথও তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। নিজে তিনি যেমন বলেছিলেন, 'আমি কমিউনিস্ট হব না তো কে কমিউনিস্ট হবে? যারা নিঃস্ব, যারা সর্বহারা তারাই তো কমিউনিস্ট হয়। আমার চেয়ে সর্বহারা কে আছে?' আত্মপ্রচারের বিপরীতে এই ছিল তাঁর আত্মসম্মান — আর আমি এই মানুষটিকে দেখেছি। দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন তিনি (১৮৯৭-১৯৯২), তেমনই বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ। ইতিহাসের দায়বোধেই ভবিষ্যতে যোগ্যতর কোনও সন্ধানী-চিত্ত আসবেন যিনি শুধুমাত্র এই মানুষটিকে কেন্দ্র করে বাংলার তথা ভারতের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সময়-কথা রচনা করবেন।

নিজের কথা যে-সামান্য লিখেছেন সেখানেও নিজেকে প্রায়-গৌণে রেখে সমাজ ঘিরে ব্যক্তির কথা মুখ্য হয়ে উঠেছে। রাধারমণ মিত্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬-১৯৬৬)। বলতে গেলে নীরেন্দ্রনাথের পরিবারের অন্যতম ছিলেন তিনি। বন্ধুর প্রয়াণে রাধারমণ মিত্র যে-প্রয়াণলেখ রচনা করেন (পরিচয়, ৩৬ : ৫-৬ ; অগ্রহায়ণ-পৌষ. ১৩৭৩) তার মধ্যে অনেকটা পাওয়া যায় তাঁকে।

> নীরেন দর্জিপাড়ার যদু পণ্ডিতের বাংলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ মাইনর পাশ করে হিন্দু স্কুলে তখনকার চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। আমি পরের বছর ১৯১০ সালে শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল থেকে গিয়ে হিন্দু স্কুলে ভর্তি হই। সেই সময় থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় ক্রমে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হবার কারণ, সে তখন শুধু ইংরেজি নয়, ইওরোপীয় — ফরাসী, জার্মান, রুশ — সাহিত্য খুব পড়ত (আমিও পড়তাম)। সেইজন্য তার সঙ্গে আমার ভাবটা খুব বেশি জমে। কখনও সে আমাকে একখানা নতুন বই পড়তে দিত, কখনও কখনও একখানা বই দুজনে মিলে পড়তাম। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে ঐ সব বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হত। এইভাবে তিন বছর পরে ১৯১৩ সালে আমরা ম্যাট্রিক পাশ করলাম।
>
> ... আই.এ-তে তারও লজিক ছিল, আমারও ছিল। টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যাবার পর সে আমাকে বলে, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে লজিক পড় ত আমার খুব উপকার হয়।'

তার কথামতো আমি রোজ বিকেলে তার বাড়ি যেতাম ও দুজনে মিলে তিন-চার ঘণ্টা ধরে লজিক পড়তাম। আমার বিকেলের জলযোগ ওর ওখানেই হত। আমরা তিনমাসে কলেজের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকগুলি ত পড়লামই, পাঠ্যতালিকার বাইরেও অনেক বড় বড় লজিক [বই]... পড়ে ফেললাম, যেসব বড় একটা ছাত্ররা পড়ে না। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করবার পর তার সঙ্গে আমার আবার অনেকদিন পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। দেখা সাক্ষাৎ ক্বচিৎ কখনও হত।

এম. এ. পাশ করে সে বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হল। আমি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে গেলাম — অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলাম। পড়বার সময় কখনও ভাবতে পারিনি রাজনীতি করব, লেখক হব, এই ছিল আমাদের দুজনের জীবনের লক্ষ্য।

আমি অসহযোগ করি যুক্তপ্রদেশের এটোয়া জেলায়। একবছর শ্রীঘরে বাস করে ১৯২২ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ কলকাতায় ফিরে আসি। উদ্দেশ্য মহাত্মাজীর সবরমতি আশ্রমে যাব।

কলকাতায় এসে বড় মুস্কিলে পড়লাম। ট্যাঁকে মাত্র দু-তিন টাকা সম্বল। থাকবার জায়গা নেই, শোবার স্থান নেই। সমস্ত দিন অনাহারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পথের ধারের কলের জল খেয়ে খিদে মিটিয়ে রাত্তিরে শ্যামবাজারের এক উড়িয়ার দোকানে বড়জোর তিন-চার পয়সার রুটি খেয়ে যে-কোনও একটা বাড়ির রোয়াকে শুয়ে রাত কাটাই। সমস্ত দিন ঘুরিফিরি একটিও পরিচিত মুখ দেখতে পাই না। এমন সময় একদিন নীরেনের সঙ্গে দেখা। সে আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরল, দেখি তার সর্বাঙ্গে খদ্দর। সে আমাকে জোর করে তার বাড়ি নিয়ে গেল। ... আমার চেহারা দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল আমার অবস্থা। কোথায় থাকি, কী খাই ইত্যাদি প্রশ্নবাণে সে আমাকে জর্জরিত করল। আমি স্রেফ মিথ্যে কথা বললাম। বললাম, আমার থাকার জায়গা আছে, আহারেরও ব্যবস্থা আছে। সে কিন্তু বিশ্বাস করল না। সেদিন ত সে আমাকে ভূরিভোজন করালেই, অধিকন্তু রোজ দুবেলা তার ওখানে খেয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করল। আমি রাজি হলাম না। শেষে রফা হল আমি একবেলা দুপুরে তার বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসব।

তারপর সে যাত্রায় কলকাতায় যতদিন ছিলাম রোজ তার বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতাম। কিন্তু একবেলার আহারই এত বেশি পরিমাণে হত যে রাত্রে আমাকে বড় একটা রুটি কিনে খেতে হত না।...

যখন শুনল আমি গান্ধী আশ্রমে যেতে চাই, তখন সে নিজে থেকেই বলল, 'তুমি যেমন চেষ্টা করছ করো, আমি সুভাষকে [বসু] দিয়ে সবরমতি আশ্রমের পরিচালক মদনলাল গান্ধীকে একখানা চিঠি লেখাচ্ছি, যাতে তিনি তোমাকে আশ্রমে নেন।' এবং সে চিঠি লিখেও ছিল।...

আমি যখন আশ্রমে যাই তখন মহাত্মাজী জেলে। তাঁর সঙ্গ লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল না-হওয়াতে সাতমাস পরে আমি সেখান থেকে ফিরে আসি। এবার কলকাতায় এসে অপ্রত্যাশিতভাবে এক আশ্রয় মিলে গেল। নীরেনের দ্বারস্থ হতে হল না। তবে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতাম। মহাত্মাজীর জেল

থেকে খালাস পাবার পর দ্বিতীয়বার আশ্রমে যাই মহাত্মাজীর আহ্বানে। ... এবারে আশ্রমে দেড় বছরেরও কিছু বেশি কাল থেকে কলকাতায় ফিরি।...

...১৯২৯ ['২৮] সালে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পড়লাম। ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে কলকাতায় ফিরলাম। ... মিরাট থেকে ফেরবার পর যখনই তাতে আমাতে দেখা হয়েছে, দুজনার মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধেছে। আমি মার্কসবাদী, সে অরবিন্দ-ভক্ত। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনও জায়গায় আমাদের মিল ছিল না। আমি তাকে বোঝাতে পারতাম না, সেও আমাকে বোঝাতে পারত না। ...প্রত্যেকবার সাক্ষাতের পর একটা দারুণ অস্বস্তি নিয়ে দুজনেই আলাদা হতাম।...

কতদিন এই অবস্থায় কাটে মনে নেই। ... একদিন আমি আপিসে কাজ করছি। হঠাৎ নীরেন ঝড়ের মতো সেখানে উপস্থিত। ... ছুটির পর সে আমাকে বালীগঞ্জের বাড়িতে নিয়ে গেল। সে বলল, 'এই ক-বছর দিবারাত্র আমার নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। ... শিক্ষক যেমন ছাত্রকে পড়ায় সেই রকম করে তুমি আমাকে অ-আ-ক-খ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মার্কসীয় সাহিত্য পড়াও।'...

তারপর থেকে প্রতিদিন আমার আপিসের পর তার বাড়ি গিয়ে আমরা দুজনে মার্কসীয় সাহিত্য পড়তে লাগলাম। ...এইরকম করে—কতদিন ঠিক হিসেব নেই, তবে মনে হয় তিন-চার বছর ধরে — আমরা প্রতিদিন দুজনে মার্কসীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি।

শিল্প-সমালোচক, জনগণনা-শাস্ত্রের পুরোধা-পুরুষ অশোক মিত্র 'গুরু' সম্মানে রাধারমণ মিত্র সম্পর্কে 'তিন কুড়ি দশ' স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন :

...দুজন অনাত্মীয় ভদ্রলোক ছিলেন যাঁদের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল এবং যাঁরা আমার জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করেন। একজন ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টি অভ ইন্ডিয়ার নেতা বঙ্কিমচন্দ্র মুখুয্যে ... দ্বিতীয় ব্যক্তি রাধারমণ মিত্র। ১৯২৮ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় [রাধারমণবাবু] অভিযুক্ত হ'ন, পরে বিচারে খালাস পান। বাঙালীদের মধ্যে অত ভাল ও অনর্গল উর্দু বলতে আমি আর কারোকে শুনিনি।... রাধারমণবাবু তখনও ছিলেন যেমন রোগা, তেমনি ক্ষিপ্রস্বভাব। নাক-মুখ-চোখ দেখে মনে হতো মিশুকে বাজপাখি বিশেষ, স্বভাব ছিল ক্ষিপ্রগতি শিকারী শ্বাপদের। কথাবার্তায় যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি তর্কে পটু, বাজে কথা সহ্য করতে মোটেই রাজি নন। ...বাংলা উচ্চারণ ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি মিষ্টি ছিল তাঁর দানাদার গলা...। রাধারমণবাবুর আলোচনার বিষয় ছিল মার্কসীয় তত্ত্ব, ...মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে আমাকে একটি পুরো পাঠ্যতালিকা করে দেন। লেফ্‌ট বুক ক্লাব থেকে পরে যখন এমিল বার্নসের হ্যান্ডবুক অভ মার্কসিজম বের হয়, তার সঙ্গে তালিকার অনেক মিল ছিল। এখনও পর্যন্ত আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার যত না শিক্ষকের তা থেকে অনেক বেশি বন্ধুর মতো। আমি যে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি সে বিষয়ে বঙ্কিমবাবু বা রাধারমণবাবু কোনোদিন কটাক্ষ করেননি। ...

১৯৪২-এর ২২ নভেম্বরে ... রাধারমণ মিত্র কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে মুন্সীগঞ্জে

এলেন। যে কয়দিন আমার কাছে ছিলেন ... সারাক্ষণ গল্পগুজব করে ... কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের অনেক কথা জানতে পারি, আর শুনি গঙ্গাধর অধিকারী, অজয় ঘোষ, এস.জি.সরদেশাই, সাজ্জাদ জহির প্রমুখ নেতাদের গল্প, তদুপরি রাধারমণবাবুর নিজের কারাগারের অভিজ্ঞতার কথা। আমার দুর্ভাগ্য, তাঁর জন্মদিনে গত বছর (১৯৯২) থেকে আমি আর তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আসতে পারি না।

প্রায় একটি বিশিষ্ট শতাব্দীর বয়স তিনি পেয়েছিলেন। বিশ শতকের ভাঙা-গড়ার পুরোটা তাঁর জীবনকালেই ঘটেছে। এই শতাব্দীর প্রজ্ঞার আলোক আর প্রজ্ঞাহীনতার অন্ধকার দুদিকের সাক্ষী ছিলেন রাধারমণ মিত্র। তাঁর কাছে মার্কসবাদের পাঠ নিয়েছেন কত মানুষ, সেই মানুষই নিজে ১৯৫২ সালে পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। রাধারমণ মিত্র ছিয়ানব্বই বছর বয়সে ১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা শহরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'কলিকাতা দর্পণ' তাঁকে এক বিশেষ পরিচিতি দিয়েছিল, স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের কাছে তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য নাম — যিনি কলকাতার ইতিহাসের সবকিছু নখদর্পণে জানেন। 'এক্ষণ'-এ প্রকাশের সময় থেকেই, পরে বইয়ের চেহারায় প্রকাশিত হলে গবেষক-পাঠকদের জগতে 'কলকাতা' বিষয়রূপে ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসায় নতুন মাত্রা যোগ করে, 'কলিকাতা দর্পণ' হয়ে দাঁড়ায় অপরিহার্য আকরসূত্র।

সুবর্ণরেখার এই ঘরই ছিল 'এক্ষণ' পত্রিকার সব। এমনও দিন গেছে একই চেয়ারে সময় ভাগ করে নিয়ে কাজ চালিয়েছি নির্মাল্যবাবুর সঙ্গে। ১৯৯৫-তে নির্মাল্য আচার্য আমাদের ছেড়ে চলে যান। বন্ধু, সহচর নির্মাল্যবাবুর মৃত্যুতে নিজে খুব অসহায় বোধ করি। 'কলিকাতা দর্পণ'-এর প্রথম খণ্ডের সম্পাদনা-সহ সমস্ত কাজ রাধারমণদার সঙ্গে বসে নির্মাল্যবাবু করে দিয়েছিলেন, আমি ছিলাম প্রকাশক মাত্র। এই ঘরেই ওঁরা দুজন প্রুফ দেখছেন, জিজ্ঞাসাবাদ করে একে-একে সংশোধন করে নিচ্ছেন — এ যেন আজও দেখতে পাই। দ্বিতীয় খণ্ডের আঙ্গিক, বিন্যাসে তাই কোনও হেরফের করা হয়নি, শুধুমাত্র হরফের প্রযুক্তি বদলে গেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রস্তুতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লেখক নিজেই, লিখিতভাবে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়। শুধুমাত্র একটি লেখা, 'বাগানবাড়ি', 'এক্ষণ'-এ প্রকাশিত হয়। কোনও সন্ধানেই পাওয়া যায়নি কোনও খসড়া-রচনা, নোটস, যা-কিনা দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিতে পারে। নাম ও ব্যুৎপত্তি নিয়ে তর্ক-বিতর্কের চিঠিপত্র 'এক্ষণ'-এর দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, ইতোমধ্যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় সেগুলো অন্তর্ভুক্তি পায়নি। এই বিতর্কে আমাদের অজানা অনেক কিছু উঠে এসেছিল একদিন, পাঠককে সেই জ্ঞানসমৃদ্ধ বিতর্ক থেকে বঞ্চিত করা অন্যায় হবে, উপরন্তু 'কলিকাতা দর্পণ'-এর কলিকাতা নাম রহস্য বিতর্ক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল ও আজও নাম বিতর্কের পাশাপাশি ঝালিয়ে নেয়া জরুরি। এই বিতর্কই দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব। তিনি জন্মেছিলেন এই শহরে, শহরের রূপ তখন কিশোরীর চেহারায় ; দিনে-দিনে সে-শহরের শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-রং-রূপ বদ্‌লে যেতে থাকে, মৃত্যুও তাঁর এই শহরেই — শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃততর যেন অন্য শহরের অন্য মন। রাধারমণ মিত্র আজন্ম এই শহরের বিচিত্র পথে পরিব্রাজক ছিলেন, 'দর্পণ'-এ তার বাঙ্ময় রূপ দেখি আজও। দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের সম্পূরক বলা ভালো। এখানে নাম বিতর্কই নয়, কলকাতার মনীষী, কলকাতার বাগানবাড়ি,

ঘরদুয়ার নিয়ে পরিচিত রাধারমণ মিত্রের নিজের জগৎ। মৃত্যুতক্ তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন তথ্যের সত্যে ; জানা-বিষয়কেও যুক্তির শৃঙ্খলায়, সত্যে যাচাই করে নিয়েছেন বারেবারে — কোনও সংকীর্ণ গোঁড়ামিকে প্রশয় দেননি কখনও। গদ্যরীতিতে সাধু-চলিত ছাড়া আর কোনও তফাত নেই ; প্রথম পর্বে এখনকার বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে বিতর্কগুলি চিঠির আকারে প্রকাশিত বলে বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে যতিচিহ্নের হেরফের করা হয়েছে মাত্র। আর পশ্চিমবঙ্গ বা অবিভক্ত বাংলা বোঝাতে বাংলাদেশ এই বানান রাখা হয়েছে। তাঁর রচনায় পরিচিত, রোজকার চেনা কিছুও যেমন নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়, ভাবায় — এই খণ্ডেও তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

কলিকাতা দর্পণ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের শুধু সময়ের ব্যবধান নয়, একটিমাত্র বই ঘিরে, মানুষটিকে ভালোবেসে কত মানুষের সদিচ্ছা থাকে ভাবলে বিস্মিত হতে হয় ; প্রথম খণ্ডের কালে যারা কৈশোর-উত্তীর্ণ যুবক আজ তারা প্রৌঢ়, আবার মৃত্যু এসে নিয়ে গেছে এই বইয়ের শুভার্থীদের। নিজে বিশ্বাস করি, অনেক বদলের পরেও কলকাতা থাকবে তার মানুষজন নিয়ে নতুন কালের কাছে, তবুও রয়ে যাবে এই শহরের হেঁয়ালি ; আর সেদিনও এই বই ঘিরে শহুরে-কথার নতুন শুরু হবে — শহরটাকে চিনে-চিনে, চিনে নেওয়ার জিজ্ঞাসায় রাধারমণ মিত্র যেমন পরিব্রাজক হয়েছিলেন, সেভাবেই ভবিষ্যতের কোনও পাঠকও হেঁটে ফিরবেন এই শহরের গলিপথে ছায়াতে-আলোতে। দোল পূর্ণিমা ১৪০৯

ইন্দ্রনাথ মজুমদার

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

সূচিপত্র

প্র থ ম প র্ব

উৎসর্গ

সমস্ত কলকাতা প্রেমিককে

কলিকাতা-দর্পণ ২

প্রথম পর্ব

শারদীয়া "এক্ষণ" পত্রিকার জন্য রাধারমণ মিত্রের অনুলেখন লিখছেন সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য।
সুবর্ণরেখা প্রকাশনা দপ্তরে ১লা আগস্ট, ১৯৭৬, রবিবার।
ছবি মোনা চৌধুরী
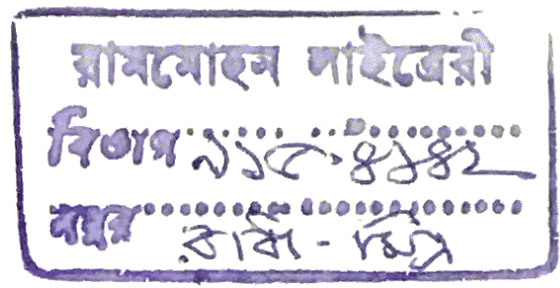
কলকাতার বাড়ি, বাগান ও বাগানবাড়ি

পার্সিবাগান

৯২ লোয়ার সার্কুলার রোড

পার্সিবাগান এখন আর নেই। সেই জায়গায় হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ। এই কলেজের উত্তর গা দিয়ে যে-একটি সরু গলি পশ্চিমে চলে গেছে তার নাম কিন্তু পার্সিবাগান লেন। এই গলি এখনও সেই পার্সিবাগানের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে। এই গলির ভেতর রাজশেখর বসু ও ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর বাড়ি আছে।

পার্সিবাগান নাম হবার কারণ এই যে কলকাতার সবচেয়ে ধনী পার্সি সদাগর রুস্তমজী কাওয়াসজী বানাজী এই বাগানবাড়ি করেছিলেন নিজে থাকবার জন্য। সুরম্য বাগানের মধ্যে প্রাসাদতুল্য বাড়ি। তৈরি হয় ১৮৩৯ সালে। তখন আপার সার্কুলার রোডকে বলা হতো নর্দার্ন সার্কুলার রোড। গৃহপ্রবেশের দিন রুস্তমজী একটি এলাহি রকমের ইংরেজি বল-নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বয়ং গর্ভনর-জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই বাড়ি থেকেই কাওয়াসজী তাঁর অজগর বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। এই বাড়িতেই তিনি মারা যান ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর নামে কলকাতায় দুটি রাস্তা আছে — একটি উত্তর কলকাতায় কাশীপুরে রুস্তমজী পার্সি রোড, আর-একটি দক্ষিণ কলকাতায় বালিগঞ্জে রুস্তমজী স্ট্রিট।

রুস্তমজী কাওয়াসজী মারা যাবার পর তাঁর পুত্র মানেকজী রুস্তমজী এই বাড়িতে বাস করেন। এখান থেকেই তিনি পৈতৃক ব্যবসা চালাতেন। ইনি প্রথম ভারতীয় যিনি কলকাতার 'শেরিফ' হয়েছিলেন ১৮৭৪ সালে। তার চার বছর আগে ১৮৭০ সালে তিনি পারস্যের 'কনসাল' হয়েছিলেন। বোধ হয় এই সময়েই তিনি এই বাগানবাড়ি ছেড়ে দিয়ে সাহেবপাড়ায় বাস করতে যান। কলকাতার পার্সি ভদ্রলোকেরা বলেন এই মানেকজী রুস্তমজী পার্সির নামেই পার্সিবাগানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নাম হয়েছে 'মানিকতলা'।

হিন্দু বা জাতীয় মেলা ১৮৬৭ সালে আরম্ভ হয়ে ১৮৭৩ পর্যন্ত কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠে বেলগেছিয়া, কাশীপুর, নৈনান প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন বড়লোকের বাগানবাড়িতে হয়েছিল। ১৮৭৪ সালে সর্বপ্রথম এই মেলা কলকাতার ভেতরে পার্সিবাগানে হয়। এটি ছিল মেলার অষ্টম অধিবেশন। মেলা হয় পাঁচদিন — ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি। তখন পার্সিবাগান খালি।

কিন্তু আট আনা দিয়ে টিকিট কিনে ঢোকবার নিয়ম হওয়াতে অন্যান্য বারের মতো এবার তত ভিড় হয়নি।

এর পরের বছর ১৮৭৫ সালেও হিন্দু মেলা বসে পার্সিবাগানে। এটি ছিল নবম অধিবেশন। এবার টিকিটের বালাই না-থাকায় বহু লোকসমাগম হয়েছিল। এবারে মেলা বসে ৫ দিন — ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি। এই মেলায় সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বাবু (পরে ক্যাপটেন) জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আধমণ ওজনের একটি প্রকাণ্ড লোহার গোলা উপরে ছুঁড়ে দিয়ে বার বার দুই হাতের মাংসপেশির উপরে ধরেছিলেন। যশোর জেলার নড়ালের জমিদার বাবু রাইচরণ রায় ছেলেবেলা থেকে ব্যায়াম করে তরোয়াল দিয়ে মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে লড়াই করে অন্তত দেড়শো বাঘ মেরেছিলেন। তাঁকে সভাপতি একটি সোনার মেডেল দেন। বরোদার মহারাজের সভাগায়ক মৌজাবক্স গান করে সকলকে মুগ্ধ করেন। তিনিও একটি সোনার মেডেল পান।

এই মেলায় ১৪ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে তাঁর নিজের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এই মেলার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সাহিত্যিক মন্মথ ঘোষের পিতা অতুলচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

পরের বছর ১৮৭৬ সালে পটলডাঙার বিখ্যাত বসুমল্লিক বংশের দীননাথ বসুমল্লিক পার্সিবাগান কিনে সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে কিছু বোঝা যাবে না। তাই এই বংশের একটু ইতিহাস বলা দরকার।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাধানাথ বসুমল্লিকের চার পুত্র — জয়গোপাল, দ্বারিকানাথ, দীননাথ ও শ্রীগোপাল। জয়গোপাল প্রবোধচন্দ্র, মন্মথনাথ ও হেমচন্দ্র নামে তিন নাবালক পুত্র রেখে ১৮৫৯ সালে মারা যান। প্রবোধচন্দ্রেরই পুত্র 'রাজা' সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক। জয়গোপাল মারা গেলে দ্বারিকানাথ সংসারের কর্তা হয়ে তিন ভাইপোকে মানুষ করতে থাকেন।

ক্রমে সংসার খুব বড় হয়ে পড়ে। সকলের সন্তানসন্ততি নিয়ে একত্রে বাস করা আর সম্ভবপর হয় না। তৃতীয় ভাই দীননাথ সাহেবি ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ১৮৭২ সালে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা জানান। আপসেই সব সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়া সাব্যস্ত হয়। কিন্তু বড় ভাইয়ের তিন ছেলে তখনও নাবালক। কোর্ট থেকে হুকুম না-হলে নাবালকের সম্পত্তি ভাগ হতে পারে না। সেইজন্য ১৮৭১ সালে দীননাথ বাদী হয়ে যৌথ সম্পত্তি ভাগ করবার জন্য দ্বারিকানাথ, শ্রীগোপাল, প্রবোধচন্দ্র, মন্মথনাথ ও হেমচন্দ্রের নামে হাইকোর্টে আর্জি দাখিল করে। হাই-কোর্ট থেকে দ্বারিকানাথ নাবালকদের গার্জেন ও সকল যৌথ সম্পত্তির 'রিসিভার' নিযুক্ত হন। ১.৯.১৮৭৩ তারিখের একটি আদেশে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা দিগম্বর মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল 'কমিশনার্স অফ পার্টিশন' নিযুক্ত হন। এঁরা ২১.৮.১৮৭৫ তারিখে রাধানাথ মল্লিকের সমস্ত সম্পত্তি চারভাগে ভাগ করে দেন।

১৮৭৬ সাল থেকে একান্নবর্তী পরিবার পৃথক হয়ে যায়। ওই সালে যৌথ পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেলে দীননাথ পার্সিবাগানের বড় বাগান-সমেত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা খরিদ করে সেখানে গিয়ে বাস করেন। তিনি শৌখিন লোক ছিলেন, ঘোড়াগাড়ির বিশেষ শখ ছিল। ভালো ভালো ওয়েলার ঘোড়া ও মূল্যবান অনেক গাড়ি খরিদ করেন। নিজে খুব ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারতেন।

দীননাথ পার্সিবাগানের বাড়ি বহুমূল্য আসবাবপত্র দিয়ে খুব পরিপাটি করে সাজান। ইটালি থেকে প্রসিদ্ধ শিল্পীদের তৈরি অনেকগুলি মার্বেল পাথরের মূর্তি এনে বাড়ি সাজান এবং গ্লাসগো থেকে লোহার বারান্দা ও দরদালানের কারুকার্যময় ফ্রেম সকল তৈরি করিয়ে আনিয়ে ঠাকুরবাড়ির চারিদিক ও বাগানের দক্ষিণ দিকে বসিয়ে এক অভিনব প্রণালীতে পূজার দালান ও বারান্দা তৈরি করিয়েছিলেন। এ-রকমটা তখন কলকাতার কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে দেখা যেত না। বাড়ির পশ্চিম-উত্তর জমিতে অনেক দামী ফলফুলের গাছ দিয়ে একটি বড় সুন্দর বাগান করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর বাড়ি কলকাতার মধ্যে একখানি প্রসিদ্ধ বাড়ি ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সেই বাড়ি দেখতে যেতেন।

কাছেই বিদ্যাসাগর মশাই থাকতেন। তাঁর সঙ্গে দীননাথের খুব ভাব ছিল।

'স্পিরিচুয়ালিজম' বিষয়ে দীননাথের কৌতূহল ছিল। আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্পিরিচুয়ালিস্ট মিডিয়ম এগলিন্ট সাহেব ১৮৮১ সনে কলকাতায় এসে যে-কয়টি জায়গায় তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ দেখান তার মধ্যে দীননাথের বাড়ি একটি। দীননাথ গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন — ইংরেজি আদব-কায়দায় চলতেন। শেষ জীবনে কাশীপুর-নিবাসী মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী তান্ত্রিক সাধকের শিষ্য হয়ে যোগাভ্যাস করতে আরম্ভ করেন। ১৬.৫.১৮৯০ তারিখে মারা যান।

দীননাথের দুই পুত্র — নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক। নগেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ও দেহকান্তি সুন্দর ছিল। তিনি শৈশব থেকেই অত্যন্ত সাহেবি মেজাজের লোক ছিলেন। প্রত্যহ সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। তিনি 'ভারত সংগীত সমাজ'-এর সভ্য ছিলেন।

১৮৯৪ সালে নগেন্দ্র ও যোগেন্দ্র দুই ভাইয়ে আপসে পৈতৃক সকল সম্পত্তি ভাগ করে নেন। পার্সিবাগানের বাড়ি কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করেন। ১৩.৭.১৮৯৪ থেকে নগেন্দ্রনাথ সপরিবারে ৩৫ ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে থাকেন। যোগেন্দ্রনাথ ১৬ হরি ঘোষের স্ট্রিটের বাড়িতে শেষ জীবন কাটান। তিনি পণ্ডিত রেখে ভালো করে সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। ২০.১০.১৯০২ তারিখে এলাহাবাদের ২১ এগমন্টন রোডের বাড়িতে মারা যান।

বিবাহের পূর্বে ইন্দিরা দেবী বালিগঞ্জ থেকে ১৭.৯.১৮৯৮ তারিখে প্রমথ চৌধুরীকে ভাগলপুরে লিখেছিলেন :

> কাল ওঁরা (অর্থাৎ মায়েরা — রা. মি.) একদল... একটা কি প্রকাণ্ড বাড়ি দেখতে গিয়েছিলেন —পার্সিবাগান — নামটা অনেকদিন থেকে শুনে আসছি, কিন্তু কখনো দেখিনি। শুনলুম খুব জাঁকালো মস্ত ব্যাপার, যদিও অযত্নে পড়ে আছে — ঘরের অবধি নেই, সর্বত্র মার্বেল পাথর বসানো, কেতাদুরস্ত বাগান, ফোয়ারা, ফুলের গাছ ইত্যাদি যেমন বাদশাহী কাণ্ড হতে হয়!

ওই চিঠির জবাবে ভাগলপুর থেকে ১৯.৯.১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন :

> নগেনবাবুর (নগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক — রা. মি.) কাছে শুনেছি যে পার্সিবাগানে বহুতর মুসলমানের প্রেতাত্মা বহুদিন ধরে বসবাস করে আসছে। নগেনবাবুর পিতা বাড়িটি কিনে অনেক কষ্টে তাদের সঙ্গে বনিবনাও করে নিয়েছিলেন। তাঁকে ঐ বাড়ির গুণে ক্রমে Theosophist এবং Spiritualist হতে হয়েছিল। কালীকৃষ্ণবাবু (কালীকৃষ্ণ

ঠাকুর — রা. মি.) না জেনে শুনে বাড়ি কিনে ঠকেছেন। তাঁর মেয়ে-জামাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। তাঁদের নতুন বাড়িতে গিয়ে একটি ছেলে মারা যায়। তারপর কালীকৃষ্ণবাবু বাড়িটি হাত থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেন — কিন্তু নগেনবাবু ছাড়া আর খরিদ্দার পেলেন না। ... নগেনবাবু (আজকাল সংগীত সভার বাল্মীকি) বলেন তিনি ছাড়া ও বাড়িতে আর কেউ থাকতে পারবে না।

চিঠিটি ব্যঙ্গচ্ছলে লেখা। এরপর দশ-বারো বছর আর পার্সিবাগানের নাম শোনা যায় না। ১৯০৬ সালের ২৫ জুলাই পার্সিবাগান শুধু দেশবাসীর নজরে এল না, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করল। কিন্তু সে-ঘটনা দু'এক কথায় সারা যাবে না। একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার।

লর্ড কার্জন ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশনের রিপোর্ট বেরোয় ওই সালের জুন মাসে। ২১.৩.১৯০৪-এ এই কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের রিপোর্টের ভিত্তিতে, কমিশনের একমাত্র হিন্দু সদস্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী মত অগ্রাহ্য করে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়। এই আইন দ্বারা দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে বিদেশি সরকার নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করবার দুরভিসন্ধি করেছেন ভেবে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও নেতৃবর্গ এর বিরোধী হন।

১৬.১০.১৯০৫ তারিখে কার্জনের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হল। অর্থাৎ এক অখণ্ড বঙ্গদেশকে ভেঙে দুই বঙ্গ করা হল — দ্বিতীয় বঙ্গ হল পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও অসম প্রদেশ নিয়ে।

তার ৬ দিন আগে ১০.১০.১৯০৫-এ বাংলা গভর্নমেন্টের প্রধান সচিব আর. ডবল্যু. কারলাইল দার্জিলিং থেকে এক গোপন সার্কুলার পাঠান প্রত্যেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটরের কাছে। তাতে তিনি নির্দেশ দেন তাঁরা যেন স্ব-স্ব জেলার স্কুল-কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক সভাসমিতিতে, বিশেষ করে (বিলাতী পণ্য) 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' সভ্য-সমিতিতে যোগ দিতে ও পিকেটিং করতে নিষেধ করেন এবং নিষেধ না-মানলে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এই গোপন সার্কুলারের নাম 'কারলাইল সার্কুলার'। এই সার্কুলারটি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা প্রকাশ করে ২২.১০.১৯০৫ তারিখে, বঙ্গভঙ্গের পর।

এই গোপন সার্কুলার অনুসারে জেলায় জেলায় স্কুল-কলেজের বিরুদ্ধে নিগ্রহ অভিযান শুরু হল। হুকুম অমান্য করার জন্য তাদের ওপরে জরিমানা, তাদের স্কুল থেকে বহিষ্কার, এমনকী স্কুলের শিক্ষকদের পর্যন্ত বিতাড়ন সোৎসাহে চলতে লাগল।

রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল, মাদারিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁর স্কুলের এক ছাত্রকে বেত মারতে অস্বীকার করলেন পূর্ববঙ্গ-অসমের ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের আদেশ অগ্রাহ্য ক'রে।

১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট-নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকার। এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র — কারো সে-বছরে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেই এম. এ. পরীক্ষা, কারো-বা পি. আর. এস. (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি) পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। তাঁরা বললেন তাঁরা কেউ পরীক্ষা দেবেন না।

২৪.১০.১৯০৫ তারিখে একটা বড় সভা ডেকে নেতারা কারলাইল সার্কুলারকে সমালোচনা করে স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বললেন। পরের দিন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন।

৪.১১.১৯০৫ কলকাতায় ছাত্রদের এক বিরাট সভায় কারলাইল সার্কুলার বিরোধী সমিতি (Anti-Circular Society) স্থাপিত হল।

৫.১১.১৯০৫ 'ডন' সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে ও আসন্ন সমস্ত পরীক্ষা বর্জন করতে উপদেশ দিলেন।

৯.১১.১৯০৫ তারিখে এক সভায় সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক বাংলা দেশে এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা দেবেন বলে ঘোষণা করলেন।

১০.১১.১৯০৫ তারিখে আর-এক সভায় বিপিনচন্দ্র পাল ঘোষণা করেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জনৈক জমিদার বন্ধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। তিনি ময়মনসিং গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

১১.১১.১৯০৫ তারিখে কলেজ স্কোয়ারে দশ হাজার ছাত্রের সভায় সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী ও অন্যান্য নেতারা শীঘ্র এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন।

১২.১১.১৯০৫ তারিখে ভগিনী নিবেদিতা 'বর্তমান সংকট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৬.১১.১৯০৫ তারিখে ৫২/৪ পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত জমিদার-সভার গৃহে এক শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা দেশের সমস্ত নেতা উপস্থিত হয়ে একটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই পরিষদ জাতীয় ভিত্তিতে এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রণে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি (Technical)—এই ত্রিবিধ শিক্ষা সংগঠন করবে। এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে সুবোধচন্দ্র মল্লিকের প্রতিশ্রুত একলক্ষ টাকা ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ৫ লক্ষ টাকা ছাড়াও এক তৃতীয় জমিদার (ময়মনসিং মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য) নগদ দুই লক্ষ টাকা ও অনেকখানি জমি-সমেত একটি প্রকাণ্ড বাড়ি দান করতে স্বীকার করেছেন।

১১.৩.১৯০৬-এ পার্ক স্ট্রিটের জমিদার-সভা ভবনে ৯২ জন সদস্য সম্মিলিত এক জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Eduction) গঠিত হয়।

১৪.৮.১৯০৬ তারিখে কলকাতা টাউন হলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের এক সভায় কলকাতার বঙ্গীয় জাতীয় মহাবিদ্যালয় (কলেজ) ও বিদ্যালয় (স্কুল) স্থাপিত হয়। এই সভায় সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ ঘোষণা করেন যে ময়মনসিং-এর মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুরের কাছ থেকে আরো কিছু সাহায্য পাওয়া গেছে। তিনি পরিষদকে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের এক ভূসম্পত্তি দিতে রাজি হয়েছেন, যার বার্ষিক উপস্বত্ব ১০ হাজার টাকার কম নয়।

আরো ঘোষণা করা হয় যে পরিষদ কয়েকজন ব্যক্তির কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য মাসিক চাঁদা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবদ্দশায় মাসে ৫০ টাকা করে দিয়ে যাবেন, ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী যতদিন আইন ব্যবসা করবেন মাসে মাসে ২৫০ টাকা করে দেবেন। দুই সম্পাদক — আশুতোষ চৌধুরী ও হীরেন দত্ত — প্রত্যেকে মাসে ২৫০ টাকা করে দিয়ে যাবেন, প্রথমজন দশ বছরের জন্য, দ্বিতীয়জন যতদিন অ্যাটর্নিগিরি করবেন ততদিন।

বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও স্কুল ১৫ আগস্ট ১৯০৫ থেকে কার্য আরম্ভ করে ১৯১/১ বৌবাজার স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে।

সব জাতীয় নেতাই যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামগ্রিকভাবে বর্জন করবার পক্ষে ছিলেন তা নয়। নেতাদের মধ্যে দুটি দল ছিল — চরমপন্থী ও নরমপন্থী। চরমপন্থী দলের শীর্ষে ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন। এঁদের অন্বিষ্ট ছিল সামগ্রিক ত্রিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা — সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত (কারিগরি) — আলাদা আলাদাভাবে নয়, মিলিতভাবে, তিনের সমন্বয়ে। নরমপন্থী দলের শীর্ষে ছিলেন তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, নীলরতন সরকার, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং আরো কয়েকজন। এঁরা চাইতেন বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী, যার অতিরিক্ত ঝোঁক শুধু সাহিত্যপাঠের দিকে, তার পাশাপাশি এবং তার পরিপূরক রূপে কারিগরি শিক্ষার বিধিমতো ব্যবস্থা।

১১.৩.১৯০৬ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন এই দুই বিপরীত মতবাদ বা আদর্শ তীব্র আকার ধারণ করে, যার ফলে দলের মধ্যে ভাঙন ধরে। তারকনাথ পালিত, যিনি ১৬ নভেম্বর ১৯০৫ থেকে পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রস্তাবিত ত্রিমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তার ফলে যে ৯২ জনকে নিয়ে শিক্ষা-পরিষদ গঠিত হল তার মধ্যে তাঁকে সদস্য হিসেবে নেওয়া হল না। তিনি তৎক্ষণাৎ একটা স্বতন্ত্র, শুধুমাত্র কারিগরি (টেকনিক্যাল) শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করবার ভার নিলেন। যেদিন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ রেজিস্ট্রি করা হল ঠিক সেই দিনটিতেই (৯ জুন ১৯০৬) তারকনাথ পালিত এবং অন্যান্যরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা গঠন করলেন 'কারিগরি শিক্ষা প্রসার সমিতি' (Society for the Promotion of Technical Education) নামে। রাসবিহারী ঘোষ, যিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন, তিনি কারিগরি শিক্ষা প্রসার সমিতিরও সভাপতি হলেন। অনেক নেতা দুটো সংস্থারই সদস্য ছিলেন। প্রথম সংস্থাটি (জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ) বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করল ১৪ আগস্ট ১৯০৬ তারিখে এবং দ্বিতীয় সংস্থাটি (কারিগরি শিক্ষা প্রসার সমিতি) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করল তার ক'দিন আগে, ২৫ জুলাই ১৯০৬ তারিখে।

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট মাসে ৩০০ টাকার কিছু বেশি ভাড়ায় ৯২ আপার সার্কুলার রোডের বাগানবাড়ি, অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য পার্সিবাগান নিয়ে কাজ আরম্ভ করল। শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন — অধ্যক্ষ : প্রমথনাথ বসু (১৯০৬-১৯০৮)। তারপর অধ্যক্ষ হন শরৎকুমার দত্ত (ইনি প্রথম ভারতবাসী যিনি তৎকালিক ইয়োরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় শারলটেনবুর্গের টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে পাশ করেন) — জুলাই ১৯০৯ থেকে জুলাই ১৯১০ পর্যন্ত।

অধ্যাপকবৃন্দ : জে. কে. দাশগুপ্ত, মেকানিকল্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ; সি. এফ. বোয়াক, মার্টিন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ; মন্মথ রায়, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ; সত্যসুন্দর দেব, জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ, ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কসের ভারপ্রাপ্ত — মৃৎশিল্প (Ceramics) ; জে. আর. কুল, ব্যবহারিক রসায়ন বিশেষজ্ঞ ফরাসি, চামড়া ট্যান করা ; জি. সি. সেন, ব্লিচিং ও ক্যালিকো প্রিন্টিং (কাপড় ধোলাই ও কাপড়ে ছাপ দেওয়া) ; সুশীলচন্দ্র

চক্রবর্তী এবং সুরেন্দ্রমাধব মল্লিক — পদার্থবিদ্যা ও গণিত ; জ্যোতিষচন্দ্র বোস — রসায়ন ; কৃষ্ণচন্দ্র সমাদ্দার — ভূবিদ্যা ও খনিজবিদ্যা (জিয়োলজি ও মিনারেল) ; বি. বি. জি. রানাডে কারখানা, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ; মদনমোহন দত্ত — রসায়নের অধ্যাপক এবং জি. ডবলু ডেভিস — স্মিথি ও ফিটিং-এর অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট ত্যাগ করে চলে গেলে তাঁদের জায়গায় বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের দুজন নামকরা গ্র্যাজুয়েটকে নিযুক্ত করা হয় — হৃদয়চন্দ্র বোস, এল. এম. ই এবং অজিতমোহন ঘোষ, এল. এম. ই।

১৯০৯ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৪।

১৯০৬ থেকে ১৯১০ — এই চার বছর জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ও কারিগরি শিক্ষা প্রসার সমিতির মধ্যে খালি ধস্তাধস্তিতেই কেটেছে। গভর্নমেন্টের শিক্ষাবিভাগ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কী রকম হওয়া উচিত এই নিয়ে ধস্তাধস্তি। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নিতে চেয়েছিল। কারিগরি শিক্ষা প্রসার সমিতি মাত্র কারিগরি শিক্ষা দিতে চেয়েছিল — যে-শিক্ষা সরকারি শিক্ষাবিভাগ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই অগ্রাহ্য করে এসেছে। শেষ পর্যন্ত ১৯১০ সালে এই ধস্তাধস্তির অবসান হল কারিগরি শিক্ষা প্রসার সমিতি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়ে। মিলিত হল এই শর্তে যে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধীনস্থ কলা (আর্টস) ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (পিওর সায়েন্স) বিভাগের নাম হবে বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ এবং ও কারিগরি (টেকনিক্যাল) ও ফলিত বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান (অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স) বিভাগের নাম হবে বঙ্গীয় কারিগরি বা শিল্প বিদ্যালয় (বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট)। এই দুটি বিভাগ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধীনে দুটি পৃথক কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে। এই সংযুক্তি ঘটে ১৯১০ সালের ২৫ মে। ওই দিনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অফিস ৯২ আপার সার্কুলার রোডের পার্সিবাগানে স্থানান্তরিত হয়। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধীনে এই সংযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন নাম হল বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পার্সিবাগানে উঠে এলে শিক্ষা-পরিষদের ব্যবহারের জন্য এই বাগানবাড়ি রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এস্টেটের এক্সিকিউটরদের কাছ থেকে তারক পালিত মশাই কেনেন। জাতীয় কাজে ওই সম্পত্তি ব্যবহৃত হবে বলে কলকাতার জমি ও বাড়ির মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের আগের খরিদ-করা দামে (অর্থাৎ এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার কেনা দামে) বিক্রেতারা ছেড়ে দেন।

তারকনাথ পালিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ও কারিগরি শিক্ষা প্রসার সমিতির সংযুক্তির প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। তিনি বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটকে ১৯১২ সালের শেষ পর্যন্ত ৯২ আপার সার্কুলার রোডে (পার্সিবাগানে) থাকতে দেন। তিনি ইনস্টিটিউটকে মাসে মাসে যে দু'হাজার টাকা সাহায্য দিতেন তা ১৯১২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত দিয়ে বন্ধ করে দেন এবং জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে পার্সিবাগান থেকে উঠে যাবার জন্য ৬ মাসের নোটিশ দেন।

বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট মাত্র বছর দুয়েক পার্সিবাগানে ছিল। ১৯১২ সালের শেষের দিকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানিকতলায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর (অন্য মতে রাধাকৃষ্ণ শেঠের) পঞ্চবটী ভিলায় উঠে যায়। উঠে গেলে তারকনাথ পালিত

সমস্ত পার্সিবাগানের জমি ও বাড়ি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে সেই জায়গায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ হয়েছে। এইখানেই পার্সিবাগানের ইতিহাস শেষ।

কিন্তু বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও কারিগরি স্কুলের কথা বলা একটু বাকি আছে। সেটা শেষ করি। পঞ্চবটী ভিলায় থাকাকালে ১৯১৬ - ১৭ সালে বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ উঠে যায়। জাতীয় স্কুলটিও উঠে যায় ১৯২০ সালে। থাকে মাত্র বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট।

১৯২১ সালে স্যার রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সাড়ে দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও আড়াই লক্ষ টাকার তাঁর আলিপুরের বাড়ি (মতান্তরে ১৬ লক্ষ টাকার উপর) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটকে দান করে যান। ওই টাকা দিয়ে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ যাদবপুরে ৩৩ একর (প্রায় ১০০ বিঘে) জমি খরিদ করে ১৯২১-এ। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে স্যার আশুতোষ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালের জুন মাসে ইনস্টিটিউট যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৯ সালের মে মাসে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের নতুন নাম হয় 'কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি'। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি পরিণত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ওদিকে ১৯২৪ সালের জুন মাসে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট পঞ্চবটী ভিলা থেকে যাদবপুরে স্থানান্তরিত হলে পঞ্চবটী ভিলা দখল করে ডা. সুন্দরীমোহন দাস -প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মেডিক্যাল কলেজ। এই কলেজ গোরাচাঁদ রোডে স্থানান্তরিত হলে এই কলেজের যক্ষ্মা হাসপাতালটি পঞ্চবটী ভিলায় থেকে যায়। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কৃপায় পঞ্চবটী ভিলা আর নেই। পঞ্চবটী ভিলা ধূলিসাৎ হবার আগেই জাতীয় মেডিক্যাল কলেজের যক্ষ্মা হাসপাতালটি পাতিপুকুরে উঠে যায়। অনেকদিন সেখানে ছিল জানি। ঠিক আজকের অবস্থা কী জানি না।

ডিরোজিও-র বাড়ি

বর্তমান ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডে যে-বাড়ি আছে সেই বাড়ি নয়, সেই বাড়ির জায়গায় ডিরোজিও-র বাসভবন ছিল। তখন ওই বাড়ির কী নম্বর ছিল জানি না। ১৮২৫ সালের মেজর জে. এ. সকের (Schalch) 'কলকাতা ও উপকণ্ঠের নক্সা' নামে ম্যাপে পরিষ্কার দেখানো আছে 'মি. ডিরোজিও-র বাড়ি' বলে। এ-বাড়ির মালিক ছিলেন কবি ডিরোজিও-র পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও। ডিরোজিও-র এই বাড়ি ছেড়ে দেবার পর এই বাড়ির মালিক হন মি. অ্যান্ড ডিক্রুজ — ভারত গভর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের রেজিস্ট্রার এবং তাঁর পুত্র। পুত্রের নামও অ্যান্ড ডিক্রুজ। তিনি বাংলা দেশে ফ্রি-মেসনদের ইতিহাস রচনা করেন। পিতাপুত্রে এই বাড়িতে বহু বছর বাস করেছিলেন।

তারপর সেই বাড়ি কিনে নেন মেজর রাজচন্দ্র নামে একজন বাঙালি। তিনি ছিলেন কলকাতার একজন বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক। তিনি তদানীন্তন ইংলন্ডের লর্ড হ্যাল্‌সবেরির বৈমাত্রেয় ভগিনী কুমারী গিফার্ডকে বিবাহ করেন। মেজর রাজচন্দ্র চন্দ্র কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার কালে সস্ত্রীক এই বাড়িতে থাকতেন। তখন এই বাড়ির নম্বর ছিল ৯৩ লোয়ার সার্কুলার রোড।

তারপর এই বাড়ি ভাড়া নেয় পি. ডবল্যু. ফ্লিউরি কোম্পানি নামে এক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। এদের 'পরীর ফোয়ারা' এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক প্রদর্শনী এই বাড়ির মাঠে প্রায়ই হতো ১৮৮৪ সাল নাগাদ। ১৯০৪ সালে এই বাড়ির নম্বর হয় ১৫৫। ওই সময় কলকাতার ছোট আদালতের জজ মি. এ. হাসান এই বাড়িতে বাস করতেন।

পার্সিবাগান প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে পার্সিবাগানের বাড়ি ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় পাথুরেঘাটার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে বিক্রি করে দিয়ে ১৩.৭.১৮৯৪ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক সপরিবারে ৩৫ ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। ১২-১৩ বছর সেই বাড়িতে বাস করে ১৯০৭ সালে ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িটি কিনে নিয়ে সেটা ভেঙে ফেলে তার জায়গায় মার্টিন কোম্পানিকে দিয়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি বড় বাগান-সমেত অট্টালিকা তৈরি করিয়ে সেখানে গিয়ে বাস করেন। অট্টালিকার নাম দেন 'মিনার'। সেই অট্টালিকা এখন পর্যন্ত রয়েছে। এই বাড়ি থেকেই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মনোজেন্দ্রের অনেক টাকা খরচ করে খুব ঘটা করে বিয়ে দেন। ১৯১৭ সালে ঋণের দায়ে ওই বাড়ি ছেড়ে ৯১ ইলিয়ট রোডের একটি বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করেন। নতুন বাড়িতে প্রায় ৩ মাস রোগে ভুগে ২৩.২.১৯১৭ তারিখে ইনি জোর করে তাঁকে গঙ্গার তীরে নিয়ে যেতে বলেন। আহিরিটোলার ঘাটে গঙ্গায় জলে পা ডুবিয়ে তিনি তিনদিন হরিনাম শুনে ২৬.২.১৯১৭ তারিখে মারা যান।

১৯১৬ সালের শেষে কি ১৯১৭ সালের গোড়ায় বাগবাজারের গোকুল মিত্রের প্রপৌত্র বিহারীলাল মিত্র নগেন বসুমল্লিকের ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ি নিলামে কিনে নেন। তিনি ৭.২.১৯৩৩ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে এই বাড়িতেই মারা যান। মৃত্যুর একবছর বা দুবছর আগে তিনি উইল করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির আয় থেকে বছরে ৪৮ হাজার টাকা বা মাসে ৪ হাজার টাকা বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য দিয়ে যান। আর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনার ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেলের হাতে দিয়ে যান। চাঁদনি বাজারের প্রায় সবটাই তাঁর সম্পত্তি ছিল। তাঁর কোনো পুত্র ছিল না, একটিমাত্র কন্যা ছিল। তিনি নিজের ভাইপোকে দত্তক নেন। এই দত্তক পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ মিত্র। তিনি ১৯৫৭ সালের মে মাসে ৫৩ বছর বয়সে এই বাড়িতেই মারা গেছেন। তাঁর পুত্রকন্যা কিছুই ছিল না। তাই তিনি দর্জিপাড়ার রাজকৃষ্ণ মিত্রের বংশের অরবিন্দ মিত্রকে দত্তক নেন। অরবিন্দ মিত্রের বয়স এখন ৫০-এর কাছাকাছি। তিনি শ্যামবাজার স্ট্রিটের পন্টু করের পরিবারে বিয়ে করেছেন। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তাঁর শ্যামবাজারে নিজের ব্যবসা আছে। তিনি ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বাস করছেন।

বিহারীলাল মিত্র অল্পবয়সে বাগবাজারের পৈতৃক বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। সেই থেকে তিনি বরাবর আলাদাভাবে থাকেন। তাঁর প্রায় সমস্ত সম্পত্তি স্বোপার্জিত। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বছরে যে-৪৮ হাজার টাকা স্ত্রী-শিক্ষার জন্য দিয়ে যান সে-টাকার জন্য তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দায়ী থাকবে এই ব্যবস্থা করে যান। এই দায় মিটিয়ে যদি কিছু টাকা থাকে তাহলেই তাঁর উত্তরাধিকারী পাবেন, নচেৎ নয়। তাঁর মৃত্যুর পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল তাঁর কিছু নগদ টাকা দিয়ে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের বাড়িটি কেনেন। (সম্প্রতি 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' অন্যত্র উঠে গেছে)। ভাড়া-বাবদ সেই বাড়ি থেকে আয় হয় মাসে ৫,৫০০ টাকা। তাঁর পোষ্যপুত্র অনিরুদ্ধ মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাসে,

৪,০০০ টাকার বদলে, ৫, ৫০০ টাকার আয়ের বাড়িটি দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তিকে দায়মুক্ত করেন। এখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ভবন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। ওই টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় 'বিহারীলাল কলেজ অফ হোম অ্যান্ড সোসাল সায়েন্স' খুলেছেন। সেখানে বাঙালি-অবাঙালি সবরকম মেয়েরাই শিক্ষা পাচ্ছেন। মেয়েদের এই কলেজ এখন রয়েছে আলিপুর জজ কোর্ট রোডের হেস্টিংস হাউসের পূর্বদিকে এক বাগানবাড়িতে। প্রকৃতপক্ষে এই বাগানবাড়িটি আগে হেস্টিংস হাউসের জমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন স্বতন্ত্র হয়েছে।

৪৫ বেনেটোলা লেনের বাড়ি

এখন এই বাড়ি সংস্কার করা হয়েছে। আগে ছিল একটি পুরনো দোতলা বাড়ি। বাড়িটি ঐতিহাসিক।

১. রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই বাড়িতে বাস করেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লোক ছিলেন।

২. তারপর এই বাড়িতে বাস করেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সীতানাথ (দত্ত) তত্ত্বভূষণ ও তাঁর স্ত্রী নগেন্দ্রবালা।

৩. এঁরা থাকতে থাকতেই ১৮৮৪ কি ১৮৮৫ সাল থেকে এই বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কৃষ্ণকুমার মিত্র, তাঁর স্ত্রী লীলাবতী (রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা), দুই কন্যা কুমুদিনী ও বাসন্তী এবং পুত্র সুকুমার মিত্রকে নিয়ে। এঁরা সকলে বাস করতেন দোতলায়। কৃষ্ণকুমারবাবু 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ওই বাড়ির একতলায় সঞ্জীবনী প্রেস ও অফিস ছিল। কৃষ্ণকুমারবাবু এই বাড়ি থেকেই পরে ৬ কলেজ স্কোয়ার বা বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিটের বাড়িতে সঞ্জীবনী প্রেস নিয়ে সপরিবারে উঠে যান।

৪. ১৮৮১ সালের ১০ মাঘ (২২ জানুয়ারি) এই বাড়ি থেকে নগর কীর্তন করে এসে নবনির্মিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫. ১৮৮৬ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস এই বাড়িতে ছিল।

৬. সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সিটি স্কুল ১৩ মির্জাপুর স্ট্রিটের তেতলা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় ৬.১.১৮৭৯ তারিখে। এই বাড়িটি জীর্ণ হওয়ায় ১৮৯০-৯১ সালে ওই পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়। যতদিন না নতুন বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হয় ততদিন সিটি স্কুল এই ৪৫ বেনেটোলা লেনের বাড়িতে ছিল।

৭. এই বাড়িতে সিটি স্কুল থাকাকালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই স্কুলের একটি ঘর চেয়ে নিয়ে ১.২.১৮৯২ তারিখে 'সাধন আশ্রম' স্থাপন করেন। ১৫.৬.১৮৯২ তারিখে সাধন আশ্রম ১০/৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে উঠে যায়।

৮. ৫.১.১৮৯৮ তারিখে মিত্র ইনস্টিটিউশন (প্রধান) এই বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯. সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতিও এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০. বিহারীলাল মিত্র কলেজ অব হোম সায়েন্সের ছাত্রীদের হোস্টেল এই বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাঁখারিটোলায় ব্রাহ্ম সমাজ বাড়ি

একসময়ে কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, কালনা, ঢাকা, কলকাতায় ভবানীপুর (৭১ পদ্মপুকুর রোড), বেহালা প্রভৃতি জায়গায় প্রকাশ্য ব্রাহ্ম সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির এবং কলকাতা সিঁদুরিয়াপটিতে মণিলাল মল্লিকের বাড়িতে, নন্দনবাগানে কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে ও ন্যাড়া গির্জায় কাশীনাথ দের বাড়িতে তিনটি পারিবারিক ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। এগুলি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিল। সিঁদুরিয়াপটি ও নন্দনবাগানের পারিবারিক সমাজ পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হয়েছিল।

কেশব সেনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতায় কয়েকটি পাড়ায় পারিবারিক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন লোকের যত্নে বরানগরে একটি, হীরালাল দাস ও সাধুচরণ দে প্রমুখ কয়েকজনের যত্নে চুনারিপুকুরে একটি, এন্টালি বেনেপুকুরেও একটি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এন্টালির সমাজ যে-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ঠিকানা ২২ বেনেপুকুর লেন। এই বাড়িতেই কুমারী এনেট একরয়েড ১৮.১১.১৮৭৩ তারিখে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এছাড়া কয়েকটি সুবর্ণবণিকের বাড়িতে ব্রহ্মোপাসনার জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন, পাথুরেঘাটার জয়গোপাল সেন ও বৈকুণ্ঠনাথ সেনের বাড়িতে, পটলডাঙায় কানাইলাল পাইন ও প্রেমচাঁদ বড়ালের বাড়িতে। প্রচারকগণ প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে এইসব সমাজে আচার্যের কাজ করে আসেন।

বৌবাজারে ১৩ শাঁখারিটোলা ফার্স্ট লেনেও একটি পারিবারিক ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। বাড়িটি ছোট, একতলা। সেই বাড়িটি দেখিয়ে এখন পর্যন্ত পাড়ার লোকেরা বলে এটি ব্রাহ্ম সমাজ বাড়ি। কিন্তু কেউ বলতে পারে না এ-বাড়ি কার ছিল, কে এখানে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কবে প্রতিষ্ঠা করেন। খাস হিন্দু পাড়ার মধ্যে এ-বাড়ি লোকের কৌতূহল জাগায় বটে কিন্তু নিরসন করে না।

এই বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে বাস করতেন গরিফা-নিবাসী নববিধান সমাজের বলরাম সেন। কেশব সেনের দেশও গরিফা। এই বাড়ির বাড়িওয়ালা ছিলেন হরিশচন্দ্র সরকার। বলরামবাবু তাঁর এই বাসায় ১৭.১.১৯০৬ বুধবার এক পারিবারিক ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। প্রতি বুধবার এখানে প্রার্থনা-সভা বসত। কালীবাবু, অখিলবাবু, মহেন্দ্রবাবু, ডাক্তার বরদাবাবু, অমৃতবাবু, উমানাথবাবু, বসন্তবাবু, যতীনবাবু এবং আরো কয়েকজন প্রায়ই আসতেন এ-বাড়িতে। এঁরা সকলেই কেশব সেনের শিষ্য ও নববিধানী ছিলেন।

বাইরে বসবার দুটি ছোট ছোট ঘর ছিল। এতে সুবিধে না-হওয়ায় বাড়িওয়ালার অনুমতি নিয়ে মাঝের দেওয়াল ভেঙে তার ওপরে দুখানা লোহার কড়ি পাশাপাশি বসিয়ে দুটো ঘর এক করে উপাসনার জায়গা করা হয়। উপাসনার পর প্রচারকেরা ও দূরের বন্ধুরা সন্ধ্যার পর খেয়ে যেতেন, কেউ কেউ কোনো কোনো দিন রাত্রিবাসও করতেন। চট্টগ্রামের প্যারীমোহন চৌধুরী ২৪.১২.১৯০৬ থেকে ১৫.৪.১৯০৭ প্রায় ৪ মাস এই বাসায় ছিলেন। তিনি বাইরের ঘরে শুতেন এবং এখানে সমাজে উপাসনাদি করতেন। শেষে তিনি ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে নববিধান সমাজের প্রচার-আশ্রমে গিয়ে থাকেন এবং শেষজীবন সেখানেই কাটান।

এই হল এই ব্রাহ্ম সমাজ বাড়ির ইতিহাস। শাঁখারিটোলা ফার্স্ট লেনের পরে নাম হয়

নৃসিংহ মুখার্জি লেন। যখন ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয় তখন বাড়ির নম্বর ছিল ১৩ এবং নৃসিংহ মুখার্জি লেন থেকে বাড়িতে ঢোকা যেত। এখন এ-বাড়ির ঠিকানা হয়েছে ১৫ কালীদাস লেন। কালীদাস হচ্ছেন কালীদাস মুখার্জি, নৃসিংহ মুখার্জির পিতা। কালীদাস লেন পুবদিকে, নৃসিংহ মুখার্জি লেন তার সামান্য পশ্চিমে। এখন আর নৃসিংহ মুখার্জি লেন থেকে সমাজবাড়িতে যাওয়া যায় না।

পাথুরেঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ি

পাথুরেঘাটার ঠাকুরবংশে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের (১৭৩১-৯৩) সাত পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬১-১৮১৮)। গোপীমোহনের ছয় পুত্র — সূর্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার (১৭৯৪-১৮৪০), হরকুমার (১৭৯৮-১৮৫৮) ও প্রসন্নকুমার (১৮০১-৬৮)।

গোপীমোহন ঠাকুর চারখানা বাড়ি করেন — ৬৫ ও ৬৬ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট এবং ৯ ও ১০ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিট। ৬৫ পাথুরেঘাটা স্ট্রিটের বাড়ি ছিল গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ির সদর মহল, তার পশ্চিমে ৬৬ নম্বর বাড়ি ছিল অন্দর মহল। এই চার খানি বাড়ি গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রদের মধ্যে এইভাবে ভাগ হয় : ৬৬ পাথুরেঘাটা স্ট্রিটের বাড়ি পান চতুর্থ পুত্র কালীকুমার ঠাকুর ; ৯ এবং ১০ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের বাড়ি পান কনিষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর ; ৬৫ পাথুরেঘাটা স্ট্রিটের বাড়ি পান বাকি চার পুত্র।

২৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটে তেতলা এক বাড়ি করেন কালীকুমার ঠাকুর। এটি ছিল তাঁর একার সম্পত্তি। তিনি মৃত্যুকালে ছোটভাই প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে এই বাড়ি দিয়ে যান। কালীকুমার ঠাকুরের বাড়ি পাবার পর প্রসন্নকুমার ঠাকুর বেশিরভাগ সময় সেই বাড়িতে থাকতেন। এটি তিনি তাঁর বৈঠকখানা-বাড়ি হিসেবে ব্যবহার করতেন। ১৮৯৬ সালে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই বাড়ি ভেঙে ফেলে 'টেগোর ক্যাস্‌ল' তৈরি করেন। পরবর্তীকালে এই বাড়ি হয় ঠাকুর এস্টেটের কাছারিবাড়ি। এখানে তাঁদের জমিদারি-সংক্রান্ত কাজকর্ম হতো। ১৯৫৪ সালে মুন্দ্রারা এই বাড়ি কিনে নেন।

১১ থেকে ১৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের বাড়ি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তৈরি করেন ১৮৮৪ সালের আগস্ট মাসে। বাড়ির নাম রাখেন 'প্রাসাদ'। প্রাসাদ তৈরি করবার আগে পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৬৫ পাথুরেঘাটা স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করতেন। তাঁর থিয়েটার হতো এই ৬৫ পাথুরেঘাটা স্ট্রিটের বাড়িতে। প্রাসাদ তৈরি হবার পর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্ররা থাকতেন প্রাসাদে। আর তাঁর ছোটভাই শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর থাকতেন ৬৫ পাথুরেঘাটা স্ট্রিটের বাড়িতে।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এক পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮২৬-৮৯/৯০ ও দুই কন্যা সুরসুন্দরী ও মায়াসুন্দরী। মায়াসুন্দরীর এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। সুরসুন্দরীর পাঁচ পুত্র — ভূজগেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, হরীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। শেষেন্দ্রভূষণ অবনীন্দ্রনাথের ভগিনী সুনয়নী দেবীকে বিবাহ করেন। এঁদেরই কন্যা প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী। শেষেন্দ্রভূষণের পরে বাড়ি ছিল বিডন স্ট্রিটে।

৯ ও ১০ নম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের বাড়ি পান প্রসন্নকুমারের দৌহিত্রেরা। ৯ নম্বর

বাড়ি বোধ হয় পান মুখুজ্জেরা ও ১০ নম্বর বাড়ি চাটুজ্জেরা। ১০ নম্বর বাড়ির নাম ছিল 'রমা-নিকেতন'। রমা-নিকেতনে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর মানুষ হন। এই বাড়িতেই হিন্দু বা জাতীয় মেলার পরিচালক, জাতীয় সভার বিশিষ্ট সভ্য ভূজগেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় থাকতেন। তাঁরই উদ্যোগে জাতীয় সভার এক অধিবেশন হয় এই বাড়িতে ১৮৭৩ সালে। সেই অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু 'একাল আর সেকাল' নামে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্ররা যখন ৯ ও ১০ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের বাড়ি বিক্রি করেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কেনেন ১০ নম্বর বাড়ি 'রমা-নিকেতন' ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কেনেন ৯ নম্বর বাড়ি। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮) ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলে প্রসন্নকুমার তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তাঁর সম্পত্তি দিয়ে যান দাদার পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে। যতীন্দ্রমোহনের পুত্র না-থাকায় তিনি ছোটভাই বা শৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরকে দত্তক নেন।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চার কন্যা — শরণ্য-তারিণী, বরেন্দ্র-বন্দিনী, নিবৃত্তি-দায়িনী চতুর্বর্গ-প্রদায়িনী (ডাক নাম মনোরমা)। 'রমা-নিকেতন' কেনবার পর যতীন্দ্রমোহন সেই বাড়ি তাঁর ছোটমেয়ে মনোরমাকে দেন। অন্যান্য দৌহিত্রদের অন্যত্র বাড়ি করে দেন। যেমন, বড়-মেয়ের পুত্রদের ২৭ ডিহি শ্রীরামপুর রোডে 'গাঙ্গুলী ম্যানর' তৈরি করে দেন। মেজমেয়ের পুত্রদের বাড়ি করে দেন ৩৯ মনোহরপুকুর রোডে। মনোরমার (১৮৫৬ - ১৯৭৩) স্বামী পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় খাজাঞ্চি। মনোরমার একমাত্র কন্যা মলয়াবতীর বিবাহ হয় স্যার বিনোদবিহারী ব্যানার্জি, এম. এ, এম. ডি-র সঙ্গে। বিনোদবিহারীর দুই পুত্র — কঞ্জাক্ষ (১৮৯১-১৯০৫) ও শ্রীকরঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১১) — কবি ও কনসাল এবং এক কন্যা শ্রীমতী মালশ্রী। শ্রীকরঞ্জাক্ষের পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক (জন্ম ১৯৩৬)। ঠাকুর বংশের এইসব তথ্যের জন্য আমি প্রধানত এঁর কাছেই ঋণী।

মনোরমার কন্যা ও জামাতা স্যার বিনোদবিহারী ব্যানার্জি ও স্যার বিনোদের পুত্র ও পৌত্র ১০ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের 'রমা-নিকেতনে' বাস করতেন। এখন তাঁরা বাস করছেন 'প্রাসাদে'।

৮৫ পাথুরেঘাটা স্ট্রিটের বাড়ি বিক্রি হয় ১৯১৯ সালে, কেনেন এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক শ্রীরাধাকৃষ্ণ সানতালিয়া। ৬৬ নম্বর বাড়ি বিক্রি হয় ১৯১৯-২০ সালে। কেনেন আর-এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক। ৯ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের বাড়ি বিক্রি হয় ১৯১৯-২০ সালে। কেনেন প্রথমে প্রদ্যুম্ন মল্লিক, তারপর খৈতান উপাধিধারী এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক। ১০ নম্বর বাড়ি বিক্রি হয় ২.৭.১৯৫৪ তারিখে, কেনে মেট্রোপলিটান স্কুল, বড়বাজার শাখা।

মরকত কুঞ্জ (এমারেল্ড বাওয়ার)
৫৬ এ ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড

মরকতকুঞ্জ যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতা হরমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়ি ছিল। হরকুমারের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন এই বাগানবাড়ির মালিক হন। যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী হয়ে একে শিল্পমণ্ডিত করেন।

এই বাগানবাড়িতে প্রথম ও দ্বিতীয় কলেজ সম্মিলন হয়। রাজনারায়ণ বসু এ-সম্বন্ধে তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন :

> ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ সম্মিলন (College Re-Union) হয়। আমি উহা প্রথম বিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রস্তাব করি। জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম District Superintendent of Police ছিলেন। আমি প্রথম এই প্রস্তাব করি কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা কোনও উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। জগদীশনাথ রায় আমার প্রস্তাবকে প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের ছাত্রদিগকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত নিকুঞ্জ' (Emerald Bower) নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি এই সম্মিলনে "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" পাঠ করি ... রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচর্যা করিয়াছিলেন।
>
> দ্বিতীয় বৎসরে কলেজ সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল। এ সম্মিলনও 'মরকত নিকুঞ্জে' হয়। বিখ্যাত 'শকুন্তলা তত্ত্ব' প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম. এ. এইবার সম্মিলনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও গানের শেষে কতকগুলি নাটকের বাছাবাছা স্থান অভিনীত হইয়াছিল ও কতকগুলি মূক অভিনয় (Tableaux Vivants) প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপরে কলেজ সম্মিলন তিন চারি বৎসর বন্ধ থাকিয়া ১৮৮১ সালে পুনরায় 'মরকত নিকুঞ্জে' হয়। সেবার কোন বে-বন্দোবস্ত বশত উপস্থিত জনসমূহ ক্ষেপিয়া উঠিয়া অত্যন্ত গোলমাল করাতে রাজভ্রাতৃদ্বয় (যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন) তাঁহাদের বাগানে সম্মিলন হওয়া বন্ধ করিয়া দেন।

দ্বিতীয় সম্মিলনে কিশোর রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন :

> এই সম্মিলন সভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র, যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। এই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দীপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়া ছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম ইনিই বঙ্কিমবাবু তখন বড় বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সেকথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবু খড়্গা নাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারী একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছু মাত্র গা ঘেঁসাঘেঁসি ছিল না, এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবল বুদ্ধিশালী মননশালী লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

দ্বিতীয় বারের এই সম্মিলনে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুহৃদ সমাগম' নামে নিজের লেখা একটি

বড় কবিতা পড়েন। চন্দ্রনাথ বসু কিশোর রবীন্দ্রনাথকে এই সম্মিলনে কী একটা কবিতা পড়বার ভার দিয়েছিলেন।

বর্তমানে 'মরকত কুঞ্জে' রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিষয়ের অধ্যাপনা হয়।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সিঁথির 'মরকত কুঞ্জ' ছাড়া আর তিনটি বাগানবাড়ি ছিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর উত্তরাধিকারসূত্রে ওই তিনটি বাগানবাড়ি পান। সেগুলি হচ্ছে : ১ বরানগরে 'তটিনীকুটীর'; ২ দক্ষিণেশ্বরে 'সুরধুনী কানন' এবং ৩ উল্টোডিঙায় 'বিজয়কানন'।

'তটিনীকুটীর' বরানগরে গঙ্গার ধারে জয় মিত্রের কালীবাড়ির সামান্য উত্তরে, অমৃতলাল দাঁ রোডের শেষে, মুক্তকেশী দেবীর ঘাটের সংলগ্ন। তার সামনেই রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল। এই বাগান মুন্দ্রার সম্পত্তি।

'সুরধনী কানন' দক্ষিণেশ্বরের উত্তর প্রান্তে গঙ্গার ধারে। বর্তমানে সেই বাগানে সারদামঠ হয়েছে।

'বিজনকানন' উল্টোডিঙায় গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেনে, হরিশ নিয়োগীর বাগানের পূর্ব গায়ে। নাম 'রাজার বাগান'। এখন সেখানে ধানকল হয়েছে। বর্তমান মালিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস।

বেলগেছিয়া ভিলা
৬৪ বেলগাছিয়া রোড

একেবারে গোড়ায় বেলগাছিয়া ভিলা কার সম্পত্তি ছিল সে সম্বন্ধে দুটি মত আছে। এক মতে এটি ওয়ারেন হেস্টিংসের সম্পত্তি ছিল। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়। তখন এর নাম হয় 'অকল্যান্ড ভিলা'। কোম্পানির কাছ থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৬ সালে কিংবা তার আগেই কেনেন। পিতার দেনা শোধ করবার জন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১.৭.১৮৫৭ তারিখে এটি পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে বেচে দেন।

দ্বিতীয় মতে এই বাগানবাড়ি প্রথমে কলকাতা দরমাহাটা-নিবাসী রামদুলাল ঘোষের সম্পত্তি ছিল। রামদুলাল ঘোষ ছিলেন চন্দননগর-নিবাসী, ফরাসি গভর্নমেন্টের দেওয়ান কালীচরণ ঘোষের পুত্র। রামদুলাল ঘোষ, পোর্তুগীজ সরকারের কলকাতার এজেন্ট হয়ে প্রচুর ধনবান হন। তিনি ১০৮ বছর বয়সে মারা যান। রামদুলালের পুত্র রামধন বিহারে এক নীলের কুঠি খোলেন ও নিজের শ্যালকের জন্য জামিন হন। ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থহানি হওয়ায় ও শ্যালকের দরুন জামিনের টাকা না-দিতে পারায় পিতা রামদুলালকে পুত্রের জন্য বেলগাছিয়া ভিলা বিক্রি করতে হয়। কেনেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি এই বাগানবাড়ি কিনে বড়লাট লর্ড অকল্যান্ডের ও তাঁর ভগিনী কুমারী ইডেনের পরামর্শ ও রুচি অনুযায়ী বাগানের বহু উন্নতি করেন। এই কারণে এবং যেহেতু এঁরা দুজন আপ্যায়িত হতেন, এই জন্যে বেলগাছিয়া ভিলা লর্ড অকল্যান্ডের পল্লীনিবাস বলে কালক্রমে খ্যাতি অর্জন করে।

এর পরবর্তী ইতিহাস পাওয়া যায় ২১.৯.১৮৪৮ তারিখের 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার এই লেখা থেকে:

আমরা 'ক্যালকাটা স্টার' নামক পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানতে পারছি যে কলকাতায় দ্বারকনাথের সম্পত্তি কয়েকদিন যাবৎ বিক্রি হচ্ছে। এই বিখ্যাত সম্পত্তি এবং তার অন্তর্গত বাড়ি, জমি, আসবাবপত্র, পাথরের মূর্তি ও ছবিগুলি নিলামে বিক্রি হয়ে গেছে। ছবি, মূর্তি ও আসবাবপত্রের বেশিরভাগই বর্ধমানের মহারাজ কিনে নিয়েছেন। কিন্তু বাড়ি ও সংলগ্ন জমি সম্পত্তির মালিক মৃত দ্বারকানাথের পুত্ররা ৫৫ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছেন। সমস্ত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য হচ্ছে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা (ইংরেজির অনুবাদ — রা. মি.)।

১.৭.১৮৫৭ তারিখে দ্বারকানাথের পুত্রগণ জমি ও বাড়ি পাইকপাড়ায় রাজাদের বিক্রি করেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়া ভিলা কিনে এখানে একবছরের মধ্যে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' নামে এক সুরম্য নাট্যশালা স্থাপন করেন। এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হয় শ্রীহর্ষের সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটক অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত বাংলা 'রত্নাবলী' নাটক। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৩১.৭.১৮৫৮। রাজারা এই অভিনয়ের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছিলেন। এ-রকম সর্বাঙ্গসুন্দর নাট্যাভিনয় বাংলা দেশে আগে কখনও দেখা যায়নি। এই অভিনয় দেখবার জন্য কলকাতার দেশি-বিদেশি অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তি, এমনকী সপরিবারে বাংলার ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপস্থিত হয়েছিলেন। গৌরদাস বসাকের নিমন্ত্রণে মাদ্রাজ-প্রত্যাগত মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। বিদেশি অতিথিদের বুঝবার সুবিধার জন্য পাইকপাড়ার রাজারা 'রত্নাবলী' নাটক মাইকেলকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে বই আকারে প্রকাশ করেছিলেন। 'রত্নাবলী' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ৬-৭ বার অভিনীত হয়েছিল।

এই 'রত্নাবলী' অভিনয় দেখেই মধুসূদনের মনে নাটক লিখবার ইচ্ছা জাগে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ৬.৯.১৮৫৯ তারিখে। বাংলা দেশের ছোটলাট স্যার পিটার গ্রান্ট, পাটনার মুন্সি আমির আলি, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য দেশি-বিদেশি ভদ্রলোক এই অভিনয় দেখেন। রাজারা বিদেশি দর্শকদের সুবিধার জন্য মধুসূদনকে দিয়ে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেরও ইংরাজি অনুবাদ করিয়েছিলেন। 'শর্মিষ্ঠার' ষষ্ঠ ও শেষ অভিনয় সেই বছরেরই ২৭ সেপ্টেম্বর হয়। 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোনো অভিনয় হয়নি। ২৯.৩.১৮৬১ তারিখে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বেলগাছিয়া নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর ১৮৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসে ইংলন্ডের যুবরাজ অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড (ইনিই পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড হন) যখন কলকাতায় আসেন, তখন কলকাতার বাঙালি অধিবাসীবৃন্দ এই বেলগাছিয়া ভিলায় তাঁকে মহা আড়ম্বরে রাজোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ চারপুত্র রেখে মারা যান — কুমার গিরীশচন্দ্র, রাজা পূর্ণচন্দ্র, কুমার কান্তিকচন্দ্র ও কুমার শরচ্চন্দ্র। কুমার শরচ্চন্দ্র বেলগাছিয়া ভিলা পান। এই ভিলার রাজারা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ি ছাড়া নিজেরা আলাদা একটা বাড়ি করেছিলেন নিজেদের থাকবার জন্য। সেই বাড়িও কুমার শরচ্চন্দ্র পান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র ও বীরেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমার জগদীশচন্দ্র বেলগাছিয়া ভিলার মালিক হন। কুমার জগদীশচন্দ্র বেলগাছিয়া ভিলায় নিজেদের বাড়িতে বাস করতেন।

বেলগাছিয়া ভিলায় ২০০ বিঘে জমি ছিল। ভেতরে আঁকাবাঁকা ঝিল ছিল। ঝিল পার হবার জন্য ঝিলের ওপর মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঠের পুল ছিল। ফটকের দুই পাশে সান্ত্রীদের ঘর ছিল। ফটক থেকে অল্প দূরে বাঁ-হাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলের বাড়িটি রাজারা সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন — দর্শকদের দেখতে দিতেন, কিন্তু নিজেরাও ব্যবহার করতেন না, অপরকেও ব্যবহার করতে দিতেন না। একেবারে ভেতরে ডান হাতে তাঁদের নিজেদের রাজবাড়ি ছিল, সে বাড়িতে কুমার জগদীশ সিংহ বাস করতেন। সে বাড়ি এখনও আছে কিনা জানি না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িটি এখনও আছে। আর-সব ভেঙে-চুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পের দুধের ডিপো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি হাউসিং এস্টেট হয়েছে। পুরনো বেলগাছিয়া ভিলা মরে গেছে।

মোহনবাগান ভিলা

মোহনবাগান ভিলা ছিল একটি চোখ-ধাঁধানো বিরাট মর্মর প্রাসাদ। আগাগোড়া সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি। চারিদিকে প্রকাণ্ড মাঠ। তার ভেতর কয়েকটি পুকুর। এই ভিলা তৈরি করেছিলেন কীর্তি মিত্র। প্রথম যুগে যে-কজন বাঙালি নতুন পাটের ব্যবসা করে বড়লোক হন কীর্তি মিত্র তাঁদের মধ্যে একজন। এঁর এক পুত্র ছিল। নাম প্রিয়নাথ মিত্র। পি. মিত্র বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন।

পি. মিত্র বাগবাজারে রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটে এক বিরাট তেতলা বাড়ি তৈরি করেন — নাম দেন Ashcroft Hall ; প্যারীচরণ সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ সরকারের হাইস্কুল প্রথমে এই বাড়িতে আরম্ভ হয়। পরে এখান থেকে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে উঠে যায়। বরানগরের উত্তরে আলমবাজারের দিকে গোপাললাল ঠাকুর রোডের উপর ডান হাতে এক খুব উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বিরাট বাগানবাড়ি ছিল। এখন সে-বাগানবাড়ি নেই, ভেঙে ফেলা হয়েছে, সে-জায়গায় অনেক বাড়িঘর উঠেছে। এটি ছিল এই পি. মিত্রের বাগানবাড়ি। অনেকে কিন্তু ভুল ক'রে এই পি. মিত্রকে অনুশীলন সমিতির প্রথম সভাপতি পি. মিত্র বলে ধরে নিয়েছেন। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্রের নাম প্রমথনাথ মিত্র। তিনি নৈহাটির 'মিত্র'। নৈহাটির মিত্রপাড়ায় তাঁর বাড়ি আছে। কীর্তি মিত্রের পুত্র প্রিয়নাথ মিত্র অসাধারণ স্বাস্থ্যবান ও বলবান ছিলেন। শেষকালে সব হারিয়ে অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের এক বাড়িতে থাকতেন, এলাহাবাদের চারু মিত্রের বাড়ির কাছাকাছি।

মোহনবাগান ভিলার চারিদিকে উঁচু দেওয়াল ছিল। এই ভিলার উত্তর সীমা ছিল বর্তমান ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট, পূর্ব সীমা আপার সার্কুলার রোড, পশ্চিম সীমা বর্তমান কীর্তি মিত্র লেন এবং দক্ষিণ সীমা বর্তমান মোহনবাগান লেন। এই পরিধি থেকেই বুঝতে পারা যাবে মোহনবাগান ভিলা কত বড় ছিল। দুঃখের কথা, কীর্তি মিত্র এই নতুন তৈরি বাড়িতে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান করার অল্পদিন পরে মারা যান। ভিলার মালিক হন তাঁর পুত্র প্রিয়নাথ মিত্র।

এই মোহনবাগান ভিলার নাম থেকে মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের নাম হয়েছে। কেননা, এই ক্লাবের খেলা আরম্ভ হয় মোহনবাগান ভিলার বিস্তীর্ণ মাঠে। মাঠের যে দিকটায় খেলা হতো সেটা ছিল ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট ও আপার সার্কুলার রোডের মোড়ে। ভিলা বা

বাড়ির ভেতর অনেকগুলি মার্বেল পাথরের উঠোন ছিল। মোহনবাগান ক্লাবের সেইসব সদস্য, যাঁরা স্কেটিং করতে ভালোবাসতেন, তাঁরা সেইসব উঠোনে স্কেটিং করতেন। বাড়িটা এত বড় ছিল যে ক্লাবের সদস্যরা বাড়ির ভেতর ঢুকতে সাহস করত না, পথ হারিয়ে যাবার ভয়ে।

মোহনবাগান ভিলার মাঠে মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৯ সালে। কীর্তি মিত্র মারা গেছেন, প্রিয়নাথ মিত্র তখন মোহনবাগান ভিলার মালিক। তিনিই ছিলেন এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সঙ্গে আর-একজন ছিলেন, তিনি বারিস্টার এইচ. ডি. (হরিদাস) বোস। পি. মিত্র ক্লাবের এগারো জন খেলোয়াড়ের জন্য র‍্যাংকিন-এর বাড়ি থেকে পোশাক তৈরি করিয়ে দেন।

পি. মিত্র মোহনবাগান ভিলা বিক্রি করে দিতে চান। তখন নিমাই বোসের আপিসে ভূপেন বোস বেরোন। নিমাই বোস, ভূপেন বোস ও আর-একজন — এই তিনজনে মিলে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে মোহনবাগান ভিলা কিনে নেন ১৮৯০ সালে। সেই সালেই কলকাতায় টিভোলি পার্কে 'কংগ্রেস' হয়। বাংলার বাইরে থেকে যেসব কংগ্রেস প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদের রাখা হয়েছিল মোহনবাগান ভিলায়। পরের বছর (১৮৯১) এই বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। সেই জায়গায় এখন অনেকগুলি থাকবার বাড়ি হয়েছে।

মোহনবাগান মাঠের পর মোহনবাগান ক্লাব খেলত শ্যামপুকুরের এক ছোট মাঠে — নাম ধোপাপুকুরের মাঠ। কেউ কেউ বলেছেন মোহনবাগান ভিলা ভাঙা হয়ে যাবার পর মোহনবাগান ক্লাব শ্যাম স্কোয়ারে ১০ বছর খেলেছিল। সে-কথা ঠিক নয়। কারণ তখনও শ্যাম স্কোয়ার তৈরি হয়নি। সেখানে তখন কলুপুকুর ছিল। ১৯০২-০৩ সালে প্রধানত আনন্দকৃষ্ণ বসুর ভাই যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর চেষ্টায় ওই স্কোয়ার হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ভূপেন বোসের বাড়িতে। সেটা যে ঠিক নয় তা ক্লাবের নামই প্রমাণ করছে।

দেওয়ান মানিকচাঁদের বাগান

এঁকে সাধারণত মানিকচাঁদ বলা হয়। কিন্তু এঁর আসল নাম মানিকরাম। ইনি বাঙালি, উপাধি বসু। তন্তুবণিক জাতির ইতিহাসের লেখক নগেন্দ্রনাথ শেঠ এঁকে মানিকচাঁদ শেঠ বলে এক জায়গায় উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু পরে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। ইনি যে কে তা অনেকের কাছেই আজ পর্যন্ত রহস্য হয়ে রয়েছে। এঁকে কখনও 'দেওয়ান' বলা হয়, কখনও বলা হয় 'রাজা'। কারণ এই। ইনি বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান-পদে প্রথমে কর্মজীবন আরম্ভ করেন, তাই তাঁকে 'দেওয়ান' বলা হয়। পরে তিনি ওই পদ ত্যাগ করে তখনকার বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর অধীনে কাজে নিযুক্ত হন। এই কাজে এঁর সুনাম ও প্রতিপত্তি বাড়ে। নবাব আলিবর্দীর সঙ্গে মারাঠা (বর্গি)-দের যুদ্ধে ইনি নবাবের দেহরক্ষী হয়ে যুদ্ধে যান। নবাব আলিবর্দী এঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে পাঞ্জা-সহ ভূসম্পত্তি ও 'রাজা' উপাধি দেন। সেই থেকে ইনি রাজা মানিকচাঁদ বলে খ্যাত হন।

সিরাজদ্দৌলা বাংলার নবাব হলে ইনি ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৭৫৬ সালের জুন মাসে নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে দখল করলে রাজা মানিকচাঁদকে নবাব কলকাতার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। মানিকচাঁদ সিরাজদ্দৌলার সৈন্যবাহিনীতে সেনাপতি হয়ে এসেছিলেন। ১৭৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন মাদ্রাজ থেকে এসে কলকাতা পুনর্দখল করেন। সেই পর্যন্ত রাজা মানিকচাঁদ কলকাতায় শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও কলকাতা শহরের ভেতরে থাকেননি। তিনি থাকতেন কলকাতার উপকণ্ঠে বেহালায় — ডায়মন্ড হারবার রোডের উপর অবস্থিত চতুর্দিকে পরিখাবেষ্টিত এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে। সেই বাগানবাড়ি অনেক পরিবর্তিত হয়ে এখনও বর্তমান আছে। এইটিকেই লোকে দেওয়ান বা রাজা মানিকচাঁদের বাগান বলে।

নবাব সিরাজদ্দৌলার কলকাতা অবরোধের সময় তাঁর সেনাপতি রাজা মানিকচাঁদ এই বাগানে ছাউনি করেছিলেন এবং এই ছাউনি থেকেই তিনি হুকুম জারি করেছিলেন যে পুরনো ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ইংরেজ যুদ্ধবন্দীদের একটা ঘরের ভেতর রাত্রে যেন আটকে রাখা হয় এবং পরের দিন সকালে নবাব-নাজিমের সামনে তাদের হাজির করা হয়। এই হুকুমের ফলেই, ইংরেজরা বলে, 'অন্ধকূপ' হত্যা হয়।

রেভারেন্ড জেমস লঙ লিখে গেছেন : 'মানিকচাঁদের একটি সুন্দর বাগানবাড়ি ছিল বেহালায় ডায়মন্ড হারবার রোডের উপর। তার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।'

মানিকচাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল হাওড়া জেলার উলুবেড়ের কাছে রামনগর গ্রামে। সেখানে এখন তাঁর বংশধরেরা বাস করেন। মানিকরামের একজন বংশধর খুব সুপরিচিত। তিনি ভবানীপুরের বলরাম বসু, যাঁর নামে আদি গঙ্গার একটি ঘাট আছে ও ভবানীপুরে কয়েকটি গলি আছে। মানিকরামের স্ত্রীর নাম মালতীরানী। মানিকরাম মারা যান ১৭৬২ সালে।

মানিকচাঁদের বাগানে অনেক বছর পরে 'ভার্গব' উপাধিধারী একজন অবাঙালি ভদ্রলোক ঘোড়দৌড়ের দেখাদেখি কুকুরদৌড়ের খেলা চালু করেছিলেন। এটা জুয়ো খেলা ছিল। অনেক টাকার বাজি ধরা হতো ঘোড়দৌড়ের মতো। কয়েক বছর চ'লে এ-খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এখন প্রায় বছর দশেক হল সেই জায়গা কিনে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৫০টি ফ্ল্যাট-সমন্বিত এক চারতলা হাউসিং এস্টেট তৈরি করে দিয়েছেন। সেই হাউসিং এস্টেটের নাম হচ্ছে 'পুরাতন কুকুরদৌড় মাঠের হাউসিং এস্টেট'।

মোগলবাগান

নারকেলডাঙা মেন রোডের উপর চড়কডাঙা রোডের উল্টো দিকে এখন যেখানে রেলকর্মচারীদের থাকার বাড়ি হয়েছে সেখান থেকে আরম্ভ করে পূর্বদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এক প্রকাণ্ড বাগান ছিল। এই বাগানের নাম ছিল 'মোগলবাগান'। এখানে এক বৃদ্ধা মোগল মহিলা বাস করতেন, তাই এই নাম। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পিতা অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের মক্কেল ছিলেন। এই মহিলা দাবি করতেন যে তিনি নবাব মীরকাশিমের আরমানি সেনাপতি গুর্গিন (Gregorian) খানের বংশধর। হয়তো পরবর্তীকালে গুর্গিন খানের বংশধরেরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

মোগলবাগানের পশ্চিম ধারের উপর দিয়ে বালিগঞ্জ-দমদম রেললাইন চলে যাওয়াতে মোগলবাগান নষ্ট হয়ে যায়।

বাগান না-থাকলেও নারকেলডাঙার ওই অঞ্চলটিকে এখনও লোকে বলে থাকে মোগলবাগান। এই মোগলবাগানে 'বাঁশের কেল্লা' পালায় অভিনয় করতে করতে যাত্রাসম্রাট ফণিভূষণ (মুখোপাধ্যায়) বিদ্যাবিনোদ ('বড় ফণী') ১৯৬৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে দশটার সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে মারা যান। এঁর দেশ ছিল হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি। প্রথম জীবনে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। মারা যান স্ত্রী ও এক বিধবা কন্যা রেখে।

মহীশূর উদ্যান ও মহীশূর স্মারক-ঘাট

আদি গঙ্গার তীরে ও কেওড়াতলা বা সাহানগর শ্মশানের সামান্য দক্ষিণে এই উদ্যান ও ঘাট অবস্থিত। গঙ্গাতীরে ঘাট ও চাঁদনী কর্নাটকী স্থাপত্য-শৈলীতে প্রস্তুত। কষ্টিপাথরের অপূর্ব কারুকার্যময় স্মৃতি-তোরণ কর্নাট প্রদেশের হালেবিদ ও বেলুড়ের মন্দিরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সাহানগর রোড থেকে উদ্যানের প্রবেশপথ দাক্ষিণাত্য রীতির আর-একটি অপূর্ব তোরণ। ভিতরে প্রশস্ত উদ্যান।

এই উদ্যানে শবদাহের জন্য কলকাতায় প্রথম বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপিত হয় ২,৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় এই বৈদ্যুতিক চুল্লির উদ্বোধন করেন ৭.৮.১৯৫৬ তারিখে। ২ ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রিটে যে-শবদাহের চুল্লি আছে সেটি গ্যাসের চুল্লি। সেখানে গ্যাসে মড়া পোড়ানো হয়। এটি তৈরি করা হয়েছিল বিলেত-ফেরত ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের জন্য। তাঁরা সাধারণ হিন্দুর মতো শ্মশানে পুড়তে চাইতেন না। গ্যাসে খরচা বেশি, বিদ্যুতে খরচা কম।

আজ পর্যন্ত একটি লোকও লিখিতভাবে জিজ্ঞাসা করেননি সাহাপুরের মহীশূর উদ্যান ও স্মারক-ঘাট কী জন্য হয়েছে। এই অবাঙালি স্থাপত্যের নিদর্শন বাঙালি-প্রধান কলকাতার প্রাচীন শ্মশানের পাশে আদিগঙ্গার পবিত্র তীরে উড়ে এসে জুড়ে বসল কেন? স্মারক-ঘাট নাম কেন? কোথায় মহীশূর আর কোথায় কলকাতা? এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের কৌতূহল একজনের মধ্যেও দেখলাম না। কলকাতার ইতিহাস অনেকে লিখেছেন, এখনও লিখছেন। একজন ঐতিহাসিকও এ-প্রশ্ন উত্থাপন করেননি।

মহীশূরের মহারাজা হিজ হাইনেস কর্নেল স্যার চামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ারকে বাহাদুর, জি. সি. এস. আই. কলকাতায় এসেছিলেন ২১ কি ২২ ডিসেম্বর ১৮৯৪ সালে তখনকার বড়লাট লর্ড এলগিনের সঙ্গে কোনো কারণে সাক্ষাৎ করবার জন্য। তিনি উঠেছিলেন চৌরঙ্গির শ্রীমতী মঙ্কের হোটেলে। এখানে তাঁর ডিপথিরিয়া হয় ও তিনি মারা যান ২৮.১২.৯৪ তারিখে ৩৩ বছর বয়সে। তাঁকে কেওড়াতলা শ্মশানে সামান্য লোকের মতো দাহ করা তো সম্ভব ছিল না। তাই তার কাছে আদিগঙ্গার তীরে তাঁকে দাহ করা ও জমি কিনে দাহস্থানের উপর ঘাট নির্মাণ ও উদ্যান রচনা করা হয়।

প্রসঙ্গত, শ্রীমতী মঙ্কের তখন কলকাতায় অনেকগুলি হোটেল ছিল। চৌরঙ্গি রোডের উপরেও ছিল। মধ্যেখানে ছিল থিয়েটার রয়্যাল ও থিয়েটারের দুপাশে ছিল শ্রীমতী মঙ্কের দুটি হোটেল। এই দুই হোটেল ও থিয়েটার কিনে নিয়ে সে-বাড়িগুলিকে ভেঙে সেই জমিতে একজন আর্মেনিয়ান বর্তমান গ্র্যান্ড হোটেল তৈরি করেন।

আনন্দমোহন বসুর বাগানবাড়ি

আনন্দমোহন বসু দমদমার ক্লাইভ হাউসের উত্তরে ৭০ বিঘে জমি-সমেত এক বাগানবাড়ি কেনেন। সেই বাগানবাড়ির নাম ছিল 'ফেয়ারি হল'। ১৮৪৮ সালে এই বাড়ি ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস লেসলি ফ্রিথ নামে এক সাহেবের। এই বাড়িতে আগে সিন্ধু দেশের হায়দ্রাবাদ, খয়েরপুর ও মীরপুরের তিন আমিরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের গদিচ্যুত করা হয় ১৮৪৩ সালে। একতলার একটি ঘরে লোহার গরাদে দেওয়া একটি ঘেরা জায়গা ছিল। সেখানে আমিরদের চিতাবাঘ বাঁধা থাকত। ১৯২০ সালের গোড়ার দিক থেকে এই বাগানবাড়ি ব্রিটিশ অ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন লিমিটেডের সম্পত্তি।

টিপু সুলতানের পুত্রদ্বয়ের আবাস

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ১৭৯০ সালে আরম্ভ হয়ে শেষ হয় ১৭৯২ সালে। গর্ভনর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস স্বয়ং এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি দক্ষ সেনাপতি ছিলেন, তবুও যুদ্ধ শেষ হতে এত বিলম্ব হয়। টিপু সুলতান পরাজিত হয়ে ইংরেজদের তাঁর অর্ধেক রাজত্ব ও তিনশো ত্রিশ লক্ষ টাকা খেসারত দিতে স্বীকার করে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সন্ধির শর্তগুলি যাতে ঠিকমতো পালিত হয় তার জন্য জামিন-স্বরূপ তাঁর দুই বালকপুত্রকে লর্ড কর্নওয়ালিসের হাতে সমর্পণ করতে টিপু সুলতান বাধ্য হন। এই দুই পুত্র হচ্ছেন দ্বিতীয় পুত্র শাহাজাদা আবদুল খালেক ও চতুর্থ পুত্র শাহজাদা মৈজুদ্দিন। লর্ড কর্নওয়ালিস কলকাতায় ফিরে আসবার সময় এই দুই শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

ফৌজদারি কাউনসেল হিসেবে নাম করা ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সেন (এস. কে. সেন) আলিপুরের নিউ রোডে ঢুকেই বাঁ-হাতি এক নম্বর বাড়িতে বাস করতেন। এ বাড়িটি তাঁর নিজের ছিল — নাম 'সেনহাটি হাউস', তিনি খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামের লোক ছিলেন বলে।

প্রায় দুশো বছর আগে ঠিক এই জায়গায় এক বড় বাড়ি ছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস টিপু সুলতানের দুই বালক পুত্রকে দুর্গের ভিতর বা কারাগারে না-রেখে এই বাড়িতে রেখেছিলেন ১৭৯২ সালে। অবশ্য প্রচুর পাহারার বন্দোবস্ত ছিল যাতে এঁরা পালিয়ে যেতে না-পারেন। তাছাড়া সামনেই ছিল আলিপুর ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ প্রান্ত, যাতে করে সামান্য গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের তলব করা যেতে পারে। পরে সন্ধির শর্তগুলি ঠিকমতো পালিত হলে পুত্রদ্বয়কে সেরিঙ্গাপটমে পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কাবুলের আমিরের আবাস

এই কাবুলের আমিরের নাম দোস্ত মহম্মদ খাঁ। এঁর জন্ম ১৭৯৯ সালে। ইনি ছিলেন বরাকজাই কৌমের লোক। এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শাহ সুজা ছিলেন সদকজাই বা আবদালি বা দুররানি কৌমের। তিনি ছিলেন আমেদ শা আবদালি বা দুররানির নাতি। আফগানিস্থান থেকে পালিয়ে গিয়ে ১৮০৯ সাল থেকে তিনি লুধিয়ানায় ইংরেজদের আশ্রয়ে বাস করছিলেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ কাবুল ও গজনি ১৮২৬ সালে দখল করেন। ১৮৩৫ সালে আফগানিস্থানের আমির উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮৩৯-৪২ সালের প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় তিনি কাবুলে ব্রিটিশ দূত স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটনের কাছে ৩.১১.১৮৪০ তারিখে আত্মসমর্পণ করেন। কাবুল থেকে তাঁকে ১২.১১.১৮৪০ তারিখে রওনা করে পরবর্তী মার্চের প্রথম সপ্তাহে লুধিয়ানায় আনা হয়। সেখানে তাঁর বাদবাকি অনুচরদের রেখে দিয়ে তাঁর পরিবারের কয়েকজন লোকের সঙ্গে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় ২২.৫.১৮৪১ তারিখে। কলকাতায় তাঁকে রাজবন্দী করে রাখা হয় ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোডের বাড়িতে। এখানে তিনি অনবরত অসুখে ভোগেন। অগত্যা তাঁকে লুধিয়ানায় যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন ২২.৯.১৮৪১ তারিখে।

অতএব দোস্ত মহম্মদ খাঁ ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোডের বাড়িতে থাকেন ২২.৫.১৮৪১ থেকে ২১.৯.১৮৪১ পর্যন্ত ঠিক চারমাস। তিনি এখানে যতদিন ছিলেন, নমাজ পড়তে যেতেন তাঁর বাড়ির একটু দক্ষিণে ৩৯ ডায়মন্ড হারবার রোডে টিপু সুলতান বংশের সাহানী বেগমের মসজিদে। মসজিদটি তৈরি হয় ১৮৩৭ সালে। মসজিদটি এখনও আছে। কলকাতায় টিপু সুলতানের বংশধরদের নির্মিত অন্যান্য মসজিদের মতোই এ-মসজিদটিও কর্নাটকী গঠন-পদ্ধতির উদাহরণ।

ওদিকে আফগানিস্থানের ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট স্যার আলেকজান্ডার বার্নস নিহত হন ২.১১.১৮৪১ তারিখে। ব্রিটিশ রাজদূত স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটনকে দোস্ত মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আকবর খাঁয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় হত্যা করা হয়। কাবুলে যত ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ ছিল তাদের জেলে বন্দী করা হয়। সেইজন্য দোস্ত মহম্মদকে লুধিয়ানায় তাঁর লোকজনদের সঙ্গে মিলতে দেওয়া হয় না। তাঁকে সাহারানপুরে আটক করা হয়। শেষে ১৮৪২ সালের মার্চ মাসে তাঁকে মুসৌরি পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। লর্ড তাঁকে মুক্তি দেন ১৫.১১.১৮৪২ তারিখে। তিনি লাহোর হয়ে আফগানিস্থানে পৌঁছান ১৮৪৩ সালের গোড়ায়। কাবুলে গিয়ে আবার গদিতে বসেন আমির হয়ে।

কলকাতায় ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোডের যে-বাড়িতে দোস্ত মহম্মদ খাঁকে বন্দী করে রাখা হয় সে-বাড়িকে কলকাতায় লোকেরা বলত 'কামান-পোঁতা বাড়ি' বাড়ির সদর ফটকের সামনে দুটো কামান থাকার দরুন। তাছাড়া, এই বাড়ির সামনেই ছিল আলিপুর ক্যানটনমেন্টের উত্তর প্রান্ত, যাতে করে সামান্য গণ্ডগোলের সূচনা দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সৈন্য তলব করা যায়।

পরে এই বাড়ি গভর্নমেন্ট অযোধ্যার গদিচ্যুত রাজা ওয়াজিদ আলি শাকে বসবাস করবার জন্য দেন। কিন্তু ওয়াজিদ আলি শা এ-বাড়ি নেননি। অনেক হাত বদলের পর এ-বাড়ি শেষ পর্যন্ত বর্তমান মালিকের হাতে এসেছে। বর্তমান মালিক হচ্ছেন ড. এম. ব্যানার্জি।

বিজয় মঞ্জিল

বর্ধমানের মহারাজার কলকাতার প্রাসাদ। এখন মাত্র প্রাসাদটুকু ও তার সংলগ্ন সামান্য কিছু জমি বর্ধমানের মহারাজার আছে। বাকিসব বিক্রি হয়ে গেছে, জমিদারি যাবার ফলে। সে জায়গায় এখন মেলাই বড় বড় বাড়ি উঠেছে।

কিন্তু যখন সমস্তটাই বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের সম্পত্তি ছিল তখন তাতে ৭২ বিঘা জমি ছিল। বিজয় মঞ্জিল তৈরি হয় ১৯০৩ সালে। তখন এর প্রবেশপথ ছিল আলিপুর জজ কোর্টে। বাড়ির নম্বর ১ জজ কোর্ট রোড। এখন সে-ফটক বন্ধ। বর্তমান প্রবেশপথ ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর। দক্ষিণ পাশের রাস্তার নাম এখনও বর্ধমান রোড।

পূর্বে এখানে আর্মেনিয়ান আপকার সাহেবের বাগানবাড়ি ছিল। আপকার সাহেবের বাড়ি ১৮৯৭ সালের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপরে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহাতাব আপকারের সম্পত্তি কিনে ১৯০৬ সালে প্রাসাদ তৈরি করেন। তাই এর নাম হয়েছে 'বিজয় মঞ্জিল'।

কিন্তু বিজয় মঞ্জিলের অন্য এক পূর্ব-ইতিহাস পাওয়া যায়। খিদিরপুরের 'বাকুলিয়া হাউস'-নিবাসী বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রায় অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর (২৮.৪.১৮৫০ - ১.১০.১৮৯৯) 'আলিপুর ভিলা' নামক সুরম্য বাগানবাড়ি তৈরি করে ১৮৯০ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই বাড়িতে বাস করেন। মুখুজ্যেরা বলেন সেই বাগানবাড়িই এখন বর্ধমানের মহারাজার বিজয় মঞ্জিলের অংশ।

সঞ্জীবনী সভা বা হামচুপামুহাফ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীতে লিখেছেন :

> ১৮৭৫ সনের শেষার্ধে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র-মহলে মাৎসিনী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্দেশে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'আর্য্যদর্শনে' (ভাদ্র ১২৮২) মাৎসিনীর আত্মজীবনী অবলম্বনে ধারাবাহিকভাবে 'জোসেফ ম্যাটসিনি ও নব্য ইটালী' প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। স্বাধীনতাকামী যুবসমাজ প্রেরণা লাভ করিয়া বিপ্লবী মাৎসিনীর 'কার্বোনারি'র অনুকরণে দেশের স্থানে স্থানে গুপ্তসভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ সনে (?) যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠনঠনের এক পোড়ো বাড়িতে হামচুপামুহাফ বা সঞ্জীবনী সভা নামে এই ধরনের একটি গুপ্তসভা স্থাপন করেন। ইহার সভাপতি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র সভার সভ্য ছিলেন। নিয়মানুযায়ী সভ্যগণকে তাহাদের আয়ের দশমাংশ সভাকে দিতে হইত। (ক্রিশ্চানদের 'টাইদ' ও মুসলমানদের 'জাকাত' স্মর্তব্য — রা. মি.)। এই সভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

> ‘জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত।’

সঞ্জীবনী সভা সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> যে দিন নূতন কোন সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল। তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি ; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারো অধিকার ছিল না।
>
> আদি ব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে মোমবাতি বসানো ছিল ... সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—‘সংগচ্ছধ্বম সংবদধ্বম্’। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য্য (অর্থাৎ কিনা গল্প-গুজব) আরম্ভ হইত।

> ‘কার্য্য বিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় ‘সঞ্জীবনী সভা’কে ‘হামচুপামুহাফ’ বলা হইত’।— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সভা কোথায় বসত? রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ — কেউই বলেননি কোন বাড়িতে এই সভা বসত। এ-বিষয়েও বোধ হয় সকলে মন্ত্রগুপ্তি করেছেন। শুধু জানা যাচ্ছে যে বাড়িটা ছিল একটা পোড়োবাড়ি, আর সেটা ছিল ঠনঠনেতে। পোড়োবাড়ি মানে যে-বাড়িতে লোক বাস করে না — বাসিন্দাহীন বাড়ি।

আমার বক্তব্য এই বাড়িটি হচ্ছে বিখ্যাত ১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়ি। এই বাড়ি যেখানে সে-জায়গাটাকেও ঠনঠনে বলা হয়। এই বাড়ির ভেতরের অংশে সঞ্জীবনী সভার প্রতিষ্ঠার সময় ১৮৭৭ (?) সাল পর্যন্ত একটি লোকও বাস করত না। ওপর-নিচে ভেতরের অংশটা সম্পূর্ণ খালি ছিল। এই অংশে লোক বাস করতে আরম্ভ করে ১৮৮০ সালের পর থেকে। শুধু বাইরের অংশে একতলায় একটা স্কুল হতো ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি নামে। স্কুলের সময় ছিল সাড়ে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত। এই স্কুল এখানে ১৮৬১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ছিল। ১.৪.১৮৭২ তারিখে নবগোপাল মিত্র এই বাড়িতে ন্যাশনাল স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল সকালে ও বিকেলে হতো। অর্থাৎ ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমির ক্লাস আরম্ভ হবার আগে ও পরে। এখন যেমন একটা কলেজে প্রাতঃবিভাগ, দিনমান বিভাগ ও সান্ধ্য বিভাগ, কিংবা একই বাড়িতে যেমন সকালে মেয়েদের স্কুল, দুপুরে ছেলেদের স্কুল — অনেকটা সেইরকম। ভেতর-বাড়ির সঙ্গে কোনো স্কুলের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ভেতর-বাড়িটা একবারে খালি পড়ে থাকায় আদি ব্রাহ্মসমাজের পাণ্ডারা মিলে সেখানে গোপনে সঞ্জীবনী সভার কাজ চালাতেন।

আর এই বাড়ির সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের বিশেষ পরিচয় ছিল। কেননা নবগোপাল মিত্র এখানে জাতীয় স্কুল করেছিলেন, আর রাজনারায়ণ বসু এখানে ১৫.৯.১৮৭২

তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বাড়ি ছাড়া এই দুজনের অন্তত এ-অঞ্চলের অন্য কোনো বাড়ির সঙ্গে পরিচয় ছিল না। রাজনারায়ণ ও তাঁর শিষ্য নবগোপাল মিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে এই বাড়ির সন্ধান দেন। লোকে জানে এটা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্যারাক-বাড়ি ছিল। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্যারাক-বাড়ি হবার আগে এটা যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের স্বাদেশিকতার লীলাভূমি ছিল অন্তত কয়েক বছরের জন্য, এটা লোককে জানতে দেওয়া হয়নি।

রাজনারায়ণ বসুর কথাতেই আমার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন : 'এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনেক ব্রাহ্ম ঐ বাটীতে (১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের — রা. মি.) বাস করেন। আমি যখন বক্তৃতা করি তখন উহাতে হিন্দু ট্রেনিং ইনস্টিটিউশান হইত।' এখানে তিনি একটা স্কুল ছাড়া অন্য কোনো লোকের থাকার কথা বলেননি।

মানিকতলার বাগান

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন :

> রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল ... প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরাণী রাশীকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়া আমাদের উপবাস করিতে হয় নাই।
>
> মানিকতলায় প'ড়ো বাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোন একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চ নীচ নির্বিচারে সকলেই একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।
>
> ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট এবং কিছু কাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালীকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ওরে ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন?' মালী তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, 'আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।' ব্রজবাবু কহিলেন, 'আচ্ছা ডাব পাড়িয়া আন।' সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

এ-ঘটনা ঘটেছিল মানিকতলার কোন বাগানে? মনে রাখতে হবে ফেরবার পথে সকলে এই বাগানে ঢুকেছিলেন। সুতরাং এ-বাগান থাকার কথা মানিকতলা মেন রোডের পূর্বপ্রান্তে নয়, পশ্চিমপ্রান্তে, কলকাতার কাছাকাছি।

এখন এই বাগানের নাম 'মল্লিক লজ'। প্রকাণ্ড বাগান। ম্যাকিনটস বার্ন-এর তৈরি বাড়ি। এঁরা চিৎপুরের বিখ্যাত ঘড়িওয়ালা বাড়ির মল্লিকের, অর্থাৎ বৈষ্ণবদাস মল্লিকের বংশ।

দুই ইটালিয়ানের বাড়ি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'-তে লিখেছেন :

> তখন কলকাতায় ওয়েল্‌সলি পার্কের কাছে মাদ্রাসা কলেজ, সামনে একটা দিঘি, তার পারে ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলার্ডি সাহেবের বাসা। তাঁর কাছে রোজ সকালে যাই, দস্তুরমতো দক্ষিণা দিয়ে প্যাস্টেল ড্রয়িং আর পেন্টিং শিখি। বেশ ঘরের লোকের মতই আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন সাহেব। স্টুডিওর একদিকে আমি বসে ছবি আঁকি ; অন্যদিকে তাঁর মেম ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছেন ; দু-একটি আবার স্কুলে যায়, তাদের খাইয়ে তৈরি করে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, কখনো-বা আমার গাড়ি করে বাজারটা ঘুরে আসছেন। সে বাড়ির নীচের তলায় থাকে মান্ধাটা নামে এক বুড়ো ইটালিয়ান মিউজিক মাস্টার আর তার মেয়ে। বুড়ো বাপেতে মেয়েতে থাকে বেশ। রোজ সকালে মেয়ে পিয়ানো বাজায়, বাপ বাজায় বেহালা। সুর আসে ভেসে, উপরে বসে আমি সেই বিলিতি সুর শুনি আর ছবি আঁকি। একদিন সকালে রোজকার মতো ছবি আঁকছি, নীচে থেকে বেহালার সুর এলো কানে, উদাস করে দিলো। হাত বন্ধ করলুম তুলি টানার কাজ থেকে। সুর তো নয়, যেন বেহালাটা কাঁদছে। সেদিন সে সুর স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো বেহালার ছড়ি বেহালার তার আর যে বাজাচ্ছে তারও মানস-তন্ত্রী এক হয়ে গেছে। আজ আর পিয়ানো নেই সঙ্গে। গিলার্ডিকে বললুম, 'সাহেব আজ বেহালা যেন কাঁদছে মনে হচ্ছে, কেন বলতো? এমনতো শুনিনি কখনও?' সাহেব বল্লেন, 'চুপ চুপ, জানো না বুড়োটির মেয়ে কাল চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে?' সেদিন আর ছবি আঁকা হলো না আমার। খানিক বাদে আস্তে আস্তে নেমে এলুম। সিঁড়ির কাছের ঘরটিতে দেখি বুড়োটি বসে আছে চেয়ারে কাঁধে বেহালাটি রেখে মাথা হেঁট করে, এক মাথা সাদা চুল পাখার হাওয়ায় উড়ছে।

গিলার্ডি ছিলেন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। অবনীন্দ্রনাথ যাঁকে 'মান্ধাটা' বলেছেন, সরলা দেবী তাঁকে বলেছেন 'মাঞ্জাতা' আর ইন্দিরা দেবী বলেছেন 'মাঞ্জাতো'।

এই বাড়ি হচ্ছে ওয়েলেসলি স্কোয়ারের (বর্তমান নাম মহম্মদ মহসীন স্কোয়ার) ৩ নম্বর বাড়ি। এ বাড়িটি এখনও আছে। মহম্মদ মহসীন স্কোয়ারের দক্ষিণে।

কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়

রামমোহন রায়ের কলিকাতায় অবস্থিতি

রামমোহন দেশ হইতে আসিয়া প্রথম কলিকাতায় অবস্থান করেন ১৭৯৭ সনের আগস্ট-মাস হইতে ১৭৯৯ সনের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এই সময়ে তিনি বরাবর কলিকাতায় থাকেন নাই, মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য কলিকাতার বাহিরেও গিয়াছেন।

দ্বিতীয়বার তিনি কলিকাতায় থাকেন ১৮০০ সনের শেষ কিংবা ১৮০১ সনের প্রারম্ভ হইতে ১৮০৩ সনের মার্চ মাসের গোড়া পর্যন্ত। এইসময়ে তিনি ১৮০১ সনে সিভিলিয়ান মিস্টার জন ডিগবির সহিত পরিচিত হন। এইসময়ে তিনি সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান কাজি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান ফার্সি মুন্সি ও মৌলবিগণের সহিত যথেষ্ট মেলামেশা করিতেন।

উপরোক্ত দুইবার কলিকাতায় অবস্থানকালে রামমোহন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ান কর্মচারীদিগকে টাকা কর্জ দিবার ব্যবসা করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গোলকনারায়ণ সরকার নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার কেরানি ও গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক আর-এক ব্যক্তিকে তহবিলদার বা খাজাঞ্চি নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি কোম্পানির কাগজ কেনাবেচার ব্যবসাও করিতেন। ১৭৯৭ সনে তিনি মাননীয় অ্যান্ড্রু র‍্যামজে নামক এক সিভিলিয়ানকে ৭৫০০ টাকা ও ১৮০২ সনে মিস্টার টমাস উডফোর্ড নামক আর-এক সিভিলিয়ানকে ৫০০০ টাকা কর্জ দিয়াছিলেন।

১৮০৩ সনের জুন মাসে, তিনি আবার কলিকাতায় আসেন এবং এখানেই ওই সনের মে-জুন মাসে বর্ধমান শহরে লোকান্তরিত পিতা রামকান্ত রায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করেন। ১৮০৪ সনের প্রথম দিকে তিনি আবার কলিকাতা পরিত্যাগ করেন।

রংপুর ত্যাগ করিয়া রামমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ১৮১৪ সনের জুলাই মাসের শেষে কিংবা আগস্টের প্রথমদিকে। ১৮১৫ সনের মাঝামাঝি তাঁহাকে ভুটানে দৌত্যকার্যে যাইতে হয়। ভুটান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন ওই সনের শেষাশেষি। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাসকালে তিনি বেনিয়ানের ব্যবসা অবলম্বন করেন। দীর্ঘ ১৫ বৎসর কলিকাতায় বাসের পর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন ১৯. ১১. ১৮৩০ তারিখে।

রামমোহনের পূর্ববর্তী কয়েকজন বিলাতযাত্রী

অনেকের ধারণা ভারতীয়দের কিংবা বাঙালিদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। এ-ধারণা ভুল। সেখ ইহ্‌তেশামউদ্দীন নামে একজন বাঙালি মুসলমান ১৭৬৫ সালে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সে গমন করেন ও দেশে ফিরিয়া আসিয়া ফার্সি ভাষায় তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেন।

ইংলন্ডে হেইলেবেরি নামক স্থানে ভারতে চাকরি গ্রহণেচ্ছু সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ নামে এক কলেজ ১৮০৯ সনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওই সনেই তিনজন ভারতীয় মুসলমান শিক্ষক হিসাবে ওই কলেজে যোগদান করেন। তাঁহাদিগের নাম মৌলবি আবদুল আলি, মৌলবি মির্জা খলিল ও মুন্সি গোলাম হায়দার। প্রথম দুইজন ছিলেন কলেজের প্রাচ্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও তৃতীয়জন ছিলেন আরবি-ও ফার্সি-লিপি শিক্ষক। এই তিনজনের ইংলন্ডে চাকরির কাল যথাক্রমে ১৮০৯-১৮১২, ১৮০৯-১৮১৯ ও ১৮০৯-১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ। চতুর্থ একজন ভারতীয় মুসলমান মির্জা মহম্মদ ইব্রাহিম ওই কলেজে ১৮২৬ হইতে ১৮৪৪ সন পর্যন্ত আরবি ও ফার্সি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।

যদি বলা হয় রামমোহন রায় ভারতীয় বা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে প্রথম বিলাতযাত্রী, সে-কথাও ঠিক নয়। রামমোহনের প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বোম্বাইয়ের দুইজন ব্রাহ্মণ বিলাত গিয়াছিলেন। গণেশ দাস নামক একজন বাঙালি হিন্দু ১৭৬৫ সনে কিংবা তাহার কিছু পরে ইউরোপ গমন করেন। ১৭৭৪ সনে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে গণেশ দাস ওই কোর্টের ফার্সি অনুবাদক নিযুক্ত হন। ১৭৭৫ সনের জুন মাসে তিনি রেভারেন্ড কিয়ারন্যান্ডারের নিকট খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা

১. রামমোহন রায়ের দাদা জগমোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় ২৩.৬.১৮১৭ তারিখে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের অ্যাকুইটি বিভাগে রামমোহনের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা রুজু করেন। তাহাতে তিনি রামমোহন রায়ের সম্পত্তির অর্ধাংশ দাবি করেন এই বলিয়া যে রামমোহনের ও তাঁহার পিতার সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তি ছিল। বিচারের শেষ দিনে বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে উপস্থিত না-থাকায় প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট ১০. ১২. ১৮১৯ তারিখে মায় খরচ-খরচা সমেত মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দেন।

২. ওই জগমোহন রায়ের বিধবা পত্নী ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মাতা দুর্গাদেবী ১৩. ৪. ১৮২১ তারিখে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাকুইটি বিভাগে এক মোকদ্দমা দায়ের করেন। তাহাতে তিনি রামমোহনের রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর নামে দুই তালুক নিজের সম্পত্তি বলিয়া দাবি করেন এই অজুহাতে যে এই দুই সম্পত্তি রামমোহন বাদীর নিকট হইতে ৪৫০০ টাকা কর্জ করিয়া খরিদ করেন। ৩০. ১১. ১৮২১ তারিখে খরচ-খরচা সমেত মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যায়।

৩. বর্ধমানাধীশ মহারাজ তেজচন্দ্র রামমোহন ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বিরুদ্ধে ১৬. ৬. ১৮২৩ তারিখে কলিকাতার প্রভিন্সিয়াল কোর্টে ১২,৬০৪ টাকা, ৫৬,৮০৭ টাকা ও ১৫,২০০ টাকা দাবি করিয়া তিনি মামলা রুজু করেন, রামমোহনের স্বর্গীয় পিতার স্বাক্ষরিত তিনটি কিস্তিবন্দী খতের বলে। খরচ-খরচা সমেত মামলা তিনটি খারিজ হইয়া যায়। মহারাজা তেজচন্দ্র সদর দেওয়ানি আদালতে আপিল করেন। সে-আপিলও খরচা সমেত খারিজ হইয়া যায়। প্রথম মোকদ্দমাটি খারিজ হয় ১০. ১১. ১৮৩০ তারিখে ও শেষ দুটি ১০. ১১. ১৮৩১ তারিখে।
৪. শেষ মোকদ্দমা হয় রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের বিরুদ্ধে। বর্ধমান কালেকটরিতে নায়েব-সেরেস্তাদারের পদে অস্থায়ীরূপে কার্য করিবার সময় রাধাপ্রসাদ সরকারি তহবিল তছরুপ করিয়াছিলেন এই অভিযোগে তাঁহাকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করা হয়। মোকদ্দমা ১৮২৫ ও ১৮২৬ এই দুই বৎসর চলে। শেষে রাধাপ্রসাদ নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ যে-যন্ত্রণা ও নির্যাতন পুত্রকে ভোগ করিতে হয় তাহার ফলে পিতা রামমোহনের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ হয়।

কলিকাতায় রামমোহনের বাটী

বিভিন্ন সময়ে কলিকাতায় রামমোহনের নাকি চারিখানি বাড়ি ছিল, যথা: সম্পত্তি বিভাগের সময় তিনি পিতার নিকট হইতে জোড়াসাঁকোয় একখানি বাড়ি পাইয়াছিলেন ; ১৮১৪ সনে রংপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন দুইখানি বাড়ি খরিদ করেন। প্রথমটি চৌরঙ্গীতে হাতাসুদ্ধ একটি দ্বিতল বাটী — এটি শ্রীমতী এলিজাবেথ ফেনউইক নাম্নী এক মহিলার নিকট হইতে তিনি ২০,৩১৭ টাকায় ক্রয় করেন। দ্বিতীয় বাড়িটি ক্রয় করেন সিমলায় ফ্রান্সিস মেন্ডস নামে এক সাহেবের নিকট হইতে ১৩,০০০ টাকায়। চতুর্থ বাড়িটি ছিল তাঁহার বিখ্যাত মানিকতলার উদ্যানবাটী, যেটি তিনি নাকি তাঁহার জ্ঞাতিভাই রামতনু রায়ের দ্বারা সাহেবি ধরনে তৈয়ারি ও সজ্জিত করাইয়াছিলেন।

এই শেষোক্ত বাড়িটির উপরতলায় ছিল তিনটি বড় হল, ছয়টি কামরা, দুইটি বারান্দা ও নিচের তলায় অনেকগুলি কুঠরি ছিল। আর ছিল গুদাম, বাবুর্চিখানা, আস্তাবল প্রভৃতি। আরো ছিল নানাপ্রকার ফলের গাছ ও তিনটি বড় পুষ্করিণী-সমেত ১৫ বিঘা জমির একটি বাগান। এই বাগানবাড়িতে রামমোহন সাড়ম্বরে বাস করিতেন এবং তাঁহার দেশি ও বিদেশি বন্ধুগণকে খানাপিনায় ও নাচগানে আপ্যায়িত করিতেন। বিদেশি পরিব্রাজকগণের মধ্যে ফিট্‌স ক্লারেন্স (আর্ল অব মনেস্টার), ফরাসি বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকমঁ ও ইংরাজ মহিলা ফ্যানি পার্কস এই বাড়িতে রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শেষোক্ত ইংরাজ মহিলা তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ১৮২৩ সনের মে মাসে রামমোহনের এই বাগানবাড়িতে একটি উৎসবের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'বাড়ির বড় হাতার মধ্যে খাসা রোশনাই ও দিব্য আতসবাজী পোড়ানো হইয়াছিল। বাড়ির প্রতিটি ঘরে নাচওয়ালিরা নাচ গান করিতেছিল। এই নাচওয়ালিদের মধ্যে নিকিও ছিল — তাহাকে প্রাচ্য জগতের 'কাটালানি' বলা হইত।' এই বাড়িটি বর্তমানে ১১৩ আপার সার্কুলার রোডের বাড়ি। কলিকাতা পুলিশের উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের আপিস এই বাড়িতে।

১ ও ২ নম্বর বাড়ি অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ি ও চৌরঙ্গির খরিদা-বাড়ি আজ পর্যন্ত শনাক্ত করিতে পারা যায় নাই।

বাকি রহিল সিমলার বাড়ি। বলা হয় এটি রামমোহনের ৮৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাসগৃহ। এই বাটীর গাত্রে একটি মর্মর ফলকে ইংরাজিতে লিখিত আছে 'এই বাড়িতে রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাস করিয়াছিলেন'। পাথরের উপর লিখিত হইলেও এই লেখাটি এই ব্যাপারে 'পাথুরে প্রমাণ' নয় যে রামমোহন এই বাড়িতে বাস করিতেন অথবা এই বাড়ি খরিদ করিয়াছিলেন। প্রথমত, রামমোহন এই বাড়িতে একদিনও যে বাস করিয়াছিলেন তাহার আদৌ কোনো প্রমাণ নাই। তাঁহার জীবনের কোনো ঘটনাই এই বাড়িতে ঘটে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে যাঁহারাই কিছু লিখিয়াছেন তাঁহারাই মানিকতলার বাগানবাড়ির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, মেন্ডিস সাহেবের নিকট হইতে খরিদ করিয়া থাকিলে এই বাড়িও সাহেবি ধরনের বাড়ি হইত। কিন্তু এই বাড়ি আদৌ সাহেবি ধরনের নয়, সম্পূর্ণ বাঙালি ধরনের বাড়ি। তৃতীয়ত, ওই বিশাল অট্টালিকা ও সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সেই যুগেও মাত্র ১৩,০০০ টাকার পাওয়া সম্ভব ছিল না। চতুর্থত, ১৮১৪-১৮১৫ সনে আমহার্স্ট স্ট্রিট নামক রাস্তাই হয় নাই। হইয়াছে ১৮২৩-১৮২৪ সনে। সুতরাং যখন রাস্তাই ছিল না তখন রাস্তার ধারে দুইটি প্রধান ফটক নির্মাণ করা কী রূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা বোধগম্য নয়।

সেইজন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন মানিকতলার বাগানবাড়িই সিমলার বাড়ি, ফ্রান্সিস মেন্ডিস সাহেবের নিকট হইতে ক্রয় করা (সেইজন্য সাহেবি ধরনে নির্মিত ও সজ্জিত — রা. মি.)। ওই বাড়িকে যেরূপ মানিকতলার বাড়ি বলা হয়, সেইরূপ সিমলার বাড়িও বলা যাইতে পারে। কারণ ওই বাড়ি প্রায় সুকিয়া স্ট্রিটের সংলগ্ন এবং সুকিয়া স্ট্রিটের সেকালে নাম ছিল 'বাহির সিমলা'। এই বাড়ি বিক্রয়ের যে বিজ্ঞাপন ৯. ১. ১৮৩০ তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও বলা হইয়াছিল 'অপার সার্কুলার রোড সিমলা মাণিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান'।

তৎসত্ত্বেও যদি মানিকতলার বাড়িকে সিমলার বাড়ি বলিয়া স্বীকার করিতে একান্তই আপত্তি হয়, তাহা হইলে ৮৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ির বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পূর্বদিকে, রামমোহন এক বাড়ি খরিদ করিয়া থাকিতে পারেন। সেইটিকে হয়তো রামমোহনের সিমলার বাড়ি বলা হইত। ১৮৫৭ সনের কলিকাতার ডিরেক্টরিতে আমহার্স্ট স্ট্রিটের পূর্বদিকে তখনকার ৪৮ নম্বর বাড়িটি, সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল মিস্টার রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ি বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ওই বাড়ি কে করিয়াছিলেন — রামমোহন রায়, না রমাপ্রসাদ রায় তাহা জানিবার উপায় নাই। ওই ডিরেক্টরি অনুসারে ৮৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটের জমির উপর কাহারও বাড়ি ছিল না, রামমোহনের তো নয়ই। তখন ওই জায়গাটার নম্বর ছিল ৬০ আর সেখানে একটি লবণের চৌকি ছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি সম্বন্ধে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (যিনি নিজে রামমোহন রায়ের পৌত্রীর প্রপৌত্র, সুতরাং ওই বংশেরই সন্তান) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, 'সত্যই কি ওই বাড়ী রামমোহনের বাড়ী?' এবং মন্তব্য করিয়াছিলেন যে 'রামমোহনের আত্মীয়স্বজন ও বংশধরদের মধ্যে এই কথাই প্রচলিত আছে যে বাড়ীটি প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের, রামমোহনের মৃত্যুর অনেক পরে

তিনি ওই বাড়ী তৈয়ারি করেন'। তিনি আরো লিখিয়াছিলেন, 'এ কথার একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ১৮৫২ সনে মারা যাইবার পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় রাধাপ্রসাদের ওয়ারিশানদিগের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে পৈতৃক যৌথ বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার এক মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় যৌথ সম্পত্তির যে ফর্দ দাখিল করা হইয়াছিল তাহাতে ওই বাড়ীর কোন উল্লেখ ছিল না।' তপনমোহনের জীবদ্দশায় তাঁহার কথার খণ্ডন বা প্রতিবাদ কেহই লিখিতভাবে করেন নাই। তপনমোহন পরোক্ষ প্রমাণের কথাই বলিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা জানিতেন না। তাঁহার কথা শুনিয়াই আমার এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের স্পৃহা জাগে। ফলে আমি ১৮৫৭ সনের ডিরেক্টরিতে তপনমোহনের উক্তি যে যথার্থ তাহার প্রমাণ পাই। শুধু ১৮৫৭ সনের ডিরেক্টরিই নয়, প্রায় সমসাময়িক একটি কলিকাতার মানচিত্র হইতেও ওই একই কথা প্রমাণিত হয়। ১৮৪৭-৪৯ সনে এফ. ডবলিউ. সিমসের মানচিত্রে ৮৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটের স্থলে কতকগুলি একতলা কাঁচা বাড়ি দেখানো আছে। একটিও পাকা দোতলা বা তিনতলা বাড়ির চিহ্ন মাত্র নাই। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে ১৮৫৭ হইতে ১৮৬২ সনের মধ্যে কোনো একসময়ে সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান সরকারি উকিল প্রভৃত বিত্তশালী রমাপ্রসাদ রায় বর্তমান ৮৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটের প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে তিনি পূর্বদিকের সামান্য একটি বাড়িতে বাস করিতেন। ওই বাড়িটি দীর্ঘকাল যাবৎ রায়বাবুদের কাছারিবাড়ি বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

পরিশেষে বক্তব্য হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে যে-বাড়িতে রামমোহনের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল বসিত সেই বাড়িটি কলিকাতায় রামমোহনের চারিটি বাড়ির মধ্যে কেহ গণ্য করেন নাই। অথচ ৬. ১০. ১৮৩৯ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার বিবরণে পাইতেছি যে, এই সভার অধিবেশন হইত প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তাহার পর সিমুলিয়াস্থ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের, তাহার পর হেদুয়ার দক্ষিণস্থ রামপ্রসাদ রায়ের বাটীতে এবং সর্বশেষে সমাজগৃহে স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে রমানাথ ঠাকুরের ভবনে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই বাড়িটি রামমোহনেরই ছিল। অতএব এই বাড়িও তাঁহার সিমলার বাড়ি হইতে পারে।

রামমোহনের কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র

১. The Brahmunical Magazine or the Missionary and the Brahmun, Nos. I. II. and III — ব্রাহ্মণ সেবধিঃ ব্রহ্মেণ ও মিশনারি সংবাদ (সংখ্যা ১, ২, ৩) ১৮২১। প্রথম তিন সংখ্যা বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই ১৮২১ সনে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংখ্যা শুধু ইংরাজিতে প্রকাশিত হয় ১৫.১১.১৮২৩ তারিখে।

২. সম্বাদকৌমুদী (সাপ্তাহিক) — ৪.১২.১৮২১।

৩. মীরাৎ-উল-আখবার (বাংলা দেশে পারস্য ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক) — ১২.৪.১৮২২। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৪.৪.১৮২৩ তারিখে। ধর্মতলা স্ট্রিট হইতে প্রকাশিত হইত।

৪. রামমোহন রায় ৯.৫.১৮২৯ হইতে ৩০.৭.১৮২৯ তারিখ পর্যন্ত Bengal Herald-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার সভা

১. আত্মীয়সভা — মার্চ, ১৮১৫।
২. ইউনিটেরিয়ান কমিটি — সেপ্টেম্বর, ১৮২১।
৩. ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্ম সমাজ — ২০.৮.১৮২৮ তারিখে (বাংলা ৬ ভাদ্র) জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ির ভাড়া করা দুইখানি বাহিরের ঘরে। ওই বাড়ির বর্তমান নম্বর ২২৮ আপার চিৎপুর রোড।
৪. জোড়াসাঁকোর নিজস্ব গৃহে (৫৫/১ আপার চিৎপুর রোড) ব্রাহ্ম সমাজ স্থানান্তরিত হয়— ২৩.১.১৮৩০ তারিখে (বাংলা ১১ মাঘ)।

রামমোহনের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১. হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে অবৈতনিক ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮২২ সনে। মিস্টার উইলিয়াম অ্যাডাম এই স্কুলের দুইজন পরিদর্শকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 'ক্যালকাটা জার্নালে'র সহকারী সম্পাদক এবং বিলাতে রামমোহন রায়ের সেক্রেটারি মিস্টার স্যান্ডফোর্ড আর্নট এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এই স্কুলে চারিটি শ্রেণী ছিল। ১৮২৭ সনে এই স্কুলে মাত্র দুইজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের বেতন ছিল মাসিক ১৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় জনের ৭০ টাকা। ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬০ হইতে ৮০। ১৮২৮ সনে রামমোহনের সহিত মতভেদ হওয়ায় মিস্টার অ্যাডাম এই স্কুলের পরিদর্শকের পদ ত্যাগ করেন। ১৮২৮ ও ১৮২৯ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামমোহনের কনিষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদ রায় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৮৩০ সনে বিলাত যাত্রাকালে রামমোহন প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মিত্রের উপর এই স্কুল পরিচালনার ভার দিয়া যান। পূর্ণচন্দ্র মিত্র এই স্কুলের নাম পরিবর্তন করিয়া ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি রাখেন। নবীনমাধব দে বা দেব প্রথমে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে শিক্ষক হন। প্রধান শিক্ষকের সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়ায় তিনি এই স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজে একটি স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৩৭ সনে পূর্ণচন্দ্র মিত্রের ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমিতে এক বৎসর ও ১৮৩৮ সনে নবীনমাধব দে'র স্কুলে প্রায় এক বৎসর পাঠ করেন।
২. সংস্কৃত কিংবা বাংলা ভাষায় বেদান্ততত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য রামমোহন ১৮২৬ সনের জুন বা জুলাই মাসে বেদান্ত কলেজ স্থাপিত করেন।

জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশন স্থাপনে রামমোহনের সাহায্য

পাদরি আলেকজান্ডার ডাফ ২৭.৫.১৮৩০ তারিখে কলকাতায় আসিয়া একটি ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে দেশি পাড়ায় একটি বাড়ির সন্ধান করিতেছিলেন কিন্তু পাইতেছিলেন না। রামমোহনকে ধরিলে রামমোহন তাঁহাকে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ির বাহিরের দুইখানি খালি ঘর — যেখানে পূর্বে রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজ ভাড়া ছিল — ডাফ সাহেবকে পূর্বাপেক্ষা

কম ভাড়ায় সংগ্রহ করিয়া দেন। নিজের বন্ধুদিগকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাঁহাদের পুত্রগণকে ডাফের স্কুলের প্রথম ছাত্ররূপে সংগ্রহ করিয়া দেন। প্রথমে মাত্র পাঁচজন ছাত্র পাওয়া গিয়াছিল। ডাফ সাহেব এই পাঁচটি ছাত্র লইয়া ওই দুখানি ভাড়া ঘরে ১৩.৭.১৮৩০ তারিখে তাঁহার স্কুল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে রামমোহন প্রথম হইতেই উপস্থিত ছিলেন। ডাফ সাহেব বাইবেল হইতে 'প্রভুর প্রার্থনা' আবৃত্তি করিলেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি হইল না। কিন্তু তাহার পর যখন তিনি ছাত্রগণের হস্তে বাইবেল দিয়া তাহাদের পড়িতে বলিলেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে আপত্তিসূচক মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উথিত হইল। রামমোহন তখন ছাত্রদিগকে বলিলেন, 'ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসনের মতো খ্রিস্টান সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি হিন্দু হন নাই। আমি নিজেই সমগ্র কোরান বারম্বার পাঠ করিয়াছি তাহার ফলে আমি কি মুসলমান হইয়া গিয়াছি? আমি সমগ্র বাইবেল আগাগোড়া পাঠ করিয়াছি কিন্তু তোমরা জানো আমি খ্রিস্টান হইয়া যাই নাই। তাহা হইলে তোমরা বাইবেল পড়িতে ভয় পাইতেছ কেন? উহা পাঠ করো ও নিজেরাই বিচার করিয়া দেখো।'

এই কথা শুনিয়া আপত্তিকারীরা নীরব হইল। ইহার পর রামমোহন পরবর্তী পুরা দেড় মাসকাল প্রতিদিন সকাল দশটায় যখন বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হইত — ডাফের স্কুলে উপস্থিত থাকিয়াছেন। পরেও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতেন।

এই সূত্রে উল্লেখ্য যে চার্চ অব স্কটল্যান্ডের প্রথম মিশনারিরূপে ডাক্তার আলেকজান্ডার ডাফকে কলিকাতায় আনাইবার ব্যাপারে রামমোহনেরও কিছু হাত ছিল। রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিল বলিয়া চার্চ অব ইংল্যান্ড ও ব্যাপটিস্ট চার্চের সহিত তাঁহার বনিবনা হইত না। কারণ এই দুটি চার্চ ত্রিশ্বরবাদী। কিন্তু চার্চ অব স্কটল্যান্ড বা প্রেসবিটিরিয়ান চার্চ ত্রিশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন এই চার্চের পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকী কলিকাতায় সেন্ট অ্যানড্রুজ চার্চের তিনি মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন। এই গির্জায় যাইয়া উপাসনা করিতেন। এই গির্জার পাদরি ডক্টর ব্রাইস ১৮২৪ সনে স্কটল্যান্ডে জেনারেল অ্যাসেমব্লির নিকট ব্রিটিশ ভারতে একজন মিশনারি পাঠাইবার জন্য আবেদন পাঠান। তৎপূর্বে ৮.১২.১৮২৩ তারিখে রামমোহন ডক্টর ব্রাইসের ওই আবেদন লিখিতভাবে সমর্থন করেন।

রামমোহন রায়ের বাংলা রচনাবলি

প্রকাশস্থান : কলিকাতা

১. বেদান্ত গ্রন্থ, ১৮১৫
২. বেদান্তসার, ১৮১৫
৩. তলবকারোপনিষদ্ (কেনোপনিষৎ), জুন, ১৮১৬
৪. ঈশোপনিষদ্, জুলাই, ১৮১৬
৫. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, মে, ১৮১৭
৬. কঠোপনিষদ্, আগস্ট, ১৮১৭
৭. মাণ্ডুক্যোপনিষদ্, অক্টোবর, ১৮১৭

৮. গোস্বামীর সহিত বিচার, জুন, ১৮১৮
৯. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ, নভেম্বর, ১৮১৮
১০. গায়ত্রীর অর্থ, ১৮১৮
১১. মুণ্ডকোপনিষদ্, মার্চ, ১৮১৯
১২. শঙ্করাচার্যের 'আত্মানাত্ম' বিবেক-এর বাংলা অনুবাদ, ১৮১৯ (?)
১৩. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, নভেম্বর, ১৮১৯
১৪. কবিতাকারের সহিত বিচার, ১৮২০
১৫. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, ১৮২০
১৬. চারিপ্রশ্নের উত্তর, মে, ১৮২২
১৭. প্রার্থনা পত্র, মার্চ, ১৮২৩
১৮. পাদরি ও শিষ্য সংবাদ, ১৮২৩ (?)
১৯. গুরু পাদুকা, ১৮২৩ (অপ্রাপ্য)
২০. পথ্য প্রদান, ডিসেম্বর, ১৮২৩
২১. ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, ১৮২৬
২২. কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয় বিচার, ১৮২৬
২৩. ব্রজসূচী (১ম নির্ণয়), বৌদ্ধ ব্রজসূচী উপনিষদের বঙ্গানুবাদ, ১৮২৭
২৪. ব্রহ্মোপাসনা, ১৮২৮
২৫. ব্রজসঙ্গীত, ১৮২৮
২৬. অনুষ্ঠানে, ১৮২৯
২৭. সহমরণ বিষয়ে, ১৮২৯
২৮. গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ১৮৩৩
২৯. ভগবদ্‌গীতার পদ্যে (অনুবাদ), অপ্রাপ্য

সংস্কৃত গ্রন্থাবলি

প্রকাশস্থান : কলিকাতা

১. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (তিনখানি পুস্তিকা), ১৮১৬-১৭
২. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, ১৮২০
৩. গায়ত্রাপরমোপাসনা বিধানং, ১৮২৭
৪. ক্ষুদ্র পত্রী, প্রকাশকাল অজ্ঞাত
(উপনিষদের দুই শ্লোক ও রামমোহন বিরচিত দুইটি শ্লোক)

হিন্দি গ্রন্থাবলি

প্রকাশস্থান : কলিকাতা

১. বেদান্ত গ্রন্থ (বাংলা বেদান্ত গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদ), ১৮১৫ (?) অপ্রাপ্য
২. বেদান্তসার (বাংলা বেদান্তসারের হিন্দি অনুবাদ), ১৮১৫ (?) অপ্রাপ্য
৩. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (সংস্কৃত পুস্তিকার হিন্দি অনুবাদ), ১৮২০

ইংরেজি গ্রন্থাবলি
প্রকাশস্থান : কলিকাতা

১. Translation of an Abridgement to the Vedant or resolution of all Vedas, 1816.
২. Translation of the Cena Upanishad, 1816.
৩. Translation of the Ishopanishad, 1816.
৪. A Defence of Hindoo Theism, 1817.
৫. A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas, 1817.
৬. Counter-Petition of the Hindoo inhabitants of Calcutta against Suttee (রামমোহনের রচনা বলিয়া প্রচলিত), 1818.
৭. Translation of a Conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of Burning Widows Alive : from the original Bangla, 1818.
৮. Translation of the Moonduk Opunishud, 1819.
৯. Translation of the Kutth-Opunishud, 1819.
১০. An Applogy for the Pursuit of Final Beatitude independentedly of Brahmanical Observances (সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচারের অনুবাদ), 1820.
১১. A Second conference between an advocate and an opponent of the practice of Burning widows Alive (Translated from the original Bengali), 1820.
১২. The Precepts of Jesus, The Guide to Peace and Happiness, with translations into Sungscrit and Bengali, (যদিও এই অনুবাদগুলি রামমোহন নিজে কখনও প্রকাশ করেন নাই), 1820.
১৩. An Appeal to the Christian Public in Defence of Precepts of Jesus, 1820.
১৪. Second Appeal to the Christian Public in Defence of Precepts of Jesus, 1821.
১৫. Brief remarks regarding modern encroachments on the Ancient Rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance, 1822.
১৬. Final appeal to the Christian Public in Defence of Precepts of Jesus, 1823.
১৭. Humble suggestions to his countrymen who believe in the one True God, 1823.
১৮. Petitions against the Press Regulations :
(a) Memorial to the Supreme Court, 1823.
(b) Appeal to the King in Council, 1823 (?) 1825.
১৯. A few queries for the serious Considerations of Trinitarians, parts I and II, 1823.
২০. A Dialogue between a Missionary and three Chinese Converts (পাদরি ও শিষ্য সংবাদের ইংরাজি অনুবাদ), 1823.

২১. A Vindication of the Incarnation of the Deity, as a common basis of Hindooism and Christianity against Schismatic attacks of R. T. Tytler, Esq. M.D., 1823.

২২. A Letter to Lord Amherst on Western Education, dated 11.12.1823.

২৩. A Letter to the Revd. Henry Ware on the prospects of Christianity in India, 1824.

২৪. Translation of a Sanskrit Tract on different modes of Worship, 1825.

২৫. Bengalee Grammer in the English Language, 1826.

২৬. A Translation into English of Sanskrit Tract, inculcating the Divine Worship, 1827.

২৭. Translation into English of the Sanskrit tract গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিদানম্, ১৮২৭

২৮. Answer of a Hindoo to the question "Why do you frequent Unitarian Places of Worship instead of the numerously attended established Churches ?", 1827.

২৯. Symbol of the Trinity, 1828.

৩০. The Universal Religion, 1829.

৩১. Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands, 1829

৩২. Petition of the Padishah (Akbar II) of Delhi King George IV of England, 1829.

৩৩. Address to Lord William Bentinck, Governor-General of India, upon the passing of the Act for the Abolition of Suttee, 1830.

৩৪. Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal, 1830.

৩৫. Letters on Hindu Law of Inheritance, 1830.

৩৬. Abstract of Arguments regarding the Burning of Widows considered as a Religious Rite, 1830.

৩৭. Counter-petition to the House of Commons to the Memorial of the Advocates of the Suttee, 1830.

৩৮. On the possibility, practicability and expediency of subsituting the Bengali Language for the English.
রচনাকাল অজ্ঞাত। রামমোহনের জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত।

৩৯. Hindu authorities in favour of Slaying the Cow and Eating its Flesh.
রচনাকাল অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত।

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়' ও কুমারী সোফিয়া ডবসন কোলেটের 'দি লাইফ অ্যান্ড লেটারস অভ রাজা রামমোহন রায়'-এর সাহায্যে এই গ্রন্থপঞ্জি সংকলিত।—রা. মি)।

রাজা রামমোহন রায়ের বংশতালিকা

২৩. শ্রীবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পৌরোহিত্য আদি কুল-ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া নবাব সরকারের উচ্চপদে কর্ম করিতেন)

২৪. শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়)

(নবাব সরকার হইতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার শাকাগ্রামে। বিষয়-কর্ম উপলক্ষে হুগলি জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া স্থানটি খুব পছন্দ হওয়ায় মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাধানগরে নবাব সরকারের খাস জমিতে গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করেন। নবাব কর্তৃক বর্ধমান-রাজ জগৎরাম রায়ের একজন প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন)।

২৫. অমরচন্দ্র — হরিপ্রসাদ — ব্রজবিনোদ

ব্রজবিনোদ: মৃত্যু: ১৭৬৮ সনে
(আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে তাঁহার বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম যখন পূর্বদেশে ছিলেন, তখন ব্রজবিনোদ তাঁহার অধীনে কর্ম করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন)।

(সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও হ্যানিম্যানের জীবনীকার, শেষজীবনে হাওড়া-ব্যাঁটরা স্কুলের শিক্ষক। 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন পুরোহিত' মাসিকপত্রের সম্পাদক। জন্ম : ২৭. ৩. ১৮৫৪; মৃত্যু : ১৮. ১১. ১৯১২)।

২৬. রামকান্ত রায়

মৃত্যু : মে-জুন ১৮০৩

রাধানগরের পৈতৃক ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী লাঙুলপাড়া গ্রামে বাটি নির্মাণ করিয়া বাস করেন। ইঁহার তিন বিবাহ, প্রথমা পত্নী সুভদ্রা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী তারিণীদেবী (ফুলঠাকুরানী) চাতরার শ্যাম ভট্টাচার্য ওরফে দেশগুরু ভট্টাচার্যের কন্যা। তৃতীয়া পত্নী রাসমণি দেবী রামশঙ্কর রায়ের কন্যা। রামকান্ত রায় ১৮২০ সনে শ্রীক্ষেত্রে একাকী যাত্রা করেন ও ২১. ৪. ১৮২২ তারিখে শ্রীক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়।
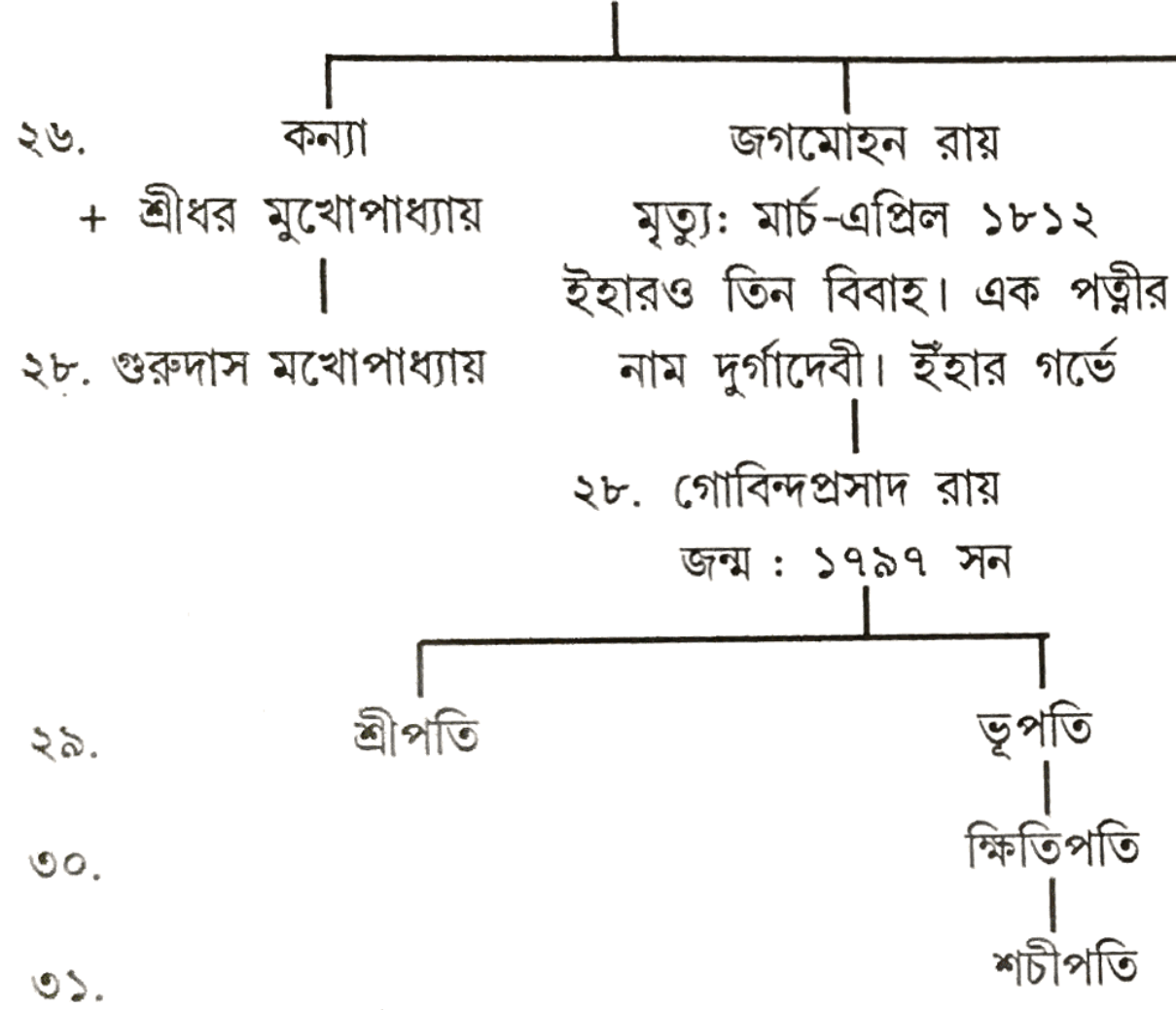
(রাজা) রামমোহন রায় জন্ম : ১৬. ৫. ১৭৭৪। ইহার জন্মের বিভিন্ন বৎসরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে ১৭৭৪ সনে। মৃত্যু : ২৭. ৯. ১৮৩৩ ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল নগরে। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ইহারও তিন বিবাহ। ইহার যখন মাত্র ৮ বৎসর বয়স তখন ইহার প্রথমা স্ত্রীর (নাম অজ্ঞাত) মৃত্যু হয়। পর বৎসর বর্ধমান জেলার কুড়মুন পলাশি গ্রামের শ্রীমতী দেবীর সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। অল্পদিন পরে দ্বিতীয় পত্নী বর্তমান থাকিতেই কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী উমাদেবীর সহিত পিতা ইঁহার বিহার দেন। উমাদেবীর সন্তানাদি হয় নাই। রামমোহন লাঙুলপাড়ার পৈতৃক বাটী ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে নিজস্ব বাটী নির্মাণ করেন।

২৭. রামমোহন রায়
+ শ্রীমতী দেবী
৩য়া পত্নী রামমণি দেবীর গর্ভে

২৮. রাধাপ্রসাদ
জন্ম: ১৮০০ সনের
শেষে কিংবা ১৮০১
সনের প্রথমে।
মৃত্যু: কলিকাতায়
৯. ৩. ১৮৫২ তারিখে।
কলিকাতায় ও কৃষ্ণনগরে
কর্ম করিতেন।
+ হুগলি জেলার
ইড়পালা গ্রামের
জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির
কন্যা

কন্যা
২৯. চন্দ্রজ্যোতি
+ শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ
জন্ম: রঘুনাথপুরে ২৮. ৭. ১৮১৭
মৃত্যু: কলিকাতায় ১. ৮. ১৮৬২

পিতার অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে, পেরেন্ট্যাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনে এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষা। ১৩৩৮ সনে ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত। ১৮৪৫ সনে কলিকাতার সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি আরম্ভ। ১৮৫০ সনের আগস্ট মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুর অবসর গ্রহণ করিলে রমাপ্রসাদ তাঁহার শূন্যস্থলে সদর দেওয়ানি আদালতে সরকারি উকিল নিযুক্ত। ১৮৬১ সনের মধ্যভাগে মি. বোফোর্টের স্থানে লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার নিযুক্ত। ১৮৬২ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত। ইহার প্রথম স্ত্রী অতি অল্পবয়সেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে মৃত্যুঞ্জয় আগমবাগীশের কন্যা দ্রবময়ীকে বিবাহ করেন। নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিচারাসনে বসিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে স্বোপার্জিত ২২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ করেন হিন্দুমতে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে মৌখিক সমর্থন জানাইয়াও প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করিতে অস্বীকার করেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় রমাপ্রসাদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো রামমোহন রায়ের ছবিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন 'ওটা নামিয়ে ফেল'। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

২৮. রমাপ্রসাদ রায়
+দ্রবময়ী দেবী

২৯. হরিমোহন + গোলাপসুন্দরী
জন্ম: মে-জুন, ১৮৪৮
মৃত্যু: ২২. ৩. ১৮৯৭
অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। শখের যাত্রার দল ও সুন্দর পশুশালা করেন। বিলাসিতার জন্য বিষয় সম্পত্তি অনেক নষ্ট করেন

৩০. কন্যা
হরিমোহন অপুত্রক হওয়ার তাঁহার কন্যার বংশধরগণ মাতামহের অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

প্যারীমোহন
জন্ম: অক্টোবর (?) নভেম্বর (?), ১৮৫০
মৃত্যু: ১২. ৬. ১৯৪৯
খুব বলবান, সঙ্গীতের অনুরাগী ও উৎকৃষ্ট বাদক ছিলেন। অপুত্রক

৩০. ধরণীমোহন (পোষ্যপুত্র)
মৃত্যু: ২৫.৭.১৯৭০
+ হেতমপুরের মহারাজ-কুমার নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কন্যা প্রমোদবালা দেবী

৩১. সবিতামোহন
১৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু

শচীন্দ্রমোহন
মৃত্যু: ১২. ১২. ১৯৭০
+ আরতিরানী দেবী জীবিতা, বর্তমান বয়স ৮০ বৎসর
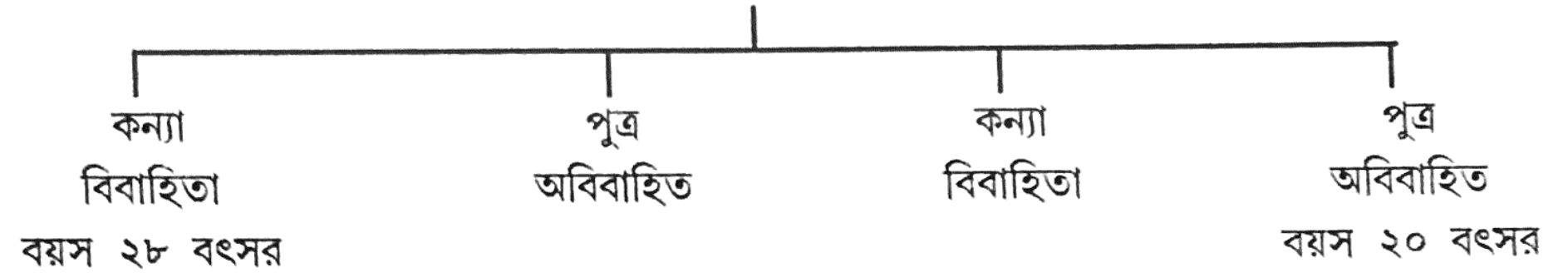
রামমোহন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের শাখা

রাধাপ্রসাদ রায়

|

২৯. চন্দ্রজ্যোতি
+শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়

৩০. ললিতামোহন — কিশোরীমোহন — কন্যা — কন্যা — নন্দমোহন

কন্যা
|
+ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়
কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী,
পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির
ভাইস চেয়ারম্যান
|
দেবীবর মুখোপাধ্যায়

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
৩১.
মোহিনীমোহন অ্যাটর্নি +দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজাদেবী
রমণীমোহন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান +দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা ঊষা দেবী
যোগিনীমোহন ব্যারিস্টার +মেম
রজনীমোহন অ্যাটর্নি + অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা ভগিনী সুনয়নী দেবী
হেমলতা +দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্তান
সুশীলতা
সজনীমোহন (মানসিক ভারসাম্যহীন)
৩২.
মহীমোহন
নয়নমোহন
তপনমোহন ব্যারিস্টার, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য, সাহিত্যিক
রানী
সুমনা
গীতা
দীপ্তি
৩১. রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৩২.
রজতমোহন
জগৎমোহন
মুরলা
করুণা
৩১. রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৩২.
বীণাপাণি +দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রভাবতী
অনুজা
রতনমোহন অ্যাটর্নি
মনোমোহন ডাক্তার
সুমোহন +রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের কন্যা বীণাপাণি
শ্রীমোহন

৩১. কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৩১.
নলিনীমোহন
তরুলতা
ঋষিবর
মুখোপাধ্যায়
কাশ্মীর রাজ্যের
ভূতপূর্ব প্রধান জজ
সরলতা
মোহিনীমোহন
৩২.
সতীশ
+রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
ভগিনী সরলাবালা দেবী
যতীশ
+রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের
ভগিনী রণরঙ্গিনী দেবী
রানী
+ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র
সমাজপতির জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
('সাহিত্য' মাসিকপত্রের সম্পাদক) নিঃসন্তান
৩১.
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৩২.
যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৃত্যু: ১৯৩৮
+ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কনিষ্ঠা কন্যা মতিমালী; মৃত্যু: ১৯৩৯
অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
(নিঃসন্তান)

যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
+মতিমালী
|
৩৩. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা কর্পোরেশনের
ভূতপূর্ব এডুকেশন অফিসার,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
নৃতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব
প্রধান অধ্যাপক
জন্ম : ১৬. ১২. ১৮৯৮
মৃত্যু : ৩১.৫.১৯৬৩
+সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
জ্যেষ্ঠা কন্যা
মঞ্জুশ্রী দেবী
জন্ম : মার্চ ১৯০৭

৩৪.

গৌতম চট্টোপাধ্যায়	গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক+	অধ্যাপক+
(১) ৺জয়া দেবী	আরতি দেবী
(২) মঞ্জু দেবী	

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত কলেজ

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গ

ভারত গভর্নমেন্ট ১৭. ৭. ১৮২৩ তারিখে কলিকাতায় 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' গঠন করেন। সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন ইহার সভাপতি ও সংস্কৃত পণ্ডিত ডাক্তার এইচ. এইচ. উইলসন ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই দেশের সরকারি শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ভার এই কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। এই কমিটি ১. ১. ১৮২৪ তারিখে কলিকাতায় ৬৬ বহুবাজার স্ট্রিটের এক ভাড়াবাড়িতে সম্পূর্ণ গভর্নমেন্টের ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন : 'কলেজ মন্দিরের জন্য পটলডাঙ্গা স্কোয়ার বা গোলদীঘির উত্তরাংশের সমগ্র জমি (৫ বিঘা ৭ কাঠা) ক্রয় করা হইল। ইহার মধ্যে দুই বিঘা, কাঠা পিছু ৫০০ টাকা হারে, ডেভিড হেয়ারের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়।' অবশিষ্ট তিন বিঘা সাত কাঠা জমি কাহার বা কাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করা হয় তাহা ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন নাই। অন্য সূত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, গোলদীঘির উত্তরাংশের সমস্ত জমিই ডেভিড হেয়ারের সম্পত্তি ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজের উভয় পার্শ্বে হিন্দু কলেজের জন্য দুইটি একতলা বাটি নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি বিনামূল্যে দান করেন। ২৫. ২. ১৮২৫ তারিখে সাড়ম্বরে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। গৃহনির্মাণের জন্য গভর্নমেন্ট প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। গৃহের নকশা প্রস্তুত করেন বেঙ্গল এন্‌জিনিয়ার্সের লেফটেন্যান্ট বি. বাকস্টন ও নির্মাণকার্য সমাধা করেন ম্যাকিন্‌টস-বার্ন কোম্পানির জেমস ম্যাকিন্‌টস ও উইলিয়াম বার্ন। ১. ৫. ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজ বহুবাজারের বাটি ত্যাগ করিয়া এই ভবনে প্রবেশ করে।

প্রথমে দ্বাদশ বৎসরের কম বয়স্ক এবং ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন অন্য জাতির ছাত্রদের ভর্তি করা হইত না। ১২ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত। শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিল। বরং দরিদ্র ও বহিরাগত ছাত্রদের কলিকাতায় থাকা-খাওয়ার জন্য কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইত। রবিবার কলেজ খোলা থাকিত। প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অন্যান্য হিন্দু পর্বের দিন কলেজ বন্ধ থাকিত।

বৈদ্য জাতির ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজে ১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হয়। ন্যায় ও স্মৃতির শ্রেণীতে অধ্যয়ন না-করিয়া বৈদ্য ছাত্রেরা বৈদ্যক শ্রেণীতে যোগ দিতে পারিত। ক্ষুদিরাম বিশারদ মাসিক ৬০ টাকা বেতনে প্রথমাবধি ১৮৩০ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। ওই সালের মে মাস হইতে বৈদ্যক শ্রেণীর কৃতী ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ৬০ টাকা বেতনে ক্ষুদিরাম বিশারদের স্থানে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মধুসূদন গুপ্ত পরে হিন্দু কলেজে ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১. ৮. ১৮৩১ তারিখে কলেজ স্কোয়ারের একটি একতলা বাড়িতে বৈদ্যক শ্রেণীর জন্য এক হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সরি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীর ছাত্রগণ ওই হাসপাতালে গিয়া সংস্কৃত কলেজের মেডিক্যাল লেকচারার ডাক্তার জন্য গ্রান্টের নিকট পাঠ গ্রহণ করিত। হাসপাতাল-বাড়ির মালিক ছিলেন রূপনারায়ণ ঘোষাল। ঘোষালদের বসতবাটি ছিল বর্তমানের ১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর

১. ছাত্র॥ সংস্কৃত কলেজ গোলদীঘির নিজস্ব ভবনে প্রবেশ করিবার ঠিক তিন বৎসর একমাস পরে ১. ৬. ১৮২৯ তারিখে পিতা ঠাকুরদাসের আত্মীয় ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র (বাচস্পতি) মধুসূদনের পরামর্শে পিতা ৮ বৎসর ৮ মাস বয়স্ক বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। এই কলেজে সর্বসাকুল্যে ১২ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়নের পর ৪. ১২. ১৮৪১ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের নিকট হইতে একখানি ও অধ্যাপকবর্গের নিকট হইতে আর-একখানি মোট দুইখানি প্রশংসাপত্র এবং 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। ১২ বৎসর ৫ মাসের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ শ্রেণীতে ৩ বৎসর ৫ মাস, সাহিত্য শ্রেণীতে ৫ টাকা হারে ও ১৮৩৭ সনের মে মাস হইতে ১৮৪১ সনের মে মাস পর্যন্ত মাসিক ৮ টাকা হারে বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছেন। ২২. ৪. ১৮৩৯ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দেন ও ১৬. ৫. ১৮৩৯ তারিখে ওই কমিটির নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

২. সহকারী সম্পাদক॥ ৬. ৪. ১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯. ৯. ১৮৪৬ তারিখে তিনি ওই কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তকে কলেজে উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়া এক রিপোর্ট দেন। কিন্তু সম্পাদক এই রিপোর্টটি না শিক্ষা পরিষদকে পাঠান, না ওই রিপোর্ট অনুযায়ী পঠন-ব্যবস্থার কোনো প্রকার সংস্কার করিতে সম্মত হন। বিদ্যাসাগর যাহা কিছু মৌখিক প্রস্তাব করেন রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করেন না। বিদ্যাসাগর আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কার্যভার বুঝাইয়া দিয়া সহকারী সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিলেন। তাহার পদত্যাগপত্র ১৬. ৭. ১৮৭৪ তারিখে গৃহীত হয়।

৩. সাহিত্যের অধ্যাপক॥ ১৮৫০ সনের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া যান। তাঁহার স্থলে বিদ্যাসাগর ৫. ১২. ১৮৫০ তারিখে মাসিক ৯০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত

হন। তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এই শর্তে যে, তাঁহাকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হইবে।

সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কী এবং কীরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট দিবার ভার শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাক্তার মৌয়াট বিদ্যাসাগরের উপর দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ১৬. ১২. ১৮৫০ তারিখে এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদকে দান করেন। ইহার পরেই কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত গভর্নমেন্ট সমীপে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। ৫. ১. ১৮৫১ তারিখে বিদ্যাসাগর সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালে সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

৪. সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ॥ ২২. ১. ১৮৫১ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অধ্যক্ষ পদটি তাঁহার জন্যই সৃষ্ট হয়। পূর্বে এই কলেজে কোনো অধ্যক্ষ ছিলেন না। মাসিক ১০০ টাকা বেতনে একজন দেশি সম্পাদক ও মাসিক ৫০ টাকা বেতনে একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারাই কলেজের যাবতীয় পরিচালনার কার্য কোনোপ্রকারে নির্বাহ করিতেন। এখন হইতে এই দুই পদ লুপ্ত করা হইল এবং মাসিক যে-১৫০ টাকা বাঁচিয়া গেল তাহাই অধ্যক্ষের বেতন স্বরূপ বিদ্যাসাগরকে দেওয়া হইল।

৫. কলেজের সংস্কার॥ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের কতকগুলি সংস্কার সাধন করিলেন, যথা :

ক. পূর্বে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতিরেকে অন্য কোনো জাতির হিন্দু সন্তান ছাত্র হিসাবে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিতে পারিত না। ৯. ৭. ১৮৫১ তারিখে বিদ্যাসাগর কায়স্থ সন্তানদিগকে কলেজে প্রবেশাধিকার দান করেন ;

খ. পূর্বে প্রতিপদ, অষ্টমী ইত্যাদি তিথিতে সংস্কৃত কলেজে অনধ্যায় পালন করা হইত। ২৬. ৭. ১৮৫১ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগর ওই তিথিগুলির পরিবর্তে কেবল রবিবার কলেজ বন্ধ রাখিবার রীতির প্রবর্তিত করেন ;

গ. ১৮৫১ সনের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর কলেজের ব্যাকরণ বিভাগ সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত করিলেন। পূর্বে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ' ছিল ব্যাকরণ বিভাগের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক। এখানি আয়ত্ত করিতে অর্থাৎ না-বুঝিয়া কেবলমাত্র মুখস্থ করিতেই ছাত্রদের চার-পাঁচ বৎসর লাগিয়া যাইত। বিদ্যাসাগর 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ পড়ানো বন্ধ করিলেন ও তাহার পরিবর্তে বাংলায় 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণকৌমুদী' রচনা করিয়া পাঠ্য করিলেন। সেই সঙ্গে 'ঋজুপাঠ' পড়ানো আরম্ভ হইল। ঋজুপাঠে সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য হইতে কতকগুলি নির্বাচিত অংশ সন্নিবিষ্ট ছিল ;

ঘ. ১৮৫৪ সনের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের অতিরিক্ত যে-কোনো সম্ভ্রান্ত জাতির হিন্দু সন্তানকে ছাত্র হিসাবে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান করেন ;

ঙ. হিন্দু কলেজ ও মাদ্রাসার উৎকৃষ্ট ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দেওয়া হইত। ১৩. ১. ১৮৫২ তারিখে বিদ্যাসাগর শিক্ষা পরিষদের মাধ্যমে গভর্নমেন্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন যেন সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য ছাত্রদের সমান সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য হয় নাই। সংস্কৃত কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা হইতে থাকে। প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে। তাঁহার পর হন শ্রীশ বিদ্যারত্ন; রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ;

চ. ২৮. ৮. ১৮৫২ তারিখে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের দুই টাকা প্রবেশমূল্য দিবার রীতি প্রচলন করেন;

ছ. ১৮৫৩ সনের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ইংরাজি বিভাগ সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত করিলেন। ১৮২৭ সনের মে মাসে ওই কলেজে একটি ইংরাজি শ্রেণী খোলা হইয়াছিল। আট বৎসর পরে ১৮৩৫ সনের নভেম্বর মাসে ওই শ্রেণীটি উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে শিক্ষা পরিষদ ইংরাজি শ্রেণী পুনঃস্থাপিত করেন।

প্রথমাবধি এই শ্রেণীতে পাঠ ঐচ্ছিক থাকায় আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই।

বিদ্যাসাগর ইংরাজিকে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করিলেন এবং ইংরাজি বিভাগে পাঁচজন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তন্মধ্যে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস ইংরাজি গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। প্রত্যেকের বেতন হইল মাসিক ১০০ টাকা। পূর্বে এই কলেজে সংস্কৃতে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' ছাত্রদিগকে পড়িতে হইত। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গণিত রহিত করিয়া ইংরাজিতেই গণিতের শিক্ষা প্রবর্তন করিলেন। এই বিভাগের অন্য তিনজন শিক্ষক হইলেন — কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বেতন মাসিক ৮০ টাকা, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং প্রসন্নচন্দ্র রায় বেতন মাসিক ৩০ টাকা;

জ. ১৮৫৪ সনের জুন মাস হইতে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিকট হইতে মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত করেন;

৬. ১৮৫৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের বেতন নির্ধারিত হয় মাসিক ৩০০ টাকা।

•

৭. ১. ৫. ১৮৫৫ তারিখে হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান, ও মেদিনীপুর — এই চারিটি জেলার পল্লী-বালকদিগের জন্য আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় (মডেল স্কুল) স্থাপন ও পরিদর্শন করিবার জন্য বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত করা হয় মাসিক ২০০ টাকা বেতনে। এখন হইতে তাঁহার মোট বেতন হইল মাসে ৫০০ টাকা।

সহকারী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াই বিদ্যাসাগর নিজের অধীনে চারি জিলার জন্য চারিজন সাব-ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যেকের বেতন হইল রাহা খরচ বাদে মাসিক ১০০ টাকা। সাব-ইনস্পেক্টরগণের নাম — হরিনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) ন্যায়রত্ন, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর

(চট্টোপাধ্যায়) তর্করত্ন ও দীনবন্ধু (বন্দ্যোপাধ্যায়) ন্যায়রত্ন। ১৮৫৬ সনের জানুয়ারি মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর চারিটি জেলার মোট ২০০টি মডেল স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন।

৮. ১৭. ৭. ১৮৫৫ তারিখে বিদ্যাসাগর মডেল স্কুলগুলির জন্য যোগ্য শিক্ষক তৈয়ারি করিবার উদ্দেশ্যে ৩০. ৪. ১৮৫৫ তারিখে প্রাক্তন হিন্দু কলেজ সংলগ্ন বাংলা পাঠশালাটি লইয়া সংস্কৃত কলেজে একটি নর্মাল (গুরু ট্রেনিং) স্কুল প্রতিষ্ঠা ও অক্ষয়কুমার দত্তকে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। স্থানাভাবে সংস্কৃত কলেজেই প্রাতঃকালে মাত্র দুই ঘণ্টা এই স্কুল বসিত। স্কুলে মাত্র দুইটি শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণীতে অক্ষয়কুমার ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে মধুসূদন বাচস্পতি (বেতন মাসিক ৫০ টাকা) পড়াইতেন।

৯. ১৮৫৬ সনের নভেম্বর মাসে ভারত সরকারের নির্দেশে বিদ্যাসাগরের পরিদর্শক পদের নাম বদলাইয়া দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের স্পেশ্যাল ইন্‌স্পেক্টর নাম রাখা হইল।

১০. সিপাহি বিদ্রোহের সময় সৈন্য বিভাগ ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ-ভবন দখল করিয়া লইয়া তথায় আহত সৈনিকদিগের জন্য হাসপাতাল খোলে। কলেজ সাময়িকভাবে ১১০ ও ৯২ বহুবাজার স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ভাড়া যথাক্রমে মাসিক ৭৫ টাকা ও ৩০ টাকা ছিল। এই দুই বাড়িতে কলেজের ৮টি ক্লাস হইত। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'নর্মাল স্কুলও' ১৩১ বহুবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ভাড়া মাসে ১৪০ টাকা। এই বাড়িতে নর্মাল স্কুল ছাড়াও সংস্কৃত কলেজের অবশিষ্ট ক্লাসগুলি বসিত। ১৪. ১. ১৮৬০ তারিখে সংস্কৃত কলেজ নিজ ভবনে ফিরিয়া যায়। ১১. ৩. ১১. ১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেন। সেই সময় সংস্কৃত কলেজ ছিল বহুবাজার স্ট্রিটে।

বিদ্যাসাগর ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

১. বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্‌লি বিলাত হইতে ভারতে নবাগত ইংরাজ সিভিলিয়ান বা রাইটারদের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও হিন্দু ও মুসলিম আইন শিক্ষা দিবার জন্য ৪. ৫. ১৮০০ তারিখে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৪. ১১. ১৮০০ তারিখ হইতে এই কলেজে অধ্যাপনা-কার্য আরম্ভ হয়। পাঠ্যক্রম ছিল দুই বৎসরের। ১৮৩৫ সন হইতে এই কলেজের অবনতির সূত্রপাত হয়। ১৮৫৪ সনের জানুয়ারি মাসে এই কলেজ উঠিয়া যায়।

২. ২৯. ১২. ১৮৪১ তারিখে অল্পকাল পূর্বে পরলোকগত মধুসূদন তর্কালঙ্কারের স্থলে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। নিযুক্ত হইয়াই তিনি একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের নিকট হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে প্রথমে কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেডরাইটার ও ট্রেজারার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট এবং পরে তাঁহার নিজের ছাত্র নীলমাধব

মুখোপাধ্যায়ের নিকট ইংরাজি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহার নিকটও কিছুকাল ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ বসুকে বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫ টাকা বেতনে ইংরাজির জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র বহু ভাষাবিদ্ অসাধারণ পণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসুর নিকট তিনি শেক্‌স্‌পীয়র অধ্যয়ন করেন। ৩. ৪. ১৮৪৬ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার প্রধান পণ্ডিতের কার্য করেন।

৩. ডাক্তারি করিবেন স্থির করিয়া দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬. ১. ১৮৪৯ তারিখে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কেরানি ও কোষাধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দেন। ১. ৩. ১৮৪৯ তারিখে বিদ্যাসাগর ৫০০০ টাকা জামিন দিয়া মাসিক ৮০ টাকা বেতনে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে প্রধান কেরানি ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ৪. ১২. ১৮৫০ তারিখ পর্যন্ত তিনি এই পদে কার্য করেন।

৪. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কার্য করিবার ফলে স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে, স্যার জন পিটার গ্রান্ট, স্যার সিসিল বিডন, স্যার উইলিয়াম গ্রে (এই চারিজনই পরে বঙ্গদেশের ছোটলাট নিযুক্ত হইয়াছিলেন) প্রমুখ বহু উচ্চপদস্থ ইংরাজ সিভিলিয়ানের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। তাঁহারা বিদ্যাসাগরকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত মেজর জি. টি. মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের একান্ত গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য ব্যতীত বিদ্যাসাগর কর্মক্ষেত্রে এত উন্নতি করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। বিদ্যাসাগরও মার্শাল সাহেবকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিতেন।

৫. ১৮৫৪ সনের ২৪ জানুয়ারি তারিখে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে সিভিলিয়ানদের মাত্র পরীক্ষা লইবার জন্য বোর্ড অব এগ্‌জামিনার্স গঠন করা হয়। বিদ্যাসাগর ওই বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন।

৬. ১৮৬০ সনের মে মাসে বিদ্যাসাগর বোর্ড অব এগ্‌জামিনার্সের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

বিধবা বিবাহের ইতিহাস

১. ১৭৬০ সনে ঢাকার রাজবল্লভ সেন তাঁহার বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে দ্রাবিড়, ত্রৈলঙ্গ, কাশী ও মিথিলার পণ্ডিতগণের এ-বিষয়ে কী মত জানিতে চাহেন। তাঁহারা নাকি পুনর্বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তখন তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত জানিতে চাহিয়া নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লেখেন। কিংবদন্তি এই যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গোপন বিরোধিতায় রাজা রাজবল্লভের মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই।

২. বহু শাস্ত্রানুসন্ধানের পর বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সনের ডিসেম্বর মাসে 'পরাশর সংহিতায়' বিধবা-বিবাহের সমর্থনসূচক নিম্নলিখিত বিখ্যাত শ্লোকটি আবিষ্কার করেন :

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

৩. কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবিষ্কারের প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে ১৮৪২ সনের জুলাই সংখ্যা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রে 'রি-ম্যারেজ অব হিন্দু উইডোজ্' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে নাকি ওই শ্লোকটি হুবহু উদ্ধৃত আছে, মাত্র 'নষ্টে' শব্দের স্থলে 'গতে' শব্দ আছে। উভয় শব্দের অর্থ কিন্তু একই।

৪. আরো অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের চারি বৎসর পূর্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'দি রিফর্মার' পত্রিকার ১৮৩৮ সনের ২৫ নভেম্বর সংখ্যায় হিন্দু বিধবাগণের পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে নাকি সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের অনুকূলে যত কিছু শাস্ত্রীয় বিধান আছে সে সমুদয়ই উল্লিখিত হইয়াছে, 'পরাশর সংহিতা'র উপরে উদ্ধৃত বিখ্যাত শ্লোকটিও বাদ পড়ে নাই।
আমার নিজের 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' কিংবা 'দি রিফর্মার' পত্রিকার সংখ্যা দুটি দেখিবার সুযোগ হয় নাই। বিষয়টি অনুসন্ধানযোগ্য সন্দেহ নাই।

৫. বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবাগণের বিবাহ আইনসিদ্ধ করিবার জন্য ৪. ১০. ১৮৫৫ তারিখে প্রায় এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদনপত্র ভারত গভর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করেন।

৬. ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৬. ৭. ১৮৫৬ তারিখে বিধবা-বিবাহ আইন পাস হইয়া গভর্নর জেনারেলের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।

৭. বিধবা-বিবাহ আইন অনুসারে প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ৭. ১২. ১৮৫৬ তারিখে। বর খাটুয়ার প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যারত্ন। ইনি সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। প্রথমে ওই কলেজের সহকারী সম্পাদক, পরে সাহিত্যাধ্যাপক হন। বিবাহের সময় মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত ছিলেন। তাহার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। কন্যা বর্ধমান জেলার পলাশডাঙা গ্রাম-নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা-কন্যা কালীমতী দেবী। কালীমতীর প্রথম বিবাহ হয় মাত্র চার বৎসর বয়সে নদিয়া জেলার বহির্গাছি গ্রাম-নিবাসী হরমোহন ভট্টাচার্যের সহিত। ছয় বৎসর বয়সে কালীমতী বিধবা হয়।
বিবাহবাসর তৎকালের ১২, বর্তমানে ৪৮, সুকিয়া স্ট্রিটস্থ বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে। বিবাহবাসরে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ন্যায়-দর্শনের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, স্মৃতির অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি, অলনংকারের অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ব্যাকরণের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ব্যাকরণের অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ব্যাকরণের অধ্যাপক হরিনাথ ন্যায়রত্ন (হাওড়া শিবপুর), স্কুল সাব-ইনস্পেক্টর মাধবচন্দ্র গোস্বামী, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা), হিন্দু কলেজের

প্রাক্তন ছাত্র স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। রামগোপাল ঘোষের বাড়ি হইতে তাঁহারই বড় জুড়ি-গাড়ি চড়িয়া বর বিবাহবাসরে আগমন করেন। হাঙ্গামার আশঙ্কায় পূর্ব হইতেই প্রচুর গোরা সৈন্য মোতায়েন করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এই বিবাহে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত বিদায় দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছিল। সমস্ত ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর একাই বহন করিয়াছিলেন। এই একটি বিবাহেই তাঁহার দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বিধবা-বিবাহ প্রচলন সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

৮. এই বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠিত আরো কয়েকটি বিধবা-বিবাহের বিষয় এই স্থানে উল্লেখিত হইতেছে :

ক. ৮. ১২. ১৮৫৬ তারিখে কলিকাতায় ঠনঠনিয়া-নিবাসী ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা শ্রীমতী থাকমণির সহিত ২৪ পরগনা জেলার পাণিহাটি গ্রাম-নিবাসী মধুসূদন ঘোষের বিবাহ হয়। মধুসূদন ঘোষ ছিলেন কলিকাতা হাটখোলার দত্তবাবুদিগের দৌহিত্র। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণকালী ঘোষ। জ্যেষ্ঠতাতের নাম হরকালী ঘোষ। হরকালী ঘোষ সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল ও শোভাবাজার রাজবাটির জামাতা ছিলেন।

শ্রীমতী থাকমণির প্রথম বিবাহ হয় ৯ বৎসর বয়সে নদিয়া জেলার শাপুর গ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণমোহন বিশ্বাসের সহিত। বিবাহের মাত্র তিন মাস পরেই থাকমণি বিধবা হন। এই বিবাহেরও যাবতীয় ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর বহন করেন। বিদ্যাসাগর তাঁহার উইলে এই থাকমণি দাসীকে মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি দিবার নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন।

খ. ২১. ২. ১৮৫৭ তারিখে কলিকাতা ভবানীপুর-নিবাসী কায়স্থ রামসুন্দর ঘোষের চতুর্দশ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা শ্রীমতী গোবিন্দমণির সহিত জেলা ২৪ পরগনার বোড়াল গ্রাম-নিবাসী, তৎকালে, মেদিনীপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক, দুর্গাচরণ বসুর বিবাহ হয়। পাত্রের পিতা মধুসূদন বসু রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠতাত।

শ্রীমতী গোবিন্দমণির প্রথম বিবাহ হয় ৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা হোগলকুড়িয়া-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ সিংহের সহিত। ১০ বৎসর বয়সে কন্যা বিধবা হন। এই বিবাহও বিদ্যাসাগর দিয়াছিলেন।

গ. ৮. ৩. ১৮৫৭ তারিখে জেলা ২৪ পরগনার সুখচর গ্রাম-নিবাসী হরিশচন্দ্র বিশ্বাসের চতুর্দশ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা শ্রীমতী নৃত্যকালীর সহিত জেলা ২৪ পরগনার বোড়াল গ্রাম-নিবাসী মদনমোহন বসুর বিবাহ হয়। পাত্র নন্দলাল বসুর পুত্র ও রাজনারায়ণ বসুর মধ্যম ভ্রাতা।

নৃত্যকালীর প্রথম বিবাহ হয় ৭ বৎসর বয়সে জেলা ২৪ পরগনার চন্দনপুকুর গ্রাম-নিবাসী রামকমল সরকারের সহিত। ১১ বৎসর বয়সে নৃত্যকালী বিধবা হন। এই বিবাহেরও যাবতীয় ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর বহন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁহার উইলে এই নৃত্যকালী দাসীর জন্য মাসিক ১০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যান।

ঘ. ডিসেম্বর, ১৮৫৭ — তৎকালীন হুগলি জেলার (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার) অন্তর্গত চন্দ্রকোনার নিকট কেয়াগেড়ে গ্রাম-নিবাসী স্বরূপচন্দ্র চক্রবর্তী অষ্টম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীমণির সহিত জেলা নদিয়ার গৈপুর গ্রাম-নিবাসী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। যদুনাথ ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন।

লক্ষ্মীমণির প্রথম বিবাহ হয় ৩ বৎসর বয়সে মেদিনীপুর জেলার শিরসা গ্রাম-নিবাসী শিশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত। বিবাহ বৎসরেই লক্ষ্মীমণি বিধবা হন। এই বিবাহও বিদ্যাসাগর দিয়াছিলেন।

৯. ১৮৫৬ হইতে ১৮৬৭ পর্যন্ত মাত্র ১১ বৎসরে বিদ্যাসাগর ৬০টি বিধবা-বিবাহ দিয়াছিলেন ও তাহাতে তাঁহার মোট ব্যয় হইয়াছিল ৮২ হাজার টাকা। এই ব্যয় তাঁহাকে ঋণ করিয়া করিতে হইয়াছিল। এই ঋণের কথা জানিতে পারিয়া বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক) ও অপর কয়েকজন ব্যক্তি একটি বিধবা-বিবাহ তহবিল গঠন করিবার অভিপ্রায়ে হিন্দু পেট্রিয়টে (কিংবা এডুকেশন গেজেটে) সর্বসাধারণের নিকট একটি অর্থ সাহায্যের আবেদন প্রচার করেন। বিদ্যাসাগর এই আবেদনের কথা জানিতে পারিয়া পত্রিকার সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির শেষে বলেন, 'আমি যাহা ঋণ করিয়াছি তাহা শোধ করিবার জন্য সাধারণ সমীপে আবেদন করিবার ইচ্ছা আমার লেশমাত্রও নাই। তাই আমি উক্ত প্রচারিত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছি। এবং যে-সকল ভদ্রলোক এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিতেছি। ইতি ২৬শে জুন, ১৮৬৭ খ্রী.'।

বিদ্যাসাগর ও বহুবিবাহ

১. বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রহিত করিবার জন্য ২৭. ১২. ১৮৫৫ তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট প্রথম আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদন নিষ্ফল হয়।

২. তিনি ওই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ১. ২. ১৮৬৬ তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদনপত্রে অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতিও স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহার তখন মত ছিল যে বহুবিবাহ অতি অনিষ্টকারক কুপ্রথা। ইহার শীঘ্র অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩. ১৮৭৬ সনে কলিকাতায় সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ বহুবিবাহ নিবারণকল্পে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া প্রধান প্রধান স্মার্ত পণ্ডিতের অভিমত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হয়তো কিছু সাহায্য হইতে পারিবে এই ভাবিয়া বিদ্যাসাগর ১০. ৮. ১৮৯৭ তারিখে বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার নামক পুস্তক

প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি দেখান যে বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে মুর্শিদাবাদ-নিবাসী কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন, বরিশাল-নিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত পুস্তক লিখিয়া বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। তারানাথ তর্কবাচস্পতির এই ব্যবহারে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন ও তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

বিদ্যাসাগর ও স্ত্রী-শিক্ষা

১. বড়লাটের কাউন্সিলের আইন-সদস্য ও শিক্ষা পরিষদের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন) ৭. ৫. ১৮৪৯ তারিখে বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বাড়িতে (তখনকার ৫৬, বর্তমানে ৭১, সুকিয়া স্ট্রিট) সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দু বালিকাদিগকে ধর্মবর্জিত শিক্ষাদানের নিমিত্ত স্থাপন করেন। প্রথমদিকে স্কুলের একাধিক নাম ছিল, যথা, ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল, হিন্দু ফিমেল স্কুল, নেটিভ ফিমেল স্কুল। শেষে শুধু 'বীটন বালিকা স্কুল' নামেই পরিচিত হয়।

হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে ৬. ১. ১৮৫০ তারিখে স্কুলের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বীটন সাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকেই স্কুলের সম্পাদক হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তাঁহার নির্বন্ধাতিশয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক হইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ওই স্কুলে ভর্তি হয়। স্কুলের গাড়ি করিয়া বালিকাদিগকে গৃহ হইতে স্কুলে আনা হইত ও গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'— মহানির্বাণ তন্ত্রের এই শ্লোকাংশ বিদ্যাসাগর গাড়ির উভয়পার্শ্বে খোদিত করাইয়া দিয়াছিলেন।

১৮৫২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হয়। কিন্তু তৎপূর্বেই ১২. ৮. ১৮৫১ তারিখে মহামতি বীটন পরলোকগমন করেন। তিনি প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত স্কুলের যাবতীয় ব্যয়, মায় স্কুলগৃহ নির্মাণের ব্যয় পর্যন্ত, নিজেই বহন করিয়া গিয়াছেন। কাহারও নিকট হইতে, এমনকী গভর্নমেন্টের নিকট হইতেও, এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বড়লাট লর্ড ডালহৌসি ১৮৫১ সনের অক্টোবর মাস হইতে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণের সময় ১৮৫৬ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় বীটন সাহেবের ন্যায় স্বয়ং বহন করিয়া গিয়াছেন। লর্ড ডালহৌসির ভারত ত্যাগের পর বাংলা সরকার স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব ও আর্থিক ভার গ্রহণ করিলেন। তদবধি ইহা সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। বঙ্গের ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব স্কুলটিকে মি. সিসিল বিডনের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। বিডন সাহেব ১২. ৮. ১৮৫৬ তারিখে স্কুল পরিচালনার জন্য রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখকে লইয়া একটি কমিটি গঠনের এবং ওই কমিটির সম্পাদকরূপে বিদ্যাসাগরের নাম প্রস্তাব করেন। বাংলা সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় ১৮৫৬ সনের আগস্ট মাস হইতে বিডন সাহেব পরিচালক কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাসাগর সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

১৮৬৬ সনের নভেম্বর মাসে কুমারী মেরি কার্পেন্টার বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করেন ও বিদ্যাসাগরের সহিত পরিচিত হন। ১৪. ১২. ১৮৬৬ তারিখে কুমারী কার্পেন্টার বিদ্যাসাগর, ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস মি. অ্যাটকিনসন, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মি. উড্রো— এই তিনজনের সঙ্গে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান। ফিরিবার সময় বগি গাড়ি উল্‌টাইয়া যাওয়ায় পড়িয়া গিয়া বিদ্যাসাগর যকৃতে আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার পরিপাক-শক্তি চিরতরে নষ্ট ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাধিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়।

কুমারী কার্পেন্টার কলিকাতায় আসিয়াই আর-একটি কার্য করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, হিন্দু বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একদল শিক্ষয়িত্রী গঠন করিবার নিমিত্ত বীটন স্কুলেই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত করা হউক। বহু ব্যক্তি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থায় এ-প্রস্তাব সফল হইবার কোনো আশা নাই। সুতরাং তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ না-করিতে গভর্নমেন্টকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বাংলা গভর্নমেন্ট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গ্রহণ না-করিয়া কুমারী কার্পেন্টারের প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা স্কুল কমিটির হস্ত হইতে বালিকা স্কুলের পরিচালনার ভার সরাইয়া লইয়া বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টরের উপর ন্যস্ত করিলেন এবং জানিতে চাহিলেন যে ভূতপূর্ব স্কুল কমিটির সভ্যগণ মাত্র পরামর্শ সভার সভ্যরূপে কার্য করিতে সম্মত আছেন কিনা। বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাবে সম্মত না-হইয়া ১৮৬৯ সনের জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করিলেন। বীটন স্কুলের সহিত অতঃপর বিদ্যাসাগরের আর-কোনো সম্বন্ধ রহিল না।

২. কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা মাত্র বীটন স্কুলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯. ৭. ১৮৫৪ তারিখে বিলাতের বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের প্রেসিডেন্ট স্যার চার্লস উড তাঁহার স্বাক্ষরিত ভারতীয়দিগের শিক্ষা-সংক্রান্ত 'ডেসপ্যাচ' এদেশে পাঠান। তাহাতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রসার করিবার নির্দেশও ভারত সরকারকে দেওয়া হয়। ১৮৫৭ সনের প্রারম্ভে ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের কার্যে অগ্রসর হইয়া বিদ্যাসাগরের সাহায্য চাহিলেন। বিদ্যাসাগরও তাঁহাকে অকুণ্ঠ সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। দুইজনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে গভর্নমেন্ট সেইসব পল্লী বালিকা বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ব্যয় সম্পূর্ণ বহন করিবেন যেগুলির গৃহ পল্লীবাসীরা নিজব্যয়ে নির্মাণ করিয়া দিবেন। বিদ্যাসাগর কালবিলম্ব না-করিয়া তাঁহার অধীনস্থ যে-চারিটি জেলায় বালকদিগের জন্য মডেল স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন সেই চারিটি জেলায় ১৮৫৭ সনের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৫৮ সনের মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাসে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৩০. ৬. ১৮৫৮ তারিখ পর্যন্ত স্কুলের শিক্ষকগণের বেতন বাবদ পাওনা হইল প্রায় ৩৪৪০ টাকা। বাংলা সরকার এই অর্থ সাহায্যের জন্য ভারত গভর্নমেন্টকে সুপারিশ করিলেও শেষোক্ত গভর্নমেন্ট প্রথমে এই অর্থ দান করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহারা এই অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তবে ভবিষ্যতে আর-কোনো সাহায্য দিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন। স্বপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার জন্য তিনি একটি নারীশিক্ষা ভাণ্ডার খুলিলেন। ইহাতে বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক, যথা পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং

উচ্চপদস্থ ইংরাজ সরকারি কর্মচারী, যথা — স্যার বার্টল ফ্রিয়ার ও ছোটলাট স্যার সিসিল বিডন নিয়মিত চাঁদা দিতেন।

৩. মহিলাগণের মধ্যে সর্বপ্রথম কুমারী চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৪ সনে বেথুন কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শেক্স্পীয়রের একপ্রস্থ গ্রন্থাবলি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর ও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও কলেজ

১৮৫৯ সনে শঙ্কর ঘোষের লেনে এক ভাড়াবাড়িতে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, যাদবচন্দ্র পালিত, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ও মাধবচন্দ্র ধাড়া — এই ছয়জন স্থানীয় ভদ্রলোক ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল নামে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্যামাচরণ মল্লিক ও প্রধান শিক্ষক কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম কয়েকমাস প্রতিষ্ঠাতৃগণই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সরকারি চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা বিদ্যাসাগর ও তাঁহার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা স্বীকৃত হইলে এক পরিচালক কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর ওই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬১ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত স্কুল এই কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। পরিচালকবর্গের মধ্যে মতান্তর হওয়ায় ওই সনের এপ্রিল মাসে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী এবং অন্য একজন প্রতিষ্ঠাতা পদ ত্যাগ করিয়া ১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাটিতে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি নাম দিয়া এক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতৃগণ বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, রমানাথ ঠাকুর ও হীরালাল শীলের হস্তে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার সমর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। নূতন কমিটি গঠিত হইল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ওই কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাসাগর সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক রহিয়া গেলেন। ১৮৬৪ সনের প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করিয়া প্রথমে হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন রাখা হইল। অল্পকাল পরে 'হিন্দু' শব্দ বাদ দিয়া স্কুলের নাম শুধু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন রাখা হয়।

অল্পদিন পরে রামগোপাল ঘোষ, রমানাথ ঠাকুর ও হীরালাল শীল পদত্যাগ করিলেন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ১৮৬৬ সনে ও হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৮ সনে পরলোকগমন করিলেন। অতএব বিদ্যালয় পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার একমাত্র বিদ্যাসাগরের উপরেই পড়িল। ২৫. ১. ১৮৭২ তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্র, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল ও নিজেকে লইয়া বিদ্যাসাগর এক নূতন কমিটি গঠন করিলেন।

১৮৭২ সনে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এফ. এ. পর্যন্ত পড়াইবার মঞ্জুরি দিলেন। স্কুল বিভাগ শঙ্কর ঘোষের লেনেই রহিল কিন্তু কলেজ বিভাগ ২৪ (বর্তমানে ৫০) সুকিয়া স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত হইল। ১৮৭৪ সনে প্রথম এফ. এ. পরীক্ষায় মেট্রোপলিটন কলেজের এক ছাত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

গুণানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। কলেজের এই সাফল্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। মেট্রোপলিটন কলেজ গভর্নমেন্টের নিকট হইতে একটি পয়সাও সাহায্য পাইত না। এইটি শুধু বাংলা দেশেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম কলেজ যাহার প্রতিষ্ঠাতা ভারতীয়, পরিচালকবৃন্দ ভারতীয় ও শিক্ষকগণ ভারতীয়। এদেশীয় অধ্যাপকগণ যে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকগণের অপেক্ষা সর্ববিষয়েই, এমনকী ইংরাজি পর্যন্ত, অধিক ভালো পড়াইতে পারেন বিদ্যাসাগর মহাশয় হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া না-দিলে কেহ বিশ্বাস করিত না।

বিদ্যাসাগর প্রথমে কলেজকে ৬৩ আমহার্স্ট স্ট্রিটের নিজ বাসভবনে স্থান দান করেন, পরে কলেজ ২৪ সুকিয়া স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। এই ভবনটি পরে ঠনঠনিয়ার লাহাবাবুরা নিজেদের বসবাসের জন্য ক্রয় করিলে তাঁহারা কলেজ ওই বাটি হইতে উঠাইয়া লইবার জন্য বিদ্যাসাগরকে তাগিদ দেন। বিদ্যাসাগর ১৮৮৫ সনে ২২ (বর্তমান ৩৯) শঙ্কর ঘোষের লেনে মহেন্দ্রনারায়ণ দাসের নিকট হইতে ১ বিঘা ১১ কাঠা জমি ২৮ হাজার টাকায় খরিদ করেন। তাহার উপর আরো দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্কুল ও কলেজের জন্য দুইটি ত্রিতল ইমরাত নির্মাণ করেন। ১৮৮৬ সনে নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ১৮৮৭ সনের জানুয়ারি মাসে প্রথমে কলেজ ও তাহার কয়েকমাস পরে স্কুল নবনির্মিত নিজস্ব গৃহে উঠিয়া যায়।

১৮৭৯ সনে কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয় অর্থাৎ বি. এ. পর্যন্ত পড়াইবার অনুমতি লাভ করে। ১৮৮৪ (অন্যমতে ১৮৮২) সনে আইন শ্রেণী এবং ১৮৮৫ সনে বি. এ. অনার্স অর্থাৎ এম. এ. শ্রেণী খোলা হয়। ১৮৭৪ সনে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের শ্যামপুকুর শাখা, ১৮৮৫ সনে বহুবাজার শাখা ও ১৮৮৭ সনে বড়বাজার শাখা খোলা হয়। ১৮৮৭ সনের জুলাই মাসে ইউনিভার্সিটি স্কুল ও কলেজকে বিদ্যাসাগরের হস্তে অর্পণ করা হয়। কলেজ বিভাগ মেট্রোপলিটন কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়, স্কুল বিভাগ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের বালখানা শাখারূপে পরিচিত হয়।

প্রথম দিকে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, হেরম্বলাল গোস্বামী ও মহেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন। কলেজের অধ্যাপকগণের মধ্যে ছিলেন :

সূর্যকুমার অধিকারী	অধ্যক্ষ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ইংরাজি সাহিত্য
প্রসন্নকুমার লাহিড়ী	ইংরাজি সাহিত্য
চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ইতিহাস ও দর্শন
বৈদ্যনাথ বসু	গণিত
নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন	সংস্কৃত
ক্ষুদিরাম বসু	ন্যায় ও দর্শন
চণ্ডীদাস ঘোষ	ব্যায়াম শিক্ষক

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করিয়া ১৮৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে ফিরিয়া শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হন। ৩১. ৩. ১৮৭৪ তারিখে তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস হইতে অপসারিত হন। তৎপূর্বেই তিনি বিলাতে গিয়া মিডল টেম্পলে ভর্তি হইয়া ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ব্যারিস্টারি

সনদ দিতে অস্বীকার করেন, এই কারণে যে ভারত গভর্নমেন্ট তাঁহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ সনের জুন মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৭৬ সনের জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগর বন্ধুপুত্র সুরেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটন কলেজে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে ইংরাজি সহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৮৮১ সন পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ এই কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

ফরিদপুর-নিবাসী সূর্যকুমার অধিকারীর সহিত ১৩. ৭. ১৮৭৫ তারিখে বিদ্যাসাগরের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ হয়। সূর্যকুমার তখন কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে হেয়ার স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া ১৮৭৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও কলেজের সম্পাদক ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। মতান্তরে সূর্যকুমার ১৮৭৪ সনে কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১২ বৎসর (অথবা ১৪ বৎসর) পরে মতান্তরের ফলে বিদ্যাসাগর তাঁহাকে ১৮৮৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যক্ষ পদ হইতে অপসারিত করিয়া গণিতের অধ্যাপক বৈদ্যনাথ বসুকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

স্কুলের বেতন ছিল	মাসে ৩ টাকা
কলেজে ভর্তির ফি	৫ ”
কলেজের বেতন	মাসে ৩ টাকা
আইন ক্লাসের বেতন ছিল	
১ম বৎসর	৩০ ”
২য় বৎসর	৩৬ ”
৩য় বৎসর	৪২ ”
কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল	
১৮৭৪ সনে	৫০০ জন
১৮৮৮ সনে	৮৩৭ ”

স্কুল ও কলেজ পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় বিদ্যাসাগর নিজেই বহন করিতেন। শঙ্কর ঘোষের লেনের জমি ক্রয় ও তাহার উপর পাকাবাড়ি নির্মাণ করিবার সমস্ত অর্থই তিনি একা দিয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের ও কলেজের খ্যাতনামা ছাত্রগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল :

১. নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)
২. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়)
৩. আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়
৪. স্যার রাসবিহারী ঘোষ
৫. কিরণচন্দ্র দে, আই. সি. এস.
৬. জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আই. সি. এস. (রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা)
৭. অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৮. ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী (রাসায়নিক)
৯. ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (দার্শনিক)
১০. রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক)

১১. চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক)
১২. অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (চিত্রকলার ঐতিহাসিক ও সমালোচক)।
মেট্রোপলিটন কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বিদ্যাসাগর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১. কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্নমেন্ট ২৬. ১. ১৮৫৫ তারিখে এক বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করেন। বিদ্যাসাগর এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।
২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৪. ১. ১৮৫৭ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর প্রথমাবধিই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। কিন্তু তিনি কোনোদিনই সভায় যোগ দেন নাই। সভা-সমিতিতে তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি সভা-সমিতিতে যাইতেন না।

বিদ্যাসাগর ও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার পুরা ইংরাজি নাম 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স', সংক্ষেপে 'সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন'। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। ইনি ১৮৬১ সনে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ভেষজবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসায় সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৩ সনে তিনি এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৬৮ সনের জানুয়ারি মাস হইতে তিনি 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামে চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকার ১৮৬৯ সনের আগস্ট সংখ্যায় তিনি ভারতবাসীদের বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধেই তিনি সর্বপ্রথম 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ইহার পরে তিনি ৩. ১. ১৮৭০ তারিখে এই সভার অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন এবং পরিকল্পিত বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন থাকায় স্বদেশবাসীদিগের নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। বিদ্যাসাগর ওই আবেদনে সাড়া দিয়া বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠার জন্য এক হাজার টাকা দান করেন।

বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের সভাপতিত্বে ১৫. ১. ১৮৭৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিজ্ঞানসভার নাম ধার্য হয় ও স্থির হয় এই সভা প্রথমে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবে। বিজ্ঞানসভায় ট্রাস্টি ও অধ্যক্ষসভাও গঠিত হয়। মোট ছয়জন ট্রাস্টির মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিদ্যাসাগর। ছোটলাট টেম্পল বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। স্বয়ং ৫০০ টাকা দান করেন। তদতিরিক্ত বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে কলেজ স্ট্রিট ও বউবাজার স্ট্রিটের মোড়ে একটি বাড়ি (২১০ বউবাজার স্ট্রিটে) বিনা ভাড়ায় সভার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেইখানে ২৯. ৮. ১৮৭৬ তারিখে স্যার রিচার্ড

টেম্পল ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার দ্বার উন্মোচন করিলেন। ১৯৫৪ সনের জানুয়ারি মাসে বিজ্ঞানসভা যাদবপুরে বৃহত্তর পরিসরে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং বউবাজারের বিজ্ঞানসভার স্থান অধিকার করিয়াছে গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স।

বিদ্যাসাগর ও ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক যে-সকল নাবালক রাজা ও জমিদার ছিল তাহাদিগকে একজন সরকারি পরিচালকের তত্ত্বাবধানে একটি বাটীতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট ১৮৫৬ সনের মার্চ মাসে কলিকাতায় তদানীন্তন ৬ মানিকতলা রোডে (বর্তমানে ৫৮/১/২ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে) এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া 'ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান ১৮৮০ সন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে এই ইনস্টিটিউশনের পরিচালক নিযুক্ত হন। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন।

বাগানটি উত্তরে বর্তমান বিবেকানন্দ রোড হইতে দক্ষিণে বাহির-মির্জাপুর বা হরিনাথ দে স্ট্রিট পর্যন্ত, পূর্বে প্রায় খালধার পর্যন্ত ও পশ্চিমে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের প্রায় সমস্তটা জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। তখনও রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট হয় নাই। এই বাগানের মধ্যে তিনটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। বাগানের মধ্যে একটি উত্তরদ্বারী গাড়িবারান্দাওয়ালা দ্বিতল অট্টালিকা ছিল। এই বাড়িতেই রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে জমিদার বালকেরা বাস করিত। এই বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট আসিতেন ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার কথা তন্ময় হইয়া শুনিতেন।

এই বাগানবাড়ি ছিল জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশের শ্রীকৃষ্ণ সিংহের। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতৃব্য। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের পুত্র ছিল না, একটিমাত্র কন্যা ছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

এই শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতেই ইয়ং বেঙ্গলদের অর্থাৎ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিতর্ক ও বক্তৃতাসভা 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ছিল ১৯২৮ হইতে ১৮৩১ সন পর্যন্ত।

১৮৬৩ সনের নভেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট বিদ্যাসাগরকে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। পরিদর্শকরূপে তিনি ১১. ১. ১৮৬৫ ও ১. ৯. ১৮৬৫ তারিখে দুইটি রিপোর্ট গভর্নমেন্টকে দাখিল করেন। প্রথম রিপোর্টে তিনি ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত ছাত্রদের দৈহিক শাস্তি বিধানের প্রথাকে অবিলম্বে রহিত করিবার সুপারিশ করেন। দ্বিতীয় রিপোর্টে তিনি বলেন যে ওই প্রতিষ্ঠানে নাবালক জমিদারদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, সেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই দুই রিপোর্ট লইয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত মতভেদ হওয়ায় বিদ্যাসাগর পরিদর্শক-পদ ত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর ও হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড

বিদ্যাসাগর মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেন ও রায় রাজেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের সাহায্যে 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' বা পারিবারিক বৃত্তিভাণ্ডার ১৫. ৬. ১৮৭২ তারিখে স্থাপিত করেন। উদ্দেশ্য : যাহাতে স্বল্প আয়ের সাধারণ বাঙালি গৃহস্থ মৃত্যুকালে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারে। এই ভাণ্ডারের ট্রাস্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও জজ দ্বারকানাথ মিত্র। ডিরেক্টর বোর্ডের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও নরেন্দ্রনাথ সেন। সম্পাদক ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন। তিন বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিদ্যাসাগর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই ফান্ড পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা ঘটায় বিদ্যাসাগর ২১. ২. ১৮৭৬ তারিখে ইহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাহার ফলে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ট্রাস্টি পদ ত্যাগ করেন। উপরোক্ত তারিখে বিদ্যাসাগর ডিরেক্টরদের লিখিয়াছিলেন :' যাঁহাদের আপনারা পরিচালনা-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না।'

বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারি

১. মদনমোহন (চট্টোপাধ্যায়) তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে ১৮৪৭ সনে সংস্কৃত কলেজের নিকটেই সংস্কৃত প্রেস (যন্ত্র) ও প্রেস ডিপোজিটারি (পুস্তকালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন : 'যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। এই ছাপাখানার, তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম।'

১৮৫০ সনে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত বিদ্যাসাগরের গুরুতর মনান্তর ও চিরজীবনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে। এই বিচ্ছেদের সঠিক কারণ আজও অজ্ঞাত। কিন্তু মদনমোহনের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলেও মদনমোহনের মাতা, ভগিনী বামাসুন্দরী দেবী ও কন্যা কুন্দমালা দেবীর জন্য উইলে বিদ্যাসাগর যথাক্রমে ৮, ৩, ও ১০ টাকা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যান। বিচ্ছেদের পর তর্কালঙ্কারের অংশ ক্রয় করিয়া বিদ্যাসাগর সমগ্র প্রেস ও ডিপোজিটারির স্বত্বাধিকারী হন। এমনকী মদনমোহন-প্রণীত 'শিশুশিক্ষা' তিন ভাগও ক্রয় করিয়া লন।

২. বিদ্যাসাগর তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু, বিধবা-বিবাহের উৎসাহী সমর্থক কৃষ্ণনগর নিবাসী ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে ১৮৬৯ সনে সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারি দান করেন। অথচ তখন একাধিক ব্যক্তি ওই প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারি ২৫ বা ৩০ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই কারণে ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রেসের অর্ধাংশ দাবি করিয়া বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করিতে যান। শেষ পর্যন্ত কোর্টে না-গিয়া উভয় ভ্রাতা মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল দুর্গামোহন দাশকে সালিশ মান্য করিয়া তাঁহাদের উপরই বিচারভার অর্পণ করেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ১৭. ১০. ১৮৬৮ তারিখে আপন

অংশের দাবি ত্যাগ করায় সালিশদ্বয়কে বিশেষ কিছু করিতে হয় না। বিবাদ এইভাবে নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

বজ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরে মতের অনৈক্য হওয়ায় বিদ্যাসাগর ১৮৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে নিজের লেখা ও প্রকাশিত পুস্তকগুলি সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি হইতে লইয়া আসেন এবং ১৮৮৬ সনের জানুয়ারি মাসে ২৫ (বর্তমান ৫২) সুকিয়া স্ট্রিটে 'দি ক্যালকাটা লাইব্রেরি' (কলিকাতা পুস্তকালয়) নাম দিয়া একটি পুস্তকের দোকান খোলেন।

এই ২৫ সুকিয়া স্ট্রিটের বাটীতেই ১. ১. ১৮৮৫ তারিখে ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৯৯ সনে কলেজের নাম হয় সি. এম. এস. (চার্চ মিশনারি সোসাইটি) কলেজ এবং সর্বশেষে সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, সংক্ষেপে সেন্ট পল্‌স কলেজ। ১৮৬৮ সনের এপ্রিল মাসে ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ ২৫ সুকিয়া স্ট্রিটের বাটী হইতে ২২ মির্জাপুর স্ট্রিটের বাটীতে উঠিয়া যায়। বর্তমানে এই বাটীতে কলিকাতা কর্পোরেশনের ৩ নম্বর জেলা অফিস আছে। পূর্বে এই বাটী একটি বড় বাগানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। পোস্তার রাজা নরসিং (নর সিংহ) রায় এই বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন। এখানেই ১৮২৩ সনে হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৫ সনে এখানে শীলস্ ফ্রি কলেজ ছিল। এখানেই পাদরি আলেকজান্ডার ডাফ ১৮৩০ সনে বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে বাস করিয়াছিলেন। সেন্ট পল্‌স কলেজ বর্তমানে ৩৩/১ আমহার্স্ট স্ট্রিটে।

বিদ্যাসাগর ও তত্ত্ববোধিনী সভা

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে মাত্র দশজনকে লইয়া আপন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ৬. ১০. ১৮৩৯ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে ইহার নাম ছিল তত্ত্বরঞ্জিনী সভা। দ্বিতীয় অধিবেশনে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে এই সভার নাম রাখা হয় তত্ত্ববোধিনী সভা। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় : 'এই সভার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার।' এই সভার উদ্দেশ্য অধিকতর সফল করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ১৬. ৮. ১৮৪৩ তারিখ হইতে অক্ষয়কুমার দত্তকে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার ২১. ১২. ১৮৪৩ তারিখে একসঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা উভয়কেই একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতে প্রয়াসী হন কিন্তু এই প্রয়াসে তিনি সফল হন নাই। সভা ও পত্রিকা উভয়ই তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তিনি ৮. ৩. ১৮৫৪ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন : 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।' দেবেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া একান্তে ধর্ম সাধনোদ্দেশ্যে ৩. ১০. ১৮৫৬ তারিখে হিমালয় যাত্রা করিলেন এবং দুই বৎসর পর ১৫. ১১. ১৮৫৮ তারিখে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। হয় তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কিঞ্চিৎ পূর্বে, নয় অব্যবহিত পরে ১৮৫৮ সালেই বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভার শেষ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের

পরামর্শক্রমে ৮. ৫. ১৮৫৯ তারিখে আহুত শেষ সাংবৎসরিক সভার অধিবেশনে তাহার যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে বিশ বৎসর যাবৎ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া তত্ত্ববোধিনী সভা লুপ্ত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ওই সভার সম্পাদক পদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লুপ্ত হইল না বটে, কিন্তু তাহা ওই সময় হইতে কেবল ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের যন্ত্রে পরিণত হইল।

বিদ্যাসাগর ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ

বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় নাটক ও নাট্যশালার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

১. বড়বাজারে গঙ্গাধর শেঠের বাড়িতে ২২. ৩. ১৮৫৮ তারিখে রামনারায়ণ তর্করত্ন -প্রণীত বঙ্গভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর তৃতীয়বার অভিনয় হয়। বিদ্যাসাগর এই অভিনয় দর্শন করেন।

২. পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালায়' ৩১. ৭. ১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দর্শন করেন।

৩. রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটির বাটিতে ২৩. ৪. ১৮৫৯ তারিখে বিদ্যাসাগর উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয় দর্শন করেন।

এই বাটীতেই ২. ৫. ১৮৫৩ তারিখে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ সনে কলেজ উঠিয়া গেলে কেশব সেনের পিতৃব্য অ্যাটর্নি মুরলীধর সেন এই বাটীতে এক রঙ্গ মঞ্চ স্থাপন করেন ও তাহার নাম দেন 'মেট্রোপলিটন রঙ্গমঞ্চ'। এই রঙ্গমঞ্চেই 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলভুক্ত সকলেই অভিনয় করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন মঞ্চাধ্যক্ষ। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিকবার অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন ও প্রতিবার অভিনয় দর্শন করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

৪. মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যশালা'র (১৮৬৫-৭৩) কার্যনির্বাহক কমিটিতে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন ছিলেন। এই দুইজনকে রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করিতে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য দেখিয়াছিলেন।

৫. মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়ের দ্বারা ১৬. ৮. ১৮৭৩ তারিখে 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর উদ্বোধন হয়। এই থিয়েটারের কার্যনির্বাহক কমিটিতেও নাকি বিদ্যাসাগর ও মাইকেল ছিলেন। এই অভিনয়ের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতারাই অভিনয় করিয়া আসিয়াছে। মাইকেলের পরামর্শে এই থিয়েটারেই সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকের ভূমিকা স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনয়

করাইবার জন্য বারাঙ্গনাদের মধ্য হইতে চারিজন অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়। বিদ্যাসাগর ইহার বিরোধী ছিলেন। সেইজন্য তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের কার্যনির্বাহক কমিটি হইতে পদত্যাগ করেন। ইহার মূলে কতদূর সত্য আছে বলিতে পারি না।

৬. বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আর-একটি কিংবদন্তি মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে যে তিনি নাকি 'নীলদর্পণ' নাটকে উড সাহেবের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির অভিনয় দেখিয়া এতই উত্তেজিত ও আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন যে সক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে আসন হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া রঙ্গমঞ্চস্থ অভিনেতার প্রতি আপন পাদুকা (চটিজুতা) খুলিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অর্ধেন্দুশেখরও নিজেকে ধন্য মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পাদুকা স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করিয়াছিলেন। ইন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন, এটি অমূলক কিংবদন্তি মাত্র। এই ঘটনার কোনো সমসাময়িক লিখিত প্রমাণ নাই। বিদ্যাসাগর চটিজুতা ছুঁড়িয়া না-মারিয়া থাকিতে পারেন। আবার মারিয়া থাকিলেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ওই কার্য করা তাঁহার মতন ভাবপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়। মারুন আর নাই মারুন, যে-নাটক তখন সমস্ত বাংলা দেশকে তোলপাড় করিতেছিল, বাঙালি মাত্রকেই ক্ষ্যাপাইয়া, মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে-নাটক যে বিদ্যাসাগর একবার নয়, একাধিকবার দেখিয়াছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু আমি যতদূর জানি কোথাও তো এ-কথা লেখা নাই যে বিদ্যাসাগর এই নাটক দেখিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া দারুণ অর্থাভাবে বিপন্ন মাইকেল মধুসূদন দত্ত গত্যন্তর না-দেখিয়া ফ্রান্সের ভের্সাই নগরী হইতে কলিকাতায় বিদ্যাসাগরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ১৮৬৪ সনের ২ জুন, ৯ জুন ও ১৮ জুন তারিখে পরপর তিনখানি পত্র লিখেন। পত্র পাইয়া বিদ্যাসাগর ২. ৮. ১৮৬৪ তারিখে মধুসূদনকে ১৫০০ টাকা পাঠাইয়া দেন। সুদূর বিদেশে মধুসূদনের এই ঘোর দুর্দিনে একমাত্র বিদ্যাসাগরই তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর পরে নিজ দায়িত্বে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (ইনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন) নিকট হইতে ৩০০০ টাকা ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের (ইনি প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন) নিকট হইতে ৫০০০ টাকা কর্জ করিয়া মধুসূদনকে পাঠাইয়াছিলেন। পরে ১৮. ৫. ১৮৬৫ তারিখে বিদ্যাসাগরকে তাঁহার এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া মধুসূদন ওকালতনামা পাঠাইলে বিদ্যাসাগর মধুসূদনের বিষয় বন্ধক রাখিয়া অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ১২০০০ টাকা লইয়া মাইকেলকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মধুসূদন পরে তাঁহার দুইটি ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সমস্ত পাওনা টাকা পরিশোধ করিয়া বিদ্যাসাগরকে সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পরেও বিদ্যাসাগরকে মাঝে মাঝে মধুসূদনের অনেক আবদার সহ্য করিতে হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর ও সংবাদপত্র

১. পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ৬. ১০. ১৮৩৯ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা ও তাহার ৪ বৎসর পরে ১৬. ৮. ১৮৪৩ তারিখে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় উক্ত সভার মুখপত্র মাসিক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির অনুকরণে তিনি ওই পত্রিকার জন্য একটি পেপার কমিটি বা প্রবন্ধ-নির্বাচনী কমিটি (তৎকালীন বাংলায় ইহাকে গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা বলা হইত) নিযুক্ত করেন। এই কমিটিতে এককালে পাঁচজনের অধিক সভ্য লওয়া হইত না। বিদ্যাসাগর প্রথমাবধিই এই পেপার কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি স্বয়ং এই পত্রিকার জন্য লিখিতেন। বাংলা 'মহাভারত' (উপক্রমণিকা ভাগ) তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

২. ১৮৫০ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ঠনঠনিয়ার রামচন্দ্র চন্দ্রের ৫৮ সংখ্যক ভবনে, সর্বশুভকরী সভা স্থাপিত হয়। ওই সনের আগস্ট মাসে ওই সভার সভ্যগণ অর্থাৎ হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণ সভার মুখপত্র স্বরূপ 'সর্বশুভকরী' পত্রিকা নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ওই পত্রিকার অধ্যক্ষ বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের অনুরোধে বিদ্যাসাগর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাল্য বিবাহের দোষ কি' এই শিরোনামায় একটি রচনা প্রকাশ করেন। জনৈক মতিলাল চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার নামমাত্র সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫১ সনেই পত্রিকাখানির প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন : '১৮৫৮ সনের ১৫ই নভেম্বর সোমবার কলিকাতার চাঁপাতলা হইতে সোমপ্রকাশের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ... সোমপ্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা প্রকৃতপক্ষে সোমপ্রকাশেই প্রথম শুরু হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরামর্শাদির দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদনা বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।'

অন্যপক্ষে ৯. ১. ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে সোমপ্রকাশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বারা প্রথম পরিকল্পিত হয় এবং আমাদের বিশ্বাস এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সম্পূর্ণ বিদ্যাসাগরের লিখিত। কিন্তু বিদ্যাসাগর পীড়িত হইয়া পড়ায় পত্রিকাখানি পণ্ডিত দ্বারকানাথকে দিয়া দিলেন।

১৮৬২ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত সোমপ্রকাশ কলিকাতার চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তখন ওই গলিতে থাকিতেন। ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাস হইতে পত্রিকা বিদ্যাভূষণের গ্রাম চাংড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯. ৪. ১৮৮০ তারিখ হইতে সোমপ্রকাশ 'নবকলেবর ধারণ করিয়া ... কলিকাতা মির্জাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া' প্রকাশিত হইতে থাকে। ২৩. ৮. ১৮৮৬ তারিখে বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সোমপ্রকাশেরও মৃত্যু হয়। সোমপ্রকাশ তৎকালে বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা ছিল।

৪. ইংরাজি ১৪. ৬. ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী-সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিলে তাঁহার মাতা ও পত্নী নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হন। তাঁহারা হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা ও প্রেস বিক্রয় করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহ ক্রয় করিতে সম্মত না-হওয়ায় বিদ্যাসাগরের অনুরোধে কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫০০০ টাকা দিয়া ওই পত্রিকা ও

প্রেস খরিদ করেন। ১৮৬১ সনের ডিসেম্বর মাসে কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট হইতে বিদ্যাসাগর হিন্দু পেট্রিয়টের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং বিদ্যাসাগরকে ওই ভার দেন। ১৮৬২ সনের জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে মাইকেল মধুসূদন হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ওই সালের এপ্রিল কি মে মাস পর্যন্ত মাইকেল পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া ছাড়িয়া দেন। তখন 'কৃষ্ণদাস পালের উপর বিদ্যাসাগরের দয়া হইল। কৃষ্ণদাস পালকে ডাকাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদাস তখন বালক। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রবন্ধাদি তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস এইরূপে কিয়দ্দিনের জন্য বিদ্যাসাগরের অধীনে থাকিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকের কার্য করেন। ... কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকতা প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগরের এই অনুগ্রহ না হইলে হয়ত কৃষ্ণদাসকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভার চাকরি করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত'। (রামগোপাল সান্যাল কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর জীবনী'তে উদ্ধৃত)। আমরণ কৃষ্ণদাস পাল এই পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারীও হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর ও বাংলা ভাষা

বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক। অক্ষয়কুমার দত্তকেও বিদ্যাসাগরের সহিত ওই সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে। সেই অক্ষয়কুমার দত্তকেও বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য লিখিতে শিখাইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন : 'অনেকে অবগত নহেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন : 'বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।'

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : 'তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। ... বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী। ... বিদ্যাসাগর বাংলা লেখায় সর্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ছেদ চিহ্নগুলি প্রচলিত করেন। ... গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য ভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।'

বিদ্যাসাগরের গদ্যে ছন্দ আছে, সুর আছে, কাব্য আছে, সংগীত আছে। তাহা গদ্যময় কাব্য বা কাব্যময় গদ্য। তাঁহার 'বর্ণপরিচয়'-এ 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পড়িয়াই শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে কবিত্ব জাগে। এখানে রবীন্দ্রনাথ একটু ভুল করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' লেখেন নাই। লিখিয়াছিলেন 'জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে'। অন্যত্র যেখানে 'জল পড়ে' লিখিয়াছেন, সেখানে 'পাতা নড়ে' লেখেন নাই।

বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানবোধ ও ধুতি, চাদর, চটিজুতার মর্যাদা

১. ৬. ৪. ১৮৪৬ হইতে ১৪. ৭. ১৮৪৭-এর মধ্যে কোনো এক সময়ের ঘটনা। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ও মি. জেমস কার হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ।

একদিন বিদ্যাসাগর কোনো প্রয়োজনে সংস্কৃত কলেজ হইতে হিন্দু কলেজে কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কার সাহেব তখন তাঁহার কামরায় সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পাদুকা-শোভিত পদযুগল সম্প্রসারিত করিয়া চেয়ারে বসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া পদযুগল নামাইলেনও না বা গুটাইলেনও না বরং পায়ের দিকে যে-চেয়ার ছিল অঙ্গুলিসংকেতে তাহাতে বিদ্যাসাগরকে বসিতে বলিলেন। সেই অবস্থায় কথাবার্তা সারিয়া বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে কী প্রয়োজনে কার সাহেব সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিদ্যাসাগর টেবিলের উপর তাঁহার তালতলার চটিশোভিত পদযুগল কার সাহেবের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া কথাবার্তা বলিলেন। এই ব্যবহারে কার সাহেব অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া উপরওয়ালার নিকট নালিশ করিলেন। বিদ্যাসাগরের নিকট লিখিত কৈফিয়ত তলব করা হইলে তিনি উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অবিকল ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম দুই কারণে ; প্রথম, বাংলা অনুবাদে মূলের তীব্র ব্যঙ্গরস রক্ষা করা সম্ভব হইবে না ; দ্বিতীয়, এই সময়ের মধ্যেই তিনি ইংরাজি রচনায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য। বিদ্যাসাগর লিখিলেন :

> I thought that we (natives) were an uncivilised race quite unacquainted with refined manners of receiving a gentleman visitor. I learned the manners of which Mr. Kerr complains from the gentleman himself, a few days ago, when I had an occasion to call on him. My notions of refined manners being thus formed from the conduct of an enlightened, civilised European, I behaved myself as respectfully towards him as he had himself done.

২. কাশীর হিন্দি কবি ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবকের[১] সঙ্গে ২৮. ১. ১৮৭৪ তারিখে বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম বা জাদুঘর[২] দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রথম দুই ব্যক্তির পরিধানে প্যান্ট, কোট ও বিলাতি জুতা ছিল। প্রথম দুইজন বিনা বাধায় ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বিদ্যাসাগরকে দ্বারবান আটকাইল, বলিল চটিজুতা খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে যাইতে হইবে। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়া পথে অপেক্ষমান গাড়িতে বসিয়া সঙ্গী দুইটির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া সোসাইটির সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ছুটিয়া আসিয়া জোড়হস্তে বিদ্যাসাগরকে ভিতরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই যাইতে রাজি হইলেন না। বলিলেন, তাঁহার জন্য এক

১. ইনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র।

২. তখন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ও তাহার জাদুঘর দুই-ই এক বাটিতেই ছিল — ১ পার্ক স্ট্রিটে।

নিয়ম ও সাধারণের জন্য আর-এক নিয়ম হইতে পারে না। যতদিন না সর্বসাধারণে চটিজুতা পরিয়া ভিতরে যাইবার অধিকার পায়, ততদিন তিনি ভিতরে যাইবেন না। এই বিষয়ে ভারত গভর্নমেন্টে পর্যন্ত বহুদিন ধরিয়া বিস্তর লেখালিখি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা শেষপর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য প্রচলিত নিয়ম তুলিয়া দিতে সম্মত হইলেন না। বিদ্যাসাগরও আর-কোনোদিন এশিয়াটিক সোসাইটির বা জাদুঘরের ছায়া মাড়ান নাই।

৩. এই পণ্ডিতি বেশে, শুধু ধুতি, চাদর ও জুটিজুতা পরিয়া তিনি সর্বত্র, এমনকী লাটভবন পর্যন্ত যাইতেন। একবার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লাটভবনে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর তাহার উত্তরে লাট সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে তাহা হইলে সেইটিই লাটসাহেবের সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎকার। কারণ লাটসাহেবের অনুরোধ তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহার আর লাটভবনে আসা হইবে না। লাটসাহেব অবস্থা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাহার করিয়া লইয়া পূর্ববৎ দেশি পরিচ্ছদেই বিদ্যাসাগরকে তৎসকাশে আসিতে বলিলেন।

৪. বিদ্যাসাগর একদিন শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, 'দেখো, ভারতবর্ষে এমন কোনো রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতা-সুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।' শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, একথা শুনিয়া তাঁহার একটুও অবিশ্বাস হয় নাই।

বিদ্যাসাগরের সামাজিক মত

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মত সুপরিচিত। তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এ স্থলে অন্য কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার মত সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

১. হীরা বুলবুল নাম্নী কলিকাতার এক প্রসিদ্ধা বাইজির পুত্র ১৮৫৩ সনের প্রারম্ভে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়। হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ হয়। কিন্তু গভর্নমেন্ট তাঁহাদের আপত্তিতে কর্ণপাত না-করায় ২. ৫. ১৮৫৩ তারিখে রাজেন্দ্র দত্ত, মতিলাল শীল, রাজা রাধাকান্ত দেব, রমানাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, হরিমোহন সেন প্রভৃতি হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তৎকালীন ৭৭ চিৎপুর রোড সিঁদুরিয়াপটিতে গোপাললাল মল্লিকের বিশাল অট্টালিকায় হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন করেন।

এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, 'মা দুশ্চরিত্রা হইতে পারে কিন্তু পুত্র কি দোষ করিল যে সে বিদ্যালয়ে পড়িতে পাইবে না? মাতার দোষে নিরপরাধ পুত্রের শাস্তি হওয়া উচিত নয়।'

২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ব্রাহ্মবিবাহ আইন— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবর্গ যাহার বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন ও যাহা পরে ১৮৭২ সনের

'তিন আইন' নামে পাস হয়, বিদ্যাসাগর সেই আইন সমর্থন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন, 'আমার বিবেচনায় এরূপ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত বা আবশ্যক।'

৩. ১৮৯০ সনে কলিকাতায় হরি মাইতি নামে কোনো ব্যক্তি ফুলমণি নাম্নী তাহার কিঞ্চিদধিক দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা বধূর সহিত বলপূর্বক সহবাস করিতে যাইয়া তাহার মৃত্যু ঘটায়। তখন ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে স্ত্রীর পক্ষে সহবাসের সম্মতি দিবার বয়ঃক্রম ছিল অন্যূন দশ বৎসর। গভর্নমেন্ট এই বয়ঃক্রম বর্ধিত করিয়া দ্বাদশ বৎসর করিবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক খসড়া আইন (বিল) উপস্থিত করেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এই বিলের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করে। এই সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা এই প্রস্তাবিত আইনকে উপলক্ষ করিয়া গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করিতে থাকে। গভর্নমেন্ট এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মত জানিতে চাহিলে তিনি লিখিতভাবে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, স্ত্রী ঋতুমতী হইবার পূর্বে স্বামীর স্ত্রীর সহিত সহবাস আইনত দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য হওয়া উচিত। সুতরাং বর্তমান আইন সংশোধন করিয়া ওইরূপ আইন বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নচেৎ স্ত্রীর বয়ঃক্রম মাত্র বারো বৎসর করিলে তাহাকে স্বামীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যাইবে না। এদেশে কন্যারা সাধারণত ১২ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে রজস্বলা হয়। কিন্তু গভর্নমেন্ট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গ্রহণ না-করিয়া তাঁহাদের 'সহবাস সম্মতি বিল'টি ১৮৯১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আইনে পরিণত করেন।

৪. বিদ্যাসাগরের পরম সুহৃদ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের মত ছিল হিন্দু-বিধবা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবার পর ভ্রষ্টা হইলে উত্তরাধিকারের অবসান হইবে এবং সেই রমণী স্বামীর সম্পত্তি হইতে চ্যুত হইবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত ছিল উহার বিপরীত। তিনি বলিতেন যে বিধবা রমণী স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হইবার পরে পতিতা হইলেও মৃত স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইতে পারে না।

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত

বিদ্যাসাগর সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলিতেন। তিনি নিজে পজিটিভিস্টও ছিলেন না — অ্যাগ্‌নস্টিকও ছিলেন না। পুরাপুরি নাস্তিক ছিলেন। একথা আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য— যিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রায় ৪৫ বৎসর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন এবং যিনি গর্ব করিয়া বলিতেন যে তিনি বিদ্যাসাগরকে যতখানি জানেন অন্য কেহ ততখানি জানেন না—বারংবার জোর দিয়া বলিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন অনেক উক্তি তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে যে সেগুলিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে আচার্য কৃষ্ণকমলের কথাই ঠিক। এইখানেই রামমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য। রামমোহনের চিন্তাজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বর—বিদ্যাসাগরের চিন্তাজগতের বাহিরে ঈশ্বর। অবশ্য ঈশ্বরবিশ্বাসী অনেকেই বিদ্যাসাগরকে ঈশ্বরবিশ্বাসী রূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বুদ্ধ সম্বন্ধেও সে-চেষ্টা হইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের উইল

বাংলা ভাষায় তদ্‌রচিত উইল বা চরম নির্দেশপত্রে বিদ্যাসাগর ৩১. ৫. ১৮৭৫ তারিখে স্বাক্ষর করেন। তিন ব্যক্তিকে এই উইলের কার্যদর্শী (একজিকিউটার) নিযুক্ত করেন: কালীচরণ ঘোষ, ক্ষীরোদনাথ সিংহ ও আপনার ভাগিনেয় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। এই তিনজনের মধ্যে দুইজন কায়স্থ, একজন ব্রাহ্মণ। পূর্ব হইতেই যে-সকল ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের নিকট মাসিক বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদের সকলের জন্যই তিনি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণে হইলেও মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যান। বৃত্তি-প্রাপকদের তিনি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণকে বৃত্তিদান আবশ্যিক করিয়া যান। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে তিনি কার্যদর্শীদের এই নির্দেশ দেন যে যদি কার্যদর্শীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো ব্যক্তিকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ তাঁহার দত্ত বৃত্তি না-পাইলেও তাঁহার চলিতে পারে এরূপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বৃত্তি রহিত করিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিভোগীর সংখ্যা ৩২। তাহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২৫। পুরুষদিগের মধ্যে ছিলেন পিতা, তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠা কন্যার দুই নাবালক পুত্র ও অনাত্মীয়ের মধ্যে বারাসতনিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্র। মহিলা বৃত্তিভোগীদের মধ্যে ছিলেন আত্মীয়া ২০, অনাত্মীয়া ৫। নিকট-আত্মীয়া ছিলেন ১৪। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন — তিন ভগিনী, স্ত্রী, চার কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রী, দৌহিত্রী, কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ, শাশুড়ি, বৈবাহিকী ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়া ৬। অনাত্মীয়াদের মধ্যে ১ জন ব্রাহ্মণ কন্যা (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা) ও ৪ জন কায়স্থকন্যা। শেষোক্তদের মধ্যে দুইজন বিধবা ছিলেন যাঁহাদের পুনর্বিবাহ বিদ্যাসাগর স্বয়ং দিয়াছিলেন। আর দুইজন হইলেন কালীকৃষ্ণ মিত্রের স্ত্রী ও শ্রীরাম প্রামাণিকের স্ত্রী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তিভোগীদের সংখ্যা ১৩। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩, সকলেই আত্মীয়। স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০, তাঁহাদের মধ্যে আত্মীয়া ৬, অনাত্মীয়া ৪। অনাত্মীয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা ২ (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী ও কন্যা) ও কায়স্থকন্যা ২ (বারাসাত-নিবাসী ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্রের স্ত্রী ও বর্ধমানের প্যারীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী)।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তিপ্রাপকদের সংখ্যা ৪৫ ও মোট বৃত্তির পরিমাণ ৫৬২ টাকা।

এতদ্ব্যতীত বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের স্থাপিত বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের জন্য যথাক্রমে মাসিক ১০০ টাকা ও ৫০ টাকা ও ওই গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোকদিগের জন্য মাসিক ৩০ টাকা ও বিধবা-বিবাহের জন্য মাসিক ১০০ টাকা, মোট ২৮০ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া যান।

বিদ্যাসাগরের তিনজন পরিচারক যদি তাঁহার দেহান্ত সময় পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০ টাকা দানের নির্দেশ দিয়া যান।

এই বিনিয়োগপত্রের ২৪ সংখ্যক ধারায় বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন, 'যাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয়, তাবৎ কাল পর্যন্ত এই বিনিয়োগপত্রের নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিলেন তাঁহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং ... ধারার বৃত্তি প্রভৃতি প্রদানপূর্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। ঐ উত্তরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্যদর্শীরা তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন।'

শেষ ২৫ সংখ্যক ধারায় বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন, 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার পর নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য গুরুতর কারণবশতঃ বৃত্তি-নিবন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতুবশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা -নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা -অনুসারে এই বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্বিংশ ধারা -নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্বিংশতি ধারায় লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।'

এই উইলের সাক্ষী ছিলেন ৮ জন — রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ দে, নীলমাধব সেন, যোগেশচন্দ্র দে, বিহারীলাল ভাদুড়ী ও কালীচরণ ঘোষ। সাক্ষীদিগের মধ্যে ৪ জন ব্রাহ্মণ, ৩ জন কায়স্থ ও ১ জন বৈদ্য।

পরিশেষে বিদ্যাসাগর তাঁহার সম্পত্তির নিম্নলিখিত বিবরণ দেন :

ক. সংস্কৃত যন্ত্রের এক-তৃতীয় অংশ ; বিধবা-বিবাহের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আর দুই-তৃতীয়াংশ পূর্বেই বিক্রয় করিয়াছিলেন।

খ. তাঁহার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

বাংলা — ১৫খানি, সংস্কৃত — ৬খানি, ইংরেজি — ২খানি।

গ. যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে—

১. মদনমোহন তর্কালঙ্কার -প্রণীত 'শিশুশিক্ষা' তিন ভাগ

২. রামনারায়ণ তর্করত্ন -প্রণীত 'কুলীন কুলসর্বস্ব'

ঘ. 'কাদম্বরী', 'সটীক বাল্মীকি রামায়ণ' প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক

ঙ. নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, পার্শী, ইংরেজি প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রেরি

চ. কর্মাঁটাড়ের বাংলো ও বাগান

এই বিবরণে তাঁহার বাদুড়বাগানের বাসগৃহ ও শঙ্কর ঘোষের লেনের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও কলেজের জমি ও বাড়ির উল্লেখ নাই, কারণ তখনও সেগুলি হয় নাই।

এই উইল হইতে জানিতে পারা যায় যে ৩১. ৫. ১৮৭৫ তারিখে তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদৌ কোনো মাসিক বৃত্তি দিয়া যান নাই, তাঁহাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, এমনকী নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে, পুত্র কোনোক্রমেই বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী হইতে পারিবেন না। পুত্রের প্রতি এইরূপ কঠোর হইবার দুইটি কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন — পুত্র 'যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী'। এতদ্ভিন্ন 'অন্য গুরুতর কারণ' আছে, এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সে-কারণগুলিকে প্রকাশ করেন নাই।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে এই চরম ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে ১৮৭০ সনে বিদ্যাসাগর পুত্রের আচরণে এতই উত্যক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্রের প্রতি স্বামীর এই কঠোর আচরণে পত্নী দীনময়ী অবশিষ্ট জীবন অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ সনে মাতা দীনময়ী দেবীর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ও পরে পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বকৃত সমস্ত পাপের জন্য গভীর অনুতাপ প্রকাশ করিয়া ও করুণাময় দেবতুল্য পিতার চরণে বারংবার অতি দীনভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া যে দুইখানি মর্ম্মস্পর্শী

পত্র পিতাকে লিখিয়াছিলেন তাহাতে যেন বিদ্যাসাগরের মন পুত্রের প্রতি কিছুটা কোমল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহার ফলে তিনি পুত্র-সংক্রান্ত উইলের নির্দেশ একটিও বদলান নাই। কিন্তু পুত্রের অপরাধে বধূমাতা ভবসুন্দরী দেবী ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের প্রতি বিদ্যাসাগরের স্নেহ-মমতার আদৌ কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তাহাদের প্রতি ভালোবাসার তাঁহার অন্ত ছিল না। তিনি মাসে মাসে বীরসিংহ গ্রামে বধূমাতা ও পৌত্র-পৌত্রীদিগের ভরণপোষণের জন্য অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের আয়, ব্যয় ও ঋণ

সি. ই. বাকল্যান্ড সাহেব লিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরের মাসিক দান ছিল ১৫০০ টাকা এবং তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের আয় ছিল কয়েক বৎসর যাবৎ মাসিক ৩০০০ টাকা হইতে ৪৫০০ টাকা। অর্থাৎ বাৎসরিক আয় যেখানে ৩৬,০০০ টাকা হইতে ৫৪,০০০ টাকা, সেখানে দান ছিল ১৮,০০০ টাকা। সুতরাং বৎসরে তাঁহার অনেক টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকিবার কথা। কিন্তু উদ্‌বৃত্ত থাকা তো দূরের কথা, বরং তাঁহার প্রচুর ঋণ হইত। সে-কথা আমরা তাঁহার উইল হইতেই জানিতে পারি। বিদ্যাসাগরের নিজের জীবন ছিল সরল, অনাড়ম্বর, বিলাসলেশহীন। বিলাসের মধ্যে ছিল পুস্তক ক্রয় করা ও ক্রীত পুস্তক উৎকৃষ্টভাবে বাঁধানো। কিন্তু তাহাতে ঋণ হইবার কথা নহে। ঋণ হইত প্রধানত তিনটি কারণে, যথা — ১. বদান্যতা বা ব্যক্তিগত দান, ২. শিক্ষাবিস্তার ও ৩. বিধবা-বিবাহ।

১. তিনি পরের কষ্ট দেখিলে তাহা মোচন না-করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কোনো প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইত না। নিজের কাছে টাকা না-থাকিলে পরের কাছে ধার করিয়াও তাহাকে সাহায্য করিতেন। ইহার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। মাইকেল তো লিখিয়াছিলেন :

> বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
> করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে।
> দীন যে, দীনের বন্ধু!

তিনি যে মাসে মাসে কত লোককে গোপনে সাহায্য করিতেন তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় তাঁহার উইলে নির্দিষ্ট মাসিক বৃত্তির তালিকা হইতে।

দীন-দুঃখীর সাহায্যের ন্যায় পীড়িতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্যও বিদ্যাসাগর অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। এই দুই ব্যাপারে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ, নারী-পুরুষ বিচার ছিল না এবং ঘৃণাপিত্তও ছিল না। কত কলেরা রোগীকে পথ হইতে তুলিয়া গৃহে আনিয়া স্বহস্তেই তাহাদের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়াছেন। মানব-মাত্রেই তাঁহার সেবার ও সাহায্যের অধিকারী ছিল।

ব্যক্তিগত দান ও সাহায্য ছাড়াও দুর্ভিক্ষের ন্যায় ব্যাপক আপৎপাতে ও ম্যালেরিয়ার ন্যায় দারুণ মহামারীতে বিদ্যাসাগর একাই সহস্র নর-নারীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য সিংহবিক্রমে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন, জলের মতন অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, পরিণামের কথা চিন্তা করেন নাই। তাঁহার ঋণ হইবে না তো ঋণ হইবে কাহার?

২. তিনি সর্বসময়ে প্রায় একশত ছাত্রকে প্রতিপালন করিতেন। তাহাদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন, স্কুল-কলেজের বেতন দিতেন, এমনকী পাঠ্যপুস্তকও সরবরাহ করিতেন।

স্বগ্রামে ও অন্যান্য স্থানে নিম্ন, মধ্য, উচ্চ, ইংরাজি, সংস্কৃত, বালক ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ, শিক্ষকদিগের বেতন, স্কুলের আসবাবপত্র, পুস্তক ইত্যাদি বাবদে প্রতি মাসে তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইত। মাত্র মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজের ভবনের জন্য তাঁহার প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় তিনি নিজেই বহন করিতেন।

৩. যে বিধবা-বিবাহ তিনি স্বয়ং দিতেন তাহার সমুদয় ব্যয়ই তাঁহাকে বহন করিতে হইত। শুধু বিবাহ-রাত্রেরই খরচ নহে, কন্যার অলংকার, যৌতুক, গৃহসজ্জা, নিমন্ত্রিতদের ভোজন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় তাঁহাকে একাই বহন করিতে হইত। এইখানেই শেষ নহে। বিধবা বিবাহ যাহারা করিত তাহারা সমাজের ত্যাজ্য হইত। সুতরাং দম্পতিকে এমনকী এক পক্ষ গতায়ু হইলে অপর পক্ষকে, যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিতে হইত। আমরা দেখিয়াছি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬৭ সন পর্যন্ত মাত্র এই ১১ বৎসরে ৬০টি বিধবা-বিবাহ দিতে তাঁহার ৮২,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার পর তিনি আরো ২৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই ২৪ বৎসরে এই বাবদে আরো কত যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার কোনো হিসাব নাই।

অনুমান, তিনি দরিদ্র-সেবায়, শিক্ষা-বিস্তারে, বিধবা-বিবাহে, সর্ববিধ মানবকল্যাণ সাধনে মোট ১০ হইতে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

এইসব কারণে তাঁহার ঋণ হইত। সেইজন্য তাঁহার উইলে তিনি নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার যাবতীয় ঋণ শোধ না-হওয়া পর্যন্ত কেহই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। তিনি যাঁহাদিগকে ঋণ দিতেন তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহাকে প্রতারণা করিত এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাক, তাঁহাকে নিন্দা করিত ও গালি দিত। তাই বিদ্যাসাগরের এই কথাটি বাংলা দেশে প্রবাদবাক্যের মতো চলিয়া আসিতেছে — 'আমি তো তাহার কোনো উপকার করি নাই, সে আমার নিন্দা করিবে কেন?' এইরূপে ক্রমাগত প্রতারিত হইতে হইতে এবং বহু বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা ও মেরুদণ্ডহীনতা দেখিয়া দেখিয়া তিনি শেষজীবনে তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা করিতে, তাঁহদের সঙ্গ পরিহার করিতে এবং তথাকথিত অসভ্য ও অশিক্ষিত সাঁওতালদিগকে তাহাদের সরলতা, অকপটতা ও সত্যবাদিতার জন্য আন্তরিক ভালোবাসিতে শিখিয়াছিলেন। তাই তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে পলাইয়া গিয়া কর্মাটাঁড়ে এইসব অরণ্য-প্রকৃতির সন্তানদের মধ্যে বাস করিতে ভালোবাসিতেন। তাহারা তাঁহাকে একেবারে আপনজন মনে করিত। তিনিও তাহাদের আপন পুত্র-কন্যা ও ভ্রাতা-ভগিনীর মতো জ্ঞান করিতেন।

বিদ্যাসাগরের সম্মানলাভ

১. কবি মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা করিয়া ২৬. ২. ১৮৬২ তারিখে বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন।

২. বিদ্যাসাগর ৪. ৭. ১৮৬৪ তারিখে বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানীয় সদস্য নির্বাচিত হন।

৩. ওড়িশা ও দক্ষিণবঙ্গে অর্থাৎ হুগলি, মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলায় ১৮৬৬ সনের এপ্রিল হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। বিদ্যাসাগর এই সময়ে অকাতরে অর্থ ব্যয় ও অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া বীরসিংহ ও অন্যান্য গ্রামে অন্নসত্র খুলিয়া হাজার হাজার নর-নারীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত সেইসব নর-নারী বিদ্যাসাগরকে 'দয়ার সাগর' উপাধি দিয়াছিল। দরিদ্র পল্লীবাসী জনসাধারণের নিকট হইতে এইরূপ সম্মান অন্য কোনো বঙ্গসন্তান এযাবৎ লাভ করেন নাই।

৪. নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ২৮. ৫. ১৮৭২ তারিখে 'দ্বাদশ কবিতা' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন।

৫. কবি নবীনচন্দ্র সেন 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্য লিখিয়া ১৩.৪.১৮৭৫ তারিখে বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন।

৬. দিল্লির দরবার উপলক্ষে ১. ১. ১৮৭৭ তারিখে ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নামে ও গভর্নর জেনারেলের আদেশে বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল বিদ্যাসাগরকে বিধবা-বিবাহ-পক্ষাবলম্বীদলের নেতা ও হিন্দু সমাজের অগ্রগামী দলের পরিচালক হিসাবে এক প্রশংসাপত্র দান করেন।

৭. ভারত সরকার ১. ১. ১৮৮০ তারিখে তাঁহাকে সি. আই. ই. (কম্প্যানিয়ন অব দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার) উপাধি দান করেন।

৮. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৮৮৩ সনে ফেলো মনোনীত করেন।

৯. ভারত সরকার ১৮৮৭ সনের জানুয়ারি মাসে তাঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর অসুস্থতার অজুহাতে সেই প্রস্তাবিত সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন।

১০. বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও অধ্যাপক বা পণ্ডিতরূপে কোথাও বিদায় গ্রহণ করিতেন না। ১৮৫৪ সনে প্রথমবার বর্ধমানভ্রমণে গমন করিলে বিদ্যাসাগর বর্ধমানাধীশ মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধে রাজবাটীতে পদার্পণ করিলে মহারাজ তাঁহার সম্মানার্থে একজোড়া শাল ও ৫০০ টাকা বিদায় দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মাতৃভক্ত জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৯ সনের নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটি রৌপ্যনির্মিত জলপানের পাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদাই করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন :

পানপাত্রমিদং দত্তং বিদ্যাসাগরশর্মণে।
স্বর্গকামনায় মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধয়া॥

মাতৃভক্ত পুত্রের এই দান মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর প্রত্যাখ্যান করেন নাই, গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আগমন

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম হয় তদানীন্তন হুগলি জেলার, বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার, বীরসিংহ গ্রামে ২৬. ৯. ১৮২০ তারিখে। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতা ঠাকুরদাস তাঁহাকে কলিকাতায় আনেন ১৮২৮ সনের নভেম্বর মাসে। তখন তাঁহার বয়স ৮ বৎসর ২ মাস। তদবধি তিনি প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কলিকাতায় বাস করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বগ্রাম বীরসিংহে গিয়াছেন। হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া ও মেদিনীপুর এই চারি জিলায় তিনি বালকদিগের জন্য আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় ও বালিকাদিগের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিদর্শন জন্য ১. ৫. ১৮৫৫ হইতে ২. ১১. ১৮৫৮ পর্যন্ত সাড়ে তিন বৎসর সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে ওই জেলাগুলিতে গমন করিয়াছেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দুই-একবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছেন ও ওই উদ্দেশ্যে সাঁওতাল পরগনার কর্মটাঁড়ে গিয়া মাঝে মাঝে নির্জন বাস করিয়াছেন। পিতা-মাতার কাশী বাসকালে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দর্শন কিংবা সেবা-শুশ্রূষার জন্য কাশী গিয়াছেন। কিন্তু যে-উপলক্ষে যেখানেই গিয়া থাকুন না কেন, দীর্ঘদিন কলিকাতার বাহিরে থাকেন নাই। আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১৮৬৯ সনে এক বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের আচরণে মর্মাহত হইয়া প্রিয় জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম চিরতরে ত্যাগ করেন। কলিকাতাই তাঁহার প্রধান কর্মস্থল ছিল। কলিকাতাতেই তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল।

কলিকাতায় বিদ্যাসাগরের বাসস্থান

১. সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় বিদ্যাসাগর পিতা ঠাকুরদাস ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত উত্তররাঢ়ী কায়স্থ জমিদার জগদ্দুর্লভ সিংহের বড়বাজার ১৩ দয়েহাটা স্ট্রিটের (বর্তমান নাম দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড) বাটীতে থাকিতেন।

২. পরে পিতা সে-বাটী পরিত্যাগ করিয়া বহুবাজারে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর বিপরীত (দক্ষিণ) দিকে ১৫ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে আনন্দচন্দ্র সেনের বাড়িতে প্রায় তিন বৎসর বাস করেন। বিদ্যাসাগর ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও সেখানে থাকিতেন।

৩. পরে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহির্বাটীর (৫৪ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি) দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া পিতা-পুত্রে বাস করেন। কিছুকাল পরে সমগ্র বহির্বাটী মাসিক ৮ টাকা ভাড়ায় লইয়াছিলেন। এইখানেই হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়।

৪. সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইবার পর বিদ্যাসাগর কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের একতলার একটি ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের সম্মুখে কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া কুস্তির আখড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রতিদিন কুস্তি করিতেন। কোনো লজ্জা-সংকোচ ছিল না।

৫. তাহার পর বর্তমান কলেজ স্ট্রিট বাজারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি একতলা বাড়িতে থাকিতেন। সে বাড়ি এখন নাই। তখনও বহুবাজারের বাসাবাড়ি ছিল। সেখানে ভাইয়েরা, আত্মীয়, কুটুম্ব ও কলিকাতায় আগত গ্রামের লোকেরা থাকিত।

৬. তাহার পর মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের একটি একতলা বাড়ি ভাড়া করিয়া কিছুকাল ছিলেন। এ বাড়িটি শনাক্ত করিতে পারা যায় নাই। তখনও বহুবাজারের বাসাবাড়ি ছিল।

৭. তাহার যকৃতের বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ওই বাসা ত্যাগ করিয়া কিছুকাল রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে ছিলেন। সেখানে রাজকৃষ্ণবাবুর পরিবারের সকলেই তাঁহার সেবা করিত। তখনও বহুবাজারের বাসাবাড়ি ছিল।

৮. তাহার পর ৬৩ আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি ভাড়া করিয়া কিছুকাল বাস করেন।

৯. ১৮৭১ সনের মে-জুন মাস হইতে কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে কাশীপুরের গঙ্গাতীরে বাবু হীরালাল শীলের এক বাংলোবাড়িতে মাসিক ১৫০ টাকা ভাড়া দিয়া কিছুকাল বাস করেন।

১০. অবশেষে ১৮৭৬ সনে বাদুড়বাগানে ২৫ বৃন্দাবন মল্লিক লেনে (বর্তমান ৩৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রিটে) একটি দ্বিতল বাড়ি নির্মাণ করেন। গৃহপ্রবেশ করেন ১৮৭৭ সনের জানুয়ারি মাসে।

বিদ্যাসাগরের নিজস্ব বাটী নির্মাণ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, ফার্সি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ১৬০০০ পুস্তকের তাঁহার একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি ওই পুস্তকগুলিকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া সেগুলিকে বাঁধাইয়াছিলেন। উত্তমরূপে বই বাঁধানো বিদ্যাসাগরের একটিমাত্র বিলাস ছিল। ওই পুস্তকগুলিকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রধানত তাঁহাকে নিজস্ব বাটী নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। এই বাটীতে বিদ্যাসাগর জীবনের অবশিষ্ট ১৪ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং এই বাটীতেই দেহত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন

উপর্যুপরি কতকগুলি বিপৎপাতে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখময় ও বেদনাপূর্ণ হইয়াছিল। বিপদগুলি এই :

১. ১৮৬৬ সালের এপ্রিল হইতে জুন মাস ব্যাপী দক্ষিণবঙ্গে করাল দুর্ভিক্ষ হয়। হাজার হাজার নর-নারীকে তিনি একদিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন। এ-দৃশ্য তাঁহাকে নিশ্চয়ই মুহ্যমান করিয়াছিল।

২. কুমারী মেরি কার্পেন্টারের সঙ্গে ১৪. ১২. ১৮৬৬ তারিখে উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার পথে গাড়ি উল্টাইয়া গিয়া তাঁহার যকৃতে গুরুতর আঘাত লাগে। সেই আঘাতেই তাঁহার পরিপাকশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য চিরতরে ভঙ্গ হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

৩. ১৮৬৯ সনে বর্ধমান ও হুগলি জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রথম আবির্ভাব হয়। তখন এই জ্বরকে 'বর্ধমান জ্বর' বলা হইত। তিনি বর্ধমানে থাকিয়া গভর্নমেন্টকে দিয়া নানা স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করাইয়া ও নিজে বহু রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যত লোক

বাঁচিয়াছে তাহার হাজার গুণ মরিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছে। এই ভয়াবহ দৃশ্য বিদ্যাসাগরের বুকে নিশ্চয়ই শেলসম বাজিয়াছিল।

৪. ১৮৬৯ সালের জুন-জুলাই মাসে বীরসিংহ গ্রামে এক বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরগণের আচরণে তাঁহার মনে এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে তিনি সেই হইতেই জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর একদিনও তিনি সে-গ্রামে পদার্পণ করেন নাই; ইহার জন্য তিনি যে অবশিষ্ট জীবনে কত দুঃখ পাইয়াছিলেন বলিবার নহে।

৫. মাতা ভগবতী দেবীর ১২. ৪. ১৮৭১ তারিখে মৃত্যু।

৬. প্রাণাধিক প্রিয় জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতির ৪. ২. ১৮৭৩ তারিখে মৃত্যু ও তজ্জন্য প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার বিবাহের মাত্র ৬ বৎসরের মধ্যে দুইটি শিশুপুত্র লইয়া অকাল বৈধব্য।

৭. একমাত্র পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৭৪ সনে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ ও তাঁহাকে বাটী হইতে বিতাড়ন।

৮. ৩১. ৫. ১৮৭৫ তারিখে স্বাক্ষরিত উইলে গৃহ-বিতাড়িত পুত্রকে মাসিক বৃত্তি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিতকরণ।

৯. পিতা ঠাকুরদাসের মৃত্যু ১২. ৪. ১৮৭৬ তারিখে।

১০. পত্নী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু ২৩. ৮. ১৮৮৩ তারিখে।

১১. তৃতীয় জামাতা ও মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ সূর্যকুমার অধিকারীকে ১৮৮৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যক্ষপদ হইতে অপসারণ।

মহাপ্রয়াণ

অবশেষে ১২৯৮ সালের ১৩ শ্রাবণ ইংরাজি ১৮৯১ সনের ২৯ জুলাই রাত্রি ২ টা ১৮ মিনিটের সময় বাদুড়বাগানের গৃহে এই মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেইদিনই নিমতলার শ্মশানঘাটে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। চিকিৎসকগণ সন্দেহ করেন তাঁহার যকৃতে ক্যানসার হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর ১০ মাস ৩ দিন।

বিদ্যাসাগরের কয়েকটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

১. বিদ্যাসাগর সামান্য তোতলা ছিলেন। লোকে সহজে ধরিতে পারিত না।

২. মাথার সামনের দিকের খানিকটা ওড়িয়াদের মতো কামাইতেন।

৩. থান ধুতি, মোটা চাদর ও তালতলার শুঁড়-তোলা চটি পরিতেন। সেই পোশাকে সর্বত্র যাইতেন, লাটভবন পর্যন্ত।

৪. ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও তক্তপোশে বা ফরাসে তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিতেন না। সর্বদাই চেয়ারে বসিতেন। চৈতন্যদেব যেমন 'বহিঃ রাধা, অন্তঃ কৃষ্ণ' ছিলেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি বাহিরে বাঙালি ব্রাহ্মণ কিন্তু অন্তরে খাঁটি ইউরোপিয়ান ছিলেন।

৫. আপন মাকে শেষদিন পর্যন্ত 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ছাত্রদেরও 'তুই' বলিতেন। সেইসব ছাত্র প্রৌঢ়-বয়স্ক ও কৃতবিদ্য হইলেও তাহাদের পূর্বের ন্যায় 'তুই' বলিয়া ডাকিতেন, তুমি বলিতেন না।

৬. পিতামাতার প্রতি তাঁহার ভক্তি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন।

৭. অত্যন্ত রসিক ও মজলিশি পুরুষ ছিলেন। হাসি-ঠাট্টায় ও সরস কথাবার্তায় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসর জমাইয়া রাখিতে পারিতেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতেন। সময় কোথা দিয়া বহিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিতেন না।

৮. যে বিদ্যাসাগর লেখায় সাধু-ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না, সেই বিদ্যাসাগরই কিন্তু কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না, সংস্কৃতের ধার দিয়াও যাইতেন না, এমনকী বাংলা অশিষ্ট শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

৯. হাঁটিবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কলিকাতা হইতে বীরসিংহ গ্রাম ৪০ মাইল পথ তিনি অনায়াসে পদব্রজে — নগ্নপদে কিংবা চটিজুতা পায়ে দিয়া — যাতায়াত করিতেন। ১৮৪৫ সনে কলিকাতা হইতে কালনা ৬০ মাইল পথ একদিনে হাঁটিয়া গিয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতির নিকট হইতে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক পদের জন্য দরখাস্ত লইয়া পরদিনই কলিকাতায় পদব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। একবার উদরের পীড়া দারুণ আকার ধারণ করিলে চিকিৎসকগণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে সকাল-সন্ধ্যা হাঁটিতে উপদেশ দেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কতক্ষণ হাঁটিব?' ডাক্তারেরা বলেন, 'যতক্ষণ না আপনি ক্লান্ত হন।' তাহাতে তিনি বলেন, 'সমস্ত দিন ও রাত্র হাঁটিলেও আমার ক্লান্তি আসিবে না।'

১০. অনেকদূরে যাইতে হইলে গো-শকট বা ঘোড়ার গাড়ি চড়িতে চাহিতেন না। পাল্কিই পছন্দ করিতেন। পথে পীড়িত বা চলিতে অক্ষম লোক দেখিলে তাহাকে পাল্কিতে চড়াইয়া নিজে পাল্কির পাশে পাশে হাঁটিয়া যাইতেন।

১১. হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতির গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে বাংলা দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্তক বহুবাজার দত্ত বংশের বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ডাক্তার বেরিনির নিকট হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা শিক্ষা করেন। তাঁহারই কথাতে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও দারুণ গোঁড়া অ্যালোপাথি চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার রাজেন্দ্র দত্তের নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া চিরতরে অ্যালোপ্যাথি ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হন। বিদ্যাসাগরেরই অনুপ্রেরণায় লোকনাথ মৈত্র, ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী, ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগরের অন্তিম পীড়ায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সালজার চিকিৎসা

করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রথম প্রথম থ্যাকার স্পিংক কোম্পানি মারফত বিদেশ হইতে প্রতি মাসে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথি পুস্তক আনাইতেন, শেষে ডাক্তার লালবিহারী মিত্রের ডিসপেন্সারি হইতে ক্রয় করিতেন। সেগুলি ভালো করিয়া পড়িয়া রোগীদের নিজেই চিকিৎসা করিতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। রোগীদের বিনা পয়সায় ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার গ্রন্থাগারে হোমিওপ্যাথি পুস্তকের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ ছিল। বিদ্যাসাগরের ন্যায় বঙ্গে আরোও দুইজন সাহিত্যরথী — বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথির ভক্ত ছিলেন। তাঁহারাও হোমিওপ্যাথি মতে রোগীদের চিকিৎসা করিতেন।

১২. বিদ্যাসাগর অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। প্রভূত ধনশালী রাজা মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রতম ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এখানে কয়েকটি মাত্র নাম উল্লিখিত হইল: কালীকৃষ্ণ মিত্র, ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জজ দ্বারকানাথ মিত্র, জজ রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ দে, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, কালীচরণ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, দুর্গামোহন দাস, দীনবন্ধু মিত্র, ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর, কৃষ্ণদাস পাল, মাইকেল মধুসূদন, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ সিংহ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিদ্যাসাগরের অনুরাগী ও ভক্তের সংখ্যা অগণিত। তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি নাম উল্লিখিত হইতেছে: পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী, মহারানী স্বর্ণময়ী, রানী কাত্যায়নী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদনের প্রধান কর্মচারী কৈলাসচন্দ্র বসু, কবি নবীনচন্দ্র সেন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, সুবলচন্দ্র মিত্র, আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, অমৃতলাল বসু, ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র। বাংলা দেশের অধিকাংশ রাজা ও জমিদার বিদ্যাসাগরের কথায় উঠিত বসিত। ভারতবর্ষে এমন শিক্ষিত লোক খুব কমই আছেন যাঁহারা বিদ্যাসাগরের নাম শুনেন নাই বা তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন না।

অপরপক্ষে বেশ কয়েকজন ব্যক্তির সহিত বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। আবার এমন কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন যাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার মনোভাব প্রসন্ন ছিল না, যথা, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অপরের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর

১. বিদেশির দৃষ্টিতে

একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান, সি. ই. বাকল্যান্ড বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

> He combined a fearless independence of character with great gentleness and the simplicity of a child in his dealing with the people of all classes.

২. স্বদেশবাসীর দৃষ্টিতে

বাঙালি কবি মধুসূদন তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

He has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.

৩. একজন একালের সাধারণ বাঙালির দৃষ্টিতে :

যদি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারা যায় অর্থাৎ আধুনিক যুগের চরম সভ্য মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি, যুক্তিপ্রবণতা ও উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে যদি আদিম যুগের অসভ্য মানুষের কর্মশক্তি, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সরলতা, সত্যবাদিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, পরোপকারবৃত্তি এবং নারীর প্রতি শ্রদ্ধা যুক্ত করিতে পারা যায়, একমাত্র তাহা হইলেই বিদ্যাসাগরের মতো চরিত্র সৃষ্ট হইতে পারে। এ চরিত্র শুধু মহান নয়, অনন্য, একক এবং অসম্ভব বলিয়াই মর্মান্তিক করুণ ও বেদনাঘন। বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও বিবেক বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাপঞ্জি

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য লেখকের বিদ্যাসাগর-জীবনী হইতে সংকলিত)

নভেম্বর, ১৮২৮	পিতার সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থে স্বগ্রাম বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আগমন।
১. ৬. ১৮২৯	কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ।
২২. ৪. ১৮৩৯	হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দান।
১৬. ৫. ১৮৩৯	হিন্দু-ল কমিটির নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ।
৪. ১২. ১৮৪১	সংস্কৃত কলেজে ১২ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের নিকট হইতে দুইখানি প্রশংসাপত্র লাভ। তাহার পূর্বেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ।
২৯. ১২. ১৮৪১- ৩. ৪. ১৮৪৬	মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে ৩. সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের কার্য।
১৬. ৮. ১৮৪৩	মাসিক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ। প্রথমাবধিই ওই পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্বাচনী কমিটির সভ্য।
৬. ৮. ১৮৪৬	মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত।
১৮৪৭	মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারি প্রতিষ্ঠা।
১৬. ৭. ১৮৪৭	সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে ইস্তফা দান।
১. ৩. ১৮৪৯	মাসিক ৮০ বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কেরানি ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ।
আগস্ট, ১৮৫০	'সর্ব্বশুভঙ্করী পত্রিকা' প্রকাশিত। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাল্য-বিবাহে দোষ কি' এই শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮৫০	মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত সম্পর্ক ছেদ।
৪. ১২. ১৮৫০	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কেরানির ও কোষাধ্যক্ষের পদে কার্য।
৫. ১২. ১৮৫০	মাসিক ৯০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিয়োগ।
১৬. ১২. ১৮৫০	সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা পরিষদকে দান।
ডিসেম্বর, ১৮৫০	বীটন বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত।
৫. ১. ১৮৫১	সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ও কলেজের অস্থায়ী সম্পাদক।
২২. ১. ১৮৫১	মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ। এই সময় হইতে কলেজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ লুপ্ত।
৯. ৭. ১৮৫১	ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়াও কায়স্থ সন্তানকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান।
নভেম্বর, ১৮৫১	সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়া স্বরচিত 'বাংলা সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র প্রচলন।
ডিসেম্বর, ১৮৫১	জাতি নির্বিশেষে সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তান মাত্রকেই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান।
১৩. ১. ১৮৫২	সংস্কৃত কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্য গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন। আবেদন সফল।
২৮. ৮. ১৮৫২	সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রগণের দুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণা দিবার রীতি প্রচলন।
নভেম্বর, ১৮৫৩	সংস্কৃত কলেজের ইংরাজি বিভাগের পুনর্গঠন। ইংরাজিকে ঐচ্ছিক বিষয় না-রাখিয়া অবশ্যপাঠ্য বিষয়করণ।
জানুয়ারি ১৮৫৪	বোর্ড অব এগজামিনার্সের সদস্য। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের মাসিক বেতন ৩০০ টাকা ধার্য।
জুন, ১৮৫৪	সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিকট হইতে মাসিক ১ টাকা বেতন গ্রহণের নিয়ম প্রচলন।
জানুয়ারি, ১৮৫৫	বিশ্ববিদ্যালয়-গঠন কমিটির সদস্য।
১. ৫. ১৮৫৫	সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের সঙ্গে অতিরিক্ত মাসিক ২০০ টাকা বেতনে দক্ষিণবঙ্গের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগ।
১৭. ৭. ১৮৫৫	সংস্কৃত কলেজে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও অক্ষয়কুমার দত্তকে তাহার প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ।
৪. ১০. ১৮৫৫	বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র প্রেরণ।
২৭. ১২. ১৮৫৫	বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট প্রথম আবেদনপত্র প্রেরণ।
১৬. ৭. ১৮৫৬	বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ।
নভেম্বর, ১৮৫৬	দক্ষিণবঙ্গের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর স্থলে দক্ষিণবঙ্গের স্পেশাল স্কুল ইনস্পেক্টর — পদের এই নূতন নামকরণ।

৭. ১২. ১৮৫৬	কলিকাতার বর্তমান ৪৯ সুকিয়া স্ট্রিট ভবনে প্রথম বিধবা-বিবাহ।
২৪. ১. ১৮৫৭	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রথমাবধিই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত।
সেপ্টেম্বর ১৮৫৭— ১৩. ১২. ১৮৬০	সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈন্য বিভাগ আহত সৈনিকদিগের হাসপাতাল করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজ ভবন দখল করিয়া লইলে কলেজ ৯২ ও ১১০ ও নর্মাল স্কুল ১৩১ বহুবাজার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত ও অবস্থিত।
২২. ৩. ১৮৫৮	বড়বাজারের গদাধর শেঠের বাটিতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় দর্শন।
৩১. ৭. ১৮৫৮	বেলগাছিয়া নাট্যশালায় বাংলা 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দর্শন।
৩. ১১. ১৮৫৮	সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ।
১৫. ১১. ১৮৫৮	সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশ।
১৫৫৮	'তত্ত্ববোধিনী' সভার সম্পাদক।
১৮৫৯	প্রতিষ্ঠাতাদের আহ্বানে শঙ্কর ঘোষ লেনের ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের পরিচালনায় অংশগ্রহণ ও স্কুলের সম্পাদক নির্বাচিত।
২৩. ৪. ১৮৫৯	রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটির বাটিতে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয় দর্শন।
মে, ১৮৫৯	'তত্ত্ববোধিনী সভা' ব্রাহ্মসমাজের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়ায় সম্পাদকের পদত্যাগ।
এপ্রিল, ১৮৬১	ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের পরিচালক কমিটির মধ্যে বিভেদ। নূতন কমিটি গঠন। ঐ কমিটির সম্পাদক।
ডিসেম্বর, ১৮৬১	'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার পরিচালন-ভার গ্রহণ।
জানুয়ারি, ১৮৬২	মাইকেল মধুসূদনকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনার ভার দান।
মে, ১৮৬২	কৃষ্ণদাস পালকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক পদে নিয়োগ।
নভেম্বর, ১৮৬৩	গভর্নমেন্ট কর্তৃক ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত।
১৮৬৪	কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল নামের পরিবর্তে কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন নামকরণ।
জুন, ১৮৬৪	ফ্রান্সের ভের্সাই নগর হইতে বিপন্ন মাইকেলের সাহায্যের জন্য আবেদন।
৪. ৭. ১৮৬৪	বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মাননীয় সদস্য নির্বাচিত।
২. ৮. ১৮৬৪	মধুসূদনকে ফ্রান্সে ১৫০০ টাকা প্রেরণ।
১৮৬৫-৭৩	মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়'-এর কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য।
১১. ১. ১৮৬৫	ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শকরূপে গভর্নমেন্টকে প্রথম রিপোর্ট দান।
১. ৯. ১৮৬৫	ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন সম্বন্ধে দ্বিতীয় রিপোর্ট দান।
১৮৬৫	ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক পদ ত্যাগ।
১. ৫. ১৮৬৬	বহুবিবাহ রহিত করিবার জন্য দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র প্রেরণ।

১৮৬৬	দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর নিকট হইতে 'দয়ার সাগর' উপাধি লাভ।
১৬. ১২. ১৮৬৬	কুমারী মেরি কার্পেন্টারের সহিত উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে ফিরিবার পথে গাড়ি উল্টাইয়া যাইবার ফলে যকৃতে গুরুতর আঘাত।
জুলাই, ১৮৬৭	জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ।
২৬. ৭. ১৮৬৭	সাময়িকপত্রে বিধবা-বিবাহজনিত তাঁহার ঋণ মোচনের আবেদন প্রকাশিত হইলে পরের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে অস্বীকার।
জানুয়ারি, ১৮৬৯	বীটন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদত্যাগ।
১৮৬৯	ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারি দান।
জানুয়ারি, ১৮৭০	ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার জন্য ১০০০ টাকা দান।
১১. ৮. ১৮৭০	পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিধবার বিবাহ।
১২.৪.১৮৭১	মাতৃদেবীর মৃত্যু।
সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর, ১৮৭১	তারানাথ তর্কবাচস্পতির সহিত সম্পর্ক ছেদ।
২৫. ১. ১৮৭২	জজ দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল ও নিজেকে লইয়া মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের নূতন পরিচালক কমিটি গঠন।
১৮৭২	মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত।
২৮. ৫. ১৮৭২	দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক 'দ্বাদশ কবিতা' উৎসর্গ।
১৫. ৬. ১৮৭২	হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইয়িটি ফান্ড (হিন্দু পরিবার বৃত্তি ভাণ্ডার) গঠন।
জুন-জুলাই, ১৮৭২	দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনী দেবীর বিবাহ।
৪. ২. ১৮৭৩	জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু।
১৬. ৮. ১৮৭৩	'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর উদ্বোধন ও বেশ্যা লইয়া স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়। ফলে ঐ থিয়েটারের কার্যনির্বাহক কমিটি হইতে পদত্যাগ (?)।
২৮. ১. ১৮৭৪	এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম পরিদর্শন করিতে যাইয়া দরোওয়ান চটিজুতা পরিয়া ভিতরে যাইতে নিষেধ করিলে চিরতরে মিউজিয়াম বর্জন।
১৮৭৪	প্রথম এফ.এ. পরীক্ষায় মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বার বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার।
	মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের শ্যামপুকুর শাখার প্রতিষ্ঠা।
১৮৭৪	পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গৃহ হইতে বিতাড়ন ও তাহার সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ।
১৩. ৪. ১৮৭৫	নবীনচন্দ্র সেন কর্তৃক 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ।
৩১. ৫. ১৮৭৫	উইলে স্বাক্ষর। পুত্র মাসিক বৃত্তি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত।
১৩. ৭. ১৮৭৫	তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ।
১৮৭৬	কলিকাতা বাদুড়বাগানে নিজ বাসভবন নির্মাণ।
ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬	তৃতীয় জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীকে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের সম্পাদক ও মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ।

২১. ২. ১৮৭৬	হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইয়িটি ফান্ডের সহিত সম্পর্ক ছেদ।
১২. ৪. ১৮৭৬	পিতৃদেবের মৃত্যু।
১. ১. ১৮৭৭	দিল্লির দরবারে ভারত গভর্নমেন্টের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ।
জানুয়ারি, ১৮৭৭	বাদুড়বাগানের গৃহে প্রবেশ।
এপ্রিল, ১৮৭৭	কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর বিবাহ।
১৮৭৯	মেট্রোপলিটন প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত।
১. ১. ১৮৮০	সি. আই. ই. উপাধি লাভ।
১৮৮৩	পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত।
১৮৮৪	মেট্রোপলিটন কলেজে আইন শ্রেণী প্রবর্তন। কলেজের ছাত্র সংখ্যা—৫০০।
১৮৮৫	মেট্রোপলিটন কলেজে বি. এ. অনার্স অর্থাৎ এম. এ. শ্রেণী প্রবর্তন। শঙ্কর ঘোষের লেনে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও কলেজের জন্য ভূমি ক্রয়।
	মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের বউবাজার শাখা প্রতিষ্ঠা।
জানুয়ারি, ১৮৮৬	সুকিয়া স্ট্রিটে 'দি ক্যালকাটা লাইব্রেরি' নামে পুস্তকের দোকান প্রতিষ্ঠা।
জানুয়ারি, ১৮৮৭	মেট্রোপলিটন কলেজের শঙ্কর ঘোষের লেনের নিজ ভবনে প্রবেশ। কিছু পরে স্কুলেরও নিজ ভবনে প্রবেশ।
১৮৮৮	মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রসংখ্যা — ৮৩৭।
১৩. ৮. ১৮৮৮	পত্নী দীনময়ীর মৃত্যু।
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮	জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীকে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অপসারণ।
নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর ১৮৮৯	জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার নিকট হইতে রৌপ্যনির্মিত জলপানপাত্র গ্রহণ।
২৯. ৭. ১৮৯১	বাদুড়বাগানের গৃহে রাত ২টা ১৮ মি. পরলোকগমন।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলি

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের' জীবনী হইতে গৃহীত)

ক. রচিত ও সংকলিত :

১. ১৮৪৭ : বেতাল পঞ্চবিংশতি
২. ১৮৪৮ : বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ
৩. ১৮৪৯, সেপ্টেম্বর : জীবনচরিত
৪. ১৮৫১ এপ্রিল, বোধোদয় (শিশুশিক্ষা ৪র্থ ভাগ)

৫. —, নভেম্বর : সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা
৬. —, নভেম্বর : ঋজুপাঠ, প্রথম ভাগ
৭. ১৮৫২, মার্চ : ঋজুপাঠ, দ্বিতীয়
৮. —, ডিসেম্বর : ঋজুপাঠ, তৃতীয়
৯. ১৮৫৩, মার্চ : সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য -শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব
১০. — : ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ
১১. — : ব্যাকরণ কৌমুদী, ২য় ভাগ
১২. ১৮৫৪ : ব্যাকরণ কৌমুদী, ৩য় ভাগ
১৩. —, ডিসেম্বর : শকুন্তলা
১৪. ১৮৫৫, জানুয়ারি : বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব
১৫. —, এপ্রিল : বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ
১৬. —, জুন : বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ
১৭. —, অকটোবর : বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ২য় পুস্তক
১৮. ১৮৫৬, ফেব্রুয়ারি : কথামালা
১৯. —, জুলাই : চরিতাবলী
২০. — : Marriage of Hindu Widows ('বিধবা বিবাহ' পুস্তক দুইখানির অনুবাদ)
২১. ১৮৬০, জানুয়ারি : মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ)
২২. —, এপ্রিল : সীতার বনবাস
২৩. ১৮৬২ : ব্যাকরণ কৌমুদী, ৪র্থ ভাগ
২৪. ১৮৬৩, নভেম্বর : আখ্যানমঞ্জরী
২৫. ১৮৬৪ : শব্দমঞ্জরী (বাঙ্গালা অভিধান)
২৬. ১৮৬৮, ফেব্রুয়ারি : আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ভাগ
২৭. ১৮৬৯, ডিসেম্বর : ভ্রান্তিবিলাস (শেক্সপীয়রের *Comedy of Errors* অবলম্বনে)
২৮. ১৮৭১, আগস্ট : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার
২৯. ১৮৭৩, এপ্রিল : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার, ২য় পুস্তক
৩০. ১৮৮৮, এপ্রিল : নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস
৩১. —, জুলাই : পদ্যসংগ্রহ, ১ম ভাগ
৩২. ১৮৯০ : পদ্যসংগ্রহ, ২য় ভাগ
৩৩. ১৮৮৯, নভেম্বর : সংস্কৃত রচনা
৩৪. —, মে : শ্লোকমঞ্জরী, উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ
৩৫. ১৮৯১, সেপ্টেম্বর : বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)
৩৬. ১৮৯২, এপ্রিল : ভূগোল খগোলবর্ণনম্

খ. বেনামী রচনা :

১. ১৮৭৩, মে : অতি অল্প হইল, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য

২. —, সেপ্টেম্বর : আবার অতি অল্প হইল, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য
৩. ১৮৪৪, নভেম্বর : ব্রজবিলাস, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য
৪. —, নভেম্বর : বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা, কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার নাম হয় 'বিনয় পত্রিকা'।
৫. ১৮৮৬, আগস্ট : রত্নপরীক্ষা, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য

গ. সম্পাদিত
১. ১৮৭৪ : অন্নদামঙ্গল, ১ম ও ২য় ভাগ
২. ১৮৫২, জানুয়ারি : বৈতাল পচ্চীসী (বেতালপঞ্চবিংশতির হিন্দি)
৩. ১৮৫৩, জুন : রঘুবংশম
৪. — : কিরীতার্জুনীয়ম্
৫. ১৮৫৩-৫৮ : সর্বদর্শনসংগ্রহঃ
৬. ১৮৫৭ : শিশুপালবধম্
৭. ১৮৬১ : কুমারসম্ভবম্
৮. ১৮৬২ : কাদম্বরী
৯. ১৮৬৯, এপ্রিল : মেঘদূতম্
১০. ১৮৭০, নভেম্বর : উত্তরচরিতম্
১১. ১৮৭১, জুন : অভিজ্ঞানশকুন্তলম্
১২. ১৮৮৩, মার্চ : হর্ষচরিতম্

বংশলতিকা

ভুবনেশ্বর-রামজয়-ঠাকুরদাস

---
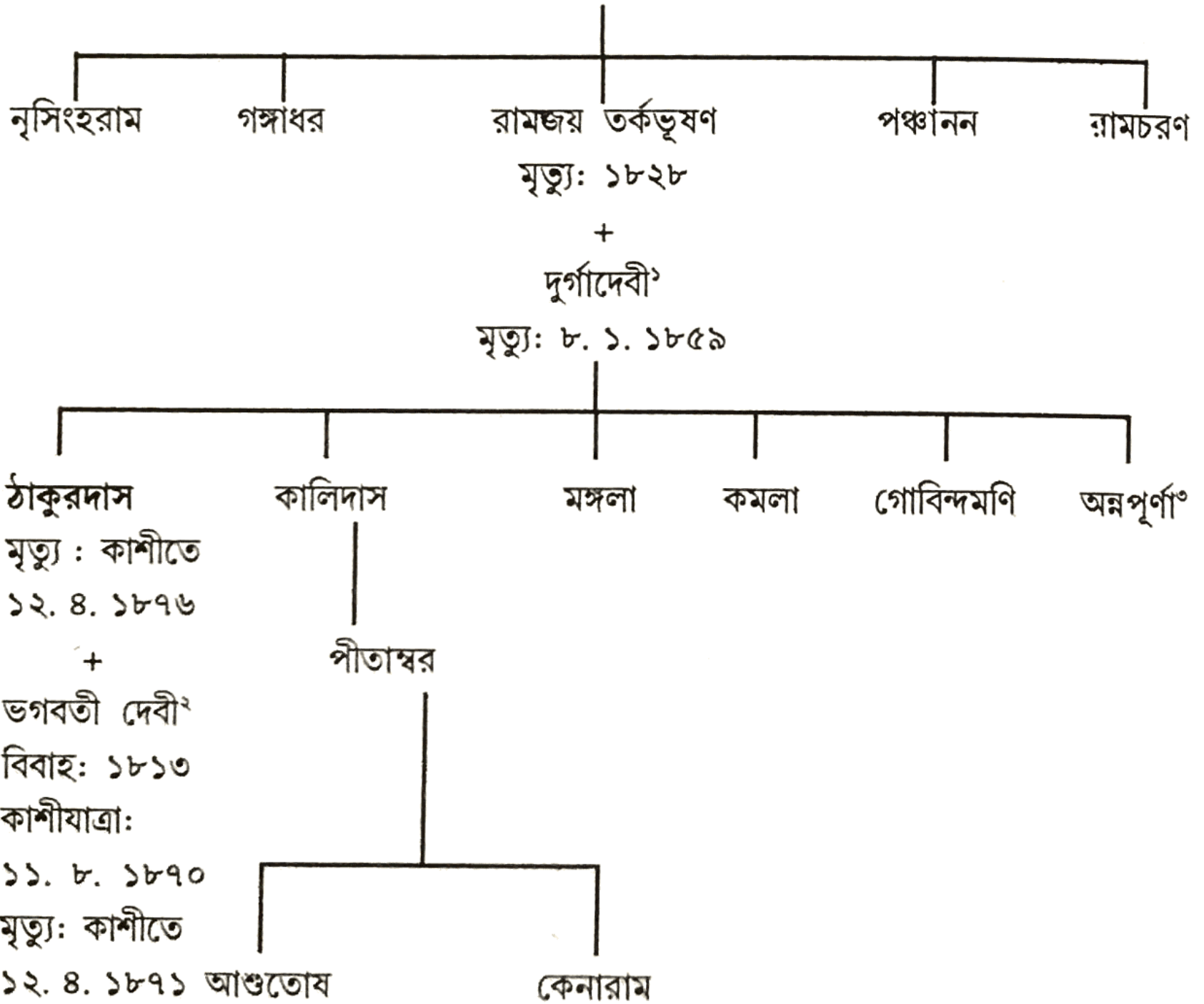
১. উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের কনিষ্ঠা বা পঞ্চম কন্যা, রামসুন্দর ভট্টাচার্যের ভগিনী।

২. আরামবাগ মহকুমার পাতুল গ্রামের পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের দৌহিত্রী ও গোঘাট গ্রামের রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।

৩. তারকেশ্বরের নিকটবর্তী রামনগর গ্রামের রামতারক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়।

বংশলতিকা
ঠাকুরদাস

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় + ভগবতী দেবী

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম: ২৬. ৯. ১৮২০; বীরসিংহ গ্রামে, তদানীন্তন হুগলি জেলা, বর্তমান মেদিনীপুর। মৃত্যু: ২৯. ৭. ১৮৯১, কলিকাতা। বিবাহ: আনুমানিক ১৮৩৪-এ।

+ দীনময়ী দেবী[১]

জন্ম: ১৫. ১১. ১৮২৯ — মৃত্যু : ১৬. ৮. ১৮৮৮, কলিকাতা

| পুত্র গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
| মূর্খ ও মাতাল

২. দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন[২]

মৃত্যু : আ. ১৮৮৮

৩. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন[৩]

জন্ম: আনু. ১৮২৮ — মৃত্যু: আনু. ১৯০৮।

৪. হরচন্দ্র (আনু. ১২ বৎসরে মৃত্যু)।

৫. হরিশচন্দ্র (আনু. ৮ বৎসরে মৃত্যু)।

৬. ঈশানচন্দ্র + এলোকেশী দেবী।

৭. শিবচন্দ্র (ডাকনাম ভূতো, শৈশবে মৃত্যু)।

৮. মনোমোহিনী দেবী।

৯. দিগম্বরী দেবী।

১০. মন্দাকিনী দেবী।

---

১. ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য ও তারাসুন্দরী দেবীর কন্যা।

২. সংস্কৃত কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বিহারের স্কুল-ইনস্পেক্টর। রচনা: পদ্যমঞ্জরী (১৮৬৭), অক্ষরপরিচয় (১৮৭৫)।

৩. বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুগত ভ্রাতা। শিক্ষা শেষ (সংস্কৃত কলেজ) ১৮৪৯। রচনা: বিদ্যাসাগর-চরিত (সেপ্টেম্বর, ১৮৯১), চরিতমালা ১ম ভাগ (১৮৯৩), তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত (১৮৯৩), চরিতমালা ২য় ভাগ (১৮৯৪), ভ্রমনিরাস (১৮৯৫)। তিন পুত্রের দুইজন পিতার জীবদ্দশায় মারা যান। কলিকাতার বাস : ২ নবাবদি ওস্তাগর লেন।

বংশলতিকা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর + দীনময়ী দেবী

১. নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন
   জন্ম: ১৪. ১১. ১৮৪৯ - মৃত্যু: মার্চ, ১৯২৩
   বিবাহ: ১১. ৮. ১৮৭০
   +ভবসুন্দরী দেবী[১]

২. হেমলতা দেবী
   বিবাহ: জুলাই ১৮৬৭ মৃত্যু: আনু. ১৯৩৪/৩৫।
   +গোপালচন্দ্র সমাজপতি[২]
   মৃত্যু: ৪. ২. ১৮৭৩, কাশীতে কলেরায়।

৩. কুমুদিনী দেবী
   মৃত্যু: আনু. ১৯৩৪/৩৫, বিবাহ: জুন/জুলাই ১৮৭২।
   +অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়[৩]

৪. বিনোদিনী দেবী
   মৃত্যু: ১৯১৮, বিবাহ: ১৩.৭.১৮৭৫।
   +সূর্যকুমার অধিকারী[৪]
   জন্ম: ১৮৫৬, মৃত্যু: ১৯২৬

৫. শরৎকুমারী দেবী
   মৃত্যু: আনু. ১৯৩৪/৩৫, বিবাহ: এপ্রিল/মে ১৮৭৭
   + কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১. খানাকুল কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সারদা দেবীর বিধবা কন্যা। ভবসুন্দরী দেবীর প্রথম বিবাহ হয় এই গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে।

২. নদীয়া জেলার আইসমালী গ্রামনিবাসী। মাতা — স্বর্ণময়ী দেবী, ভগিনী — ক্ষেত্রমণি দেবী।

৩. চব্বিশ পরগনা জেলার রুদ্রপুর গ্রামনিবাসী। পুরুলিয়ার সাব-রেজিস্ট্রার।

৪. ফরিদপুরনিবাসী। হেয়ার স্কুলের শিক্ষক (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬), মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৮)।

বংশলতিকা
বিদ্যাসাগরের মাতৃবংশ
পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ
[খানাকুল-কৃষ্ণনগরের পশ্চিমস্থিত পাতুল গ্রামনিবাসী]
রাধামোহন বিদ্যাভূষণ
রামধন তর্কবাগীশ
গুরুপ্রসাদ শিরোমণি
গঙ্গামণি দেবী + সিদ্ধতান্ত্রিক রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় (গোঘাট নিবাসী)
তারাসুন্দরী দেবী
লক্ষ্মীমণি দেবী + সর্বেশ্বর বন্দ্যো.
ভগবতী দেবী + ঠাকুরদাস বন্দ্যো.
বংশলতিকা
বিদ্যাসাগর-সন্তান
১। নারায়ণ বিদ্যারত্ন + ভবসুন্দরী দেবী
ক গোপাল বন্দ্যো. অল্পবয়সে মৃত্যু
খ মৃণালিনী + গোপাল মুখো.
সরোজ মুখো. + আরতি দেবী
গ কুন্দমালা + মোহিনীমোহন ঘোষাল
ঘ মতিমালা মৃত্যু: ১৯৩৯ + যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ডে. ম্যাজিস্ট্রেট মৃত্যু: ১৯৩৮
ঙ প্যারীমোহন বন্দ্যো. অবিবাহিত মৃত্যু: আনু. ৫৪ বৎসর বয়সে ১৯৩৩
২। হেমলতা দেবী + গোপালচন্দ্র সমাজপতি
সুরেশচন্দ্র [সম্পাদক: সাহিত্য] ১৮৬৯-১৯২১ + নলিনী দেবী/রানী [ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা] নিঃসন্তান
যতীন্দ্রনাথ ওরফে যতীশচন্দ্র (অবিবাহিত)
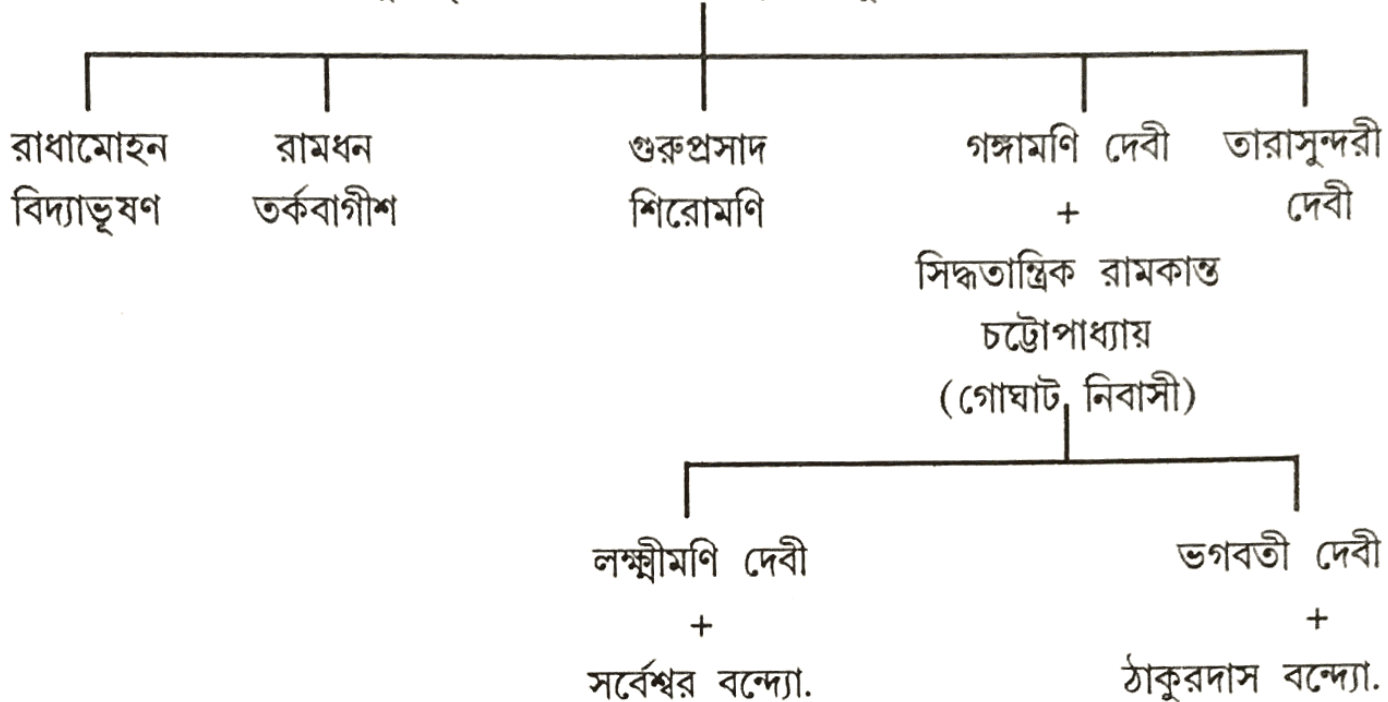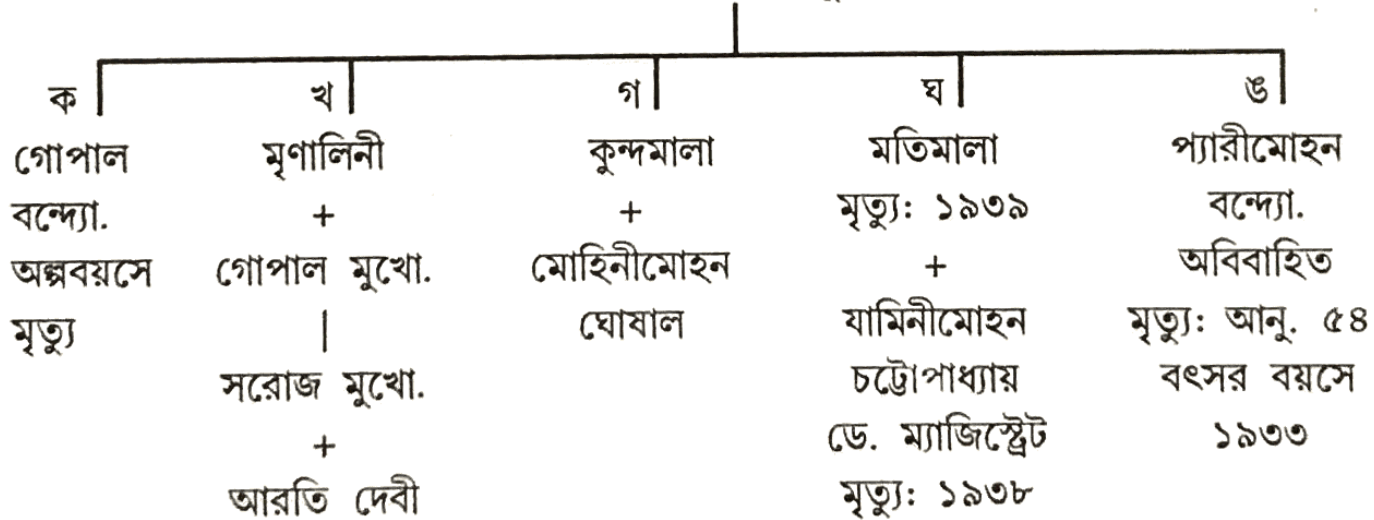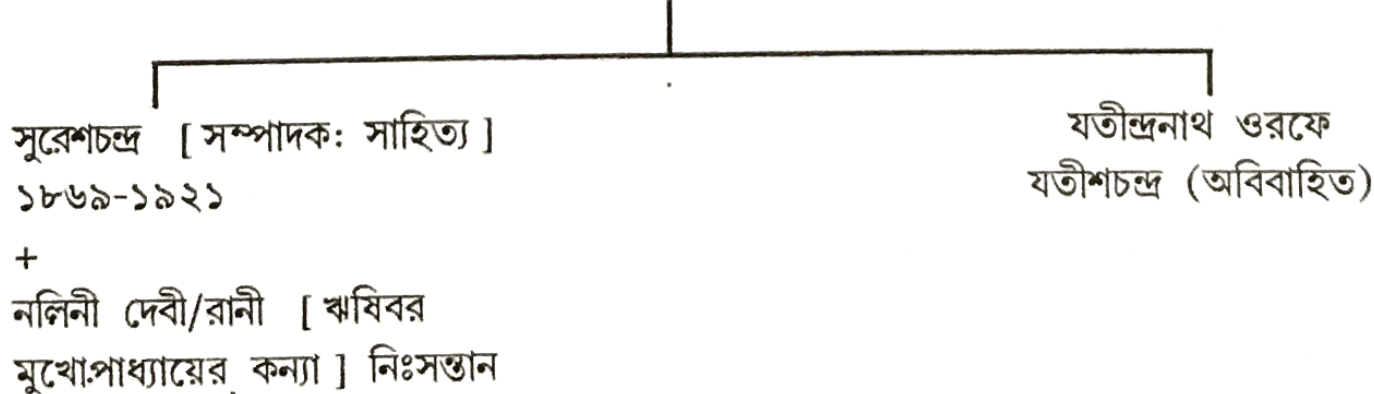
বংশলতিকা

বিদ্যাসাগরের সন্তান

৩। * কুমুদিনী দেবী + অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
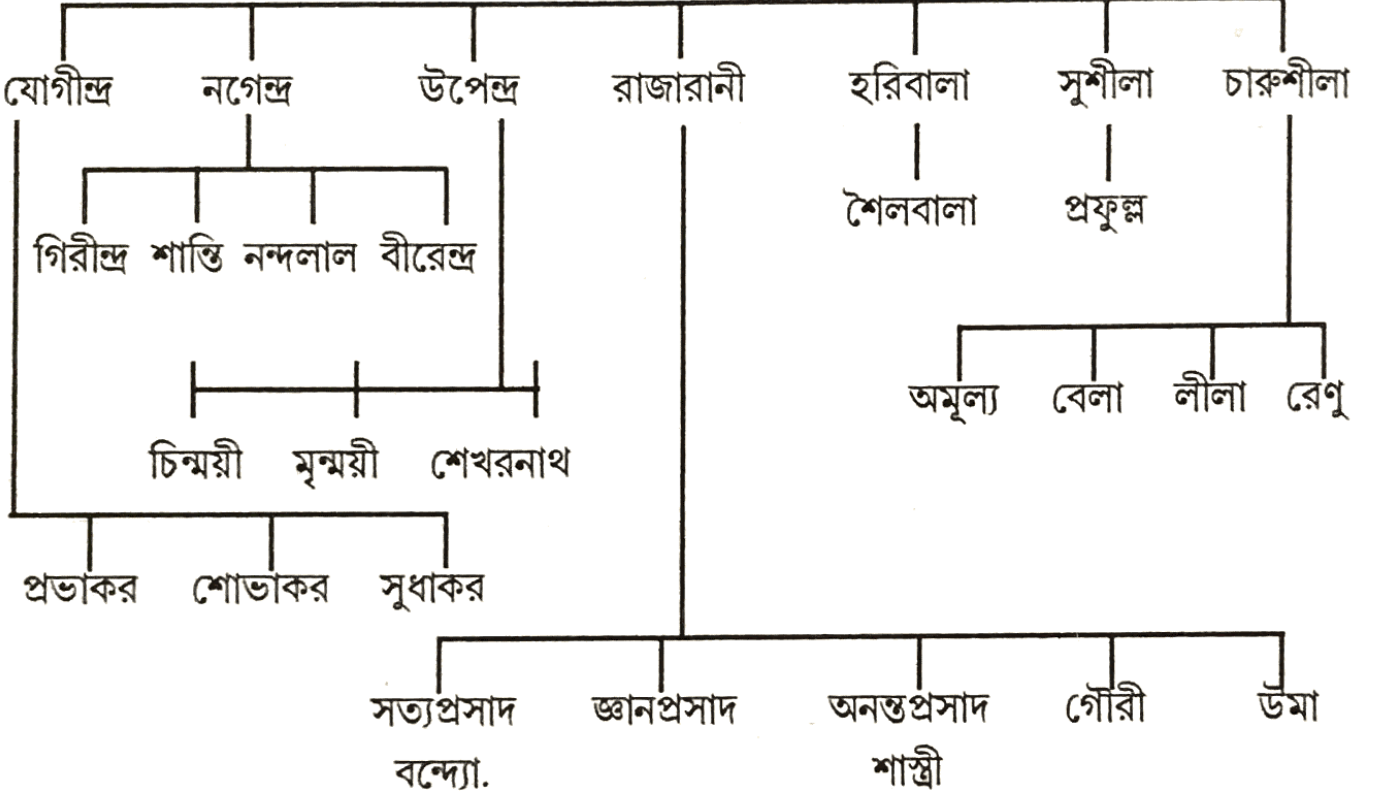
৪। বিনোদিনী দেবী + সূর্যকুমার অধিকারী
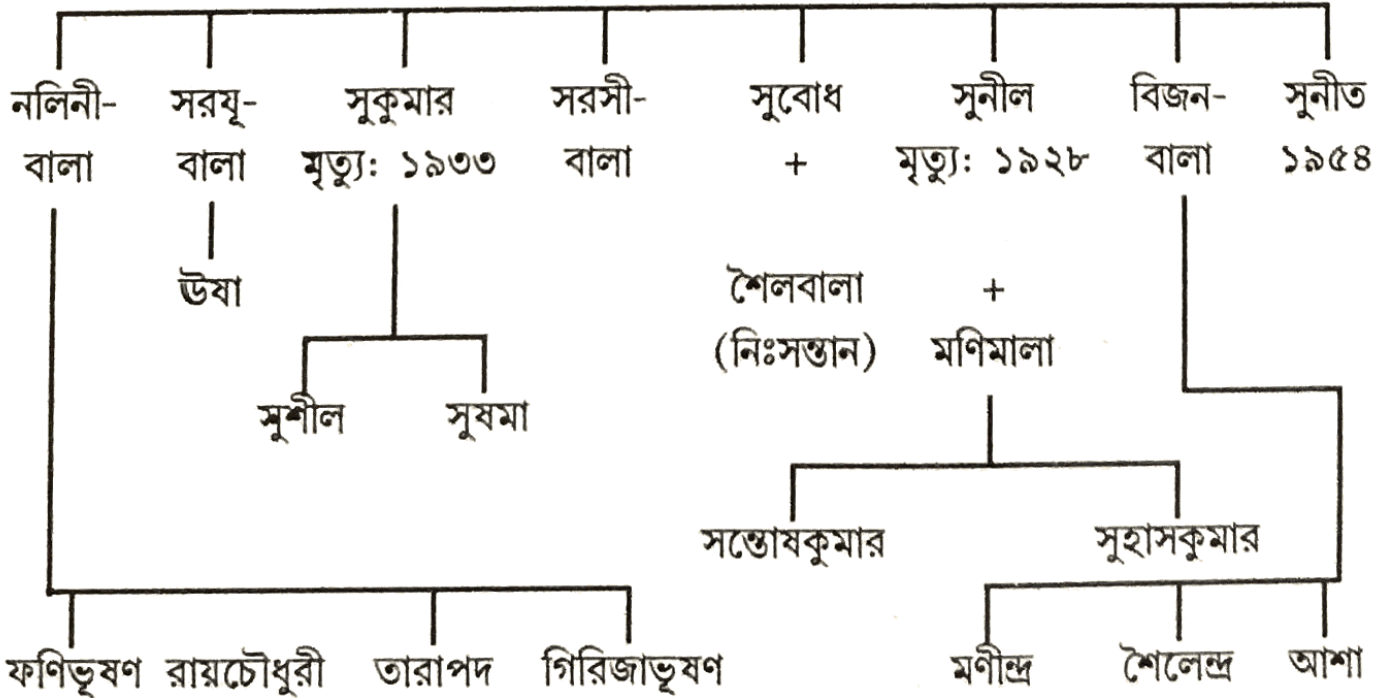
* বিদ্যাসাগরের তৃতীয় কন্যা কুমুদিনী দেবী ও চতুর্থ কন্যা বিনোদিনী দেবীর বংশলতা শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারীর বিদ্যাসাগর পুস্তক হইতে গৃহীত।

৫। শরৎকুমার দেবী[১] + কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হরিমোহন — রামকমল (গুজে)

বংশলতিকা

নারায়ণ বিদ্যারত্ন

ক। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

খ। মৃণালিনী + গোপাল মুখোপাধ্যায়

গ। কুন্দমালা দেবী + মোহিনীমোহন ঘোষাল

প্রফুল্লকমল ঘোষাল

হাসিদেবী + ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নীহার/নীহারিকা দেবী + বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভোলা)
- আরতি
  জন্ম: ১৫. ১০. ১৯১৫
  বিবাহ: আগস্ট, ১৯৩২
  + রজনী মুখার্জি (শ্রমিকনেতা)
- ভারতী
- সুনীল মুখোপাধ্যায়

রাইকিশোরী দেবী (রাইমণি) + মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
- পুত্র অল্পবয়সে মৃত্যু

ঘ। মতিমালা দেবী + যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম: ১৬. ১২. ১৮৯৮: মৃত্যু : ৩১.৫.১৯৬৩

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব এডুকেশন অফিসার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক

\+

মঞ্জুশ্রী দেবী — জন্ম: মার্চ, ১৯০৭

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা)

অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় + ১. ৺জয়া দেবী ; ২. মঞ্জু দেবী

অধ্যাপক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় + আরতি দেবী

* ১. শরৎকুমারী দেবীর বিবাহ হয় ১৮৭৭ এপ্রিল/মে মাসে; মৃত্যু: আনুমানিক ১৯৩৪/৩৫।

বংশতালিকা

ভাগবতচরণ সিংহ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে পিতার সহিত ১৩ দয়েহাটা, বড়বাজার (বর্তমান ১৩ এ-বি-সি দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড) নিবাসী উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ জমিদার ভাগবতচরণ সিংহের বংশতালিকা।
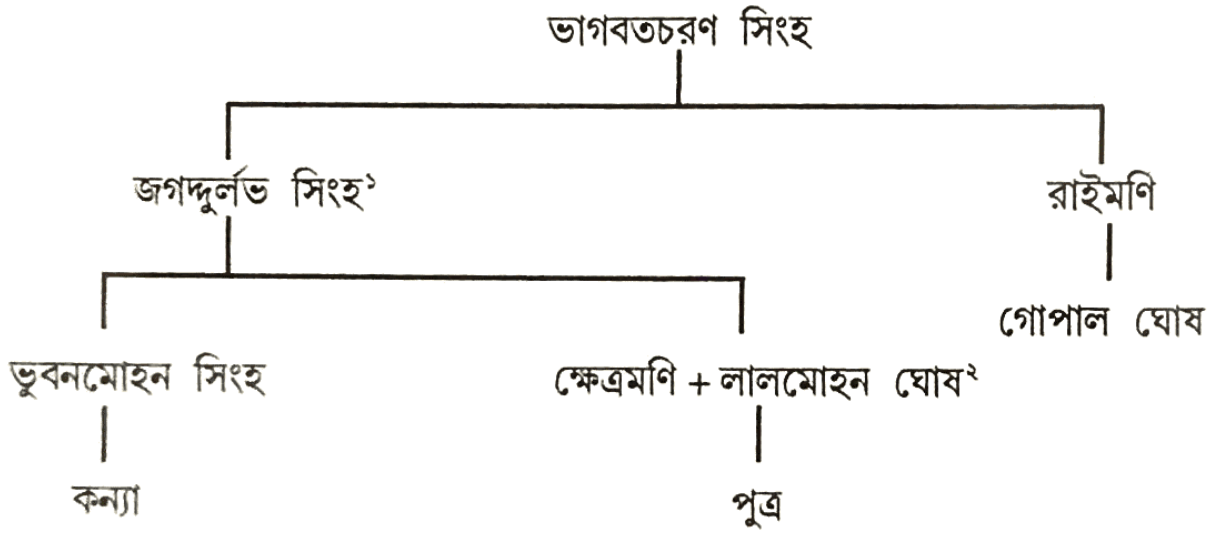
১. ভ্রমক্রমে চোরাই কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হন এবং কিছুকালের জন্য তাঁর বাড়ি পুলিশদ্বারা বেষ্টিত থাকে। মোকদ্দমায় অনেক ঋণগ্রস্ত হন।

২. কান্দী পাইকপাড়ায় রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ভাগিনেয়।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বংশ-পূর্বপুরুষ-জন্মতারিখ

জাতীয়তাবাদের যাঁরা ইতিহাস জানেন তাঁরা জানেন যে, কোনো জাতির উদ্বোধনের পক্ষে একটা বড় শক্তি তার অতীত ইতিহাসের প্রেরণা। আমাদের জাতীয়তাবোধের বেলাও আমাদের অতীত কীর্তিকথা, পুরাবৃত্তের জ্ঞান, ভারত ইতিহাসের পুনরাবিষ্কার, এরূপ শক্তি সঞ্চার করেছে। এদিক থেকে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার প্রবর্তক।

মাত্র ৫৪ বৎসর আগে তিনি মারা যান, কিন্তু তার আগেই পৃথিবীর প্রাচ্যবিদ্যা মহারথীরা তাঁকে একবাক্যে প্রধান পুরাতাত্ত্বিক বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের একালের প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণায় রাজেন্দ্রলাল প্রথম ও প্রধান গুরু।

শুঁড়ার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে রাজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন : পুরুষানুক্রমে তাঁরা ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও পদস্থ।

কলকাতার উপকণ্ঠে শুঁড়ার এই মিত্র বংশকে বড়িশা বা কোন্নগরের মিত্র বংশও বলে। কোন্নগর শাখাই কালক্রমে কলকাতার গোবিন্দপুরে এসে বাস করে ও পরে উঠে মেছুয়াবাজারে যায়, শেষে মেছুয়াবাজার ছেড়ে শুঁড়ার বাগানবাড়িতে বাস করতে থাকে। এখনও রাজেন্দ্রলালের বংশধরেরা এই বাড়িতেই বাস করছেন।

রাজেন্দ্রলালের পূর্বপুরষ রামরাম মিত্র ও তাঁর পুত্র অযোধ্যারাম মিত্র মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান ছিলেন। অযোধ্যারাম মিত্র নবাব সরকার থেকে রায় (রাজা?) বাহাদুর উপাধি পান। তাঁর পৌত্র পীতাম্বর মিত্র দিল্লি দরবারে অযোধ্যার নবাব-উজিরের উকিল ছিলেন। দিল্লির বাদশাহ তাঁকে ৩০০০ (মতান্তরে ৩০০) সৈন্যের মনসবদারি, দোয়াবের অন্তর্গত কোড়া প্রদেশ জায়গির ও রাজাবাহাদুর খেতাব দেন। কাশীর রাজা চৈত সিংহের বিদ্রোহের সময় যখন রামনগর দুর্গ জয় হয় তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লুটের মধ্যে কতকগুলি ফারসি ও সংস্কৃত পুঁথি পান। এই পুঁথিগুলি ও অযোধ্যার নবাবের কাছে বাকি পাওনা ৯ লক্ষ টাকা নিয়ে তিনি ১৭৮৭ সালে কলকাতায় ফেরেন। এখানে এসে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন ও নিরিবিলিতে ধর্মচর্চা করার জন্য মেছুয়াবাজারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শুঁড়ার বাগানবাড়িতে এসে বাস করতে থাকেন। তিনি কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন। ১৮০৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। পীতাম্বর মিত্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র মিতব্যয়ী ছিলেন না ; তাঁর সময়ে অনেক পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়।

মেছুয়াবাজারের বাড়ি বিক্রি হয়। কোড়া জায়গির ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় হস্তান্তরিত হয়। শেষ বয়সে তিনি কটকের কালেক্টরের দেওয়ান হন। তাঁর পুত্র জন্মেঞ্জয় মিত্র সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন এবং নিজের ও পিতামহের পদগুলি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'সঙ্গীত রসার্ণব' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ ছাড়াও তিনি দুখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ড. শুলব্রেড নামে একজন বিদেশি পণ্ডিতের কাছে ইনি রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এর পূর্বে কোনো বাঙালির রসায়ন শাস্ত্র পড়বার কথা জানা যায় না।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র জন্মেঞ্জয় মিত্রের তৃতীয় পুত্র। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে গণ্ডগোল আছে। 'বিশ্বকোষ' ইত্যাদি গ্রন্থে ১৮২৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আছে, কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রাজেন্দ্রলালের নিজের হাতে লেখা একটি নোটবই আছে। তাতে তিনি যে-তারিখ দিয়েছেন সে-অনুসারে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮২২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। এই নোটবইয়ে তিনি জীবনের প্রথম ১৯ বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাও লিপিবদ্ধ করেছেন। তা থেকে জানা যায়:

১. ১৮২৭ সালে ৫ বছর বয়সে তিনি বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন ;
২. ১৮২৯ সালে শ্রীদ্বারকানাথ নন্দীর কাছে ইংরেজি পড়তে আরম্ভ করেন ;
৩. ১৮৩১ সালে পাথুরিয়াঘাটার শ্রীক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন ;
৪. ১৮৩৩ সালে ওই স্কুল ত্যাগ করেন ;
৫. ১৮৩৪ সালে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে ভর্তি হন ;
৬. ১৮৩৬ সালে ওই স্কুল ত্যাগ করেন ও প্লীহাদি রোগে ভোগেন ;
৭. ১৮৩৭ সালের ৩ ডিসেম্বর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন ;
৮. ১৮৪১ সালের ১২ মে কলেজের প্রধান সাহেবদের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় তিনি কলেজ ত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল

তাঁর কলেজ ত্যাগ সম্বন্ধে কোথাও কোথাও অন্য-একটি কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেত যাবার সময় রাজেন্দ্রলালকে নিজের খরচায় বিলেতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারি পড়াবার প্রস্তাব করেন। তাতে রাজেন্দ্রর পিতা এত চটে যান যে, তিনি কলেজ থেকে ছেলের নাম কাটিয়ে নেন। রাজেন্দ্রলালের নিজের লেখা নোট থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এই কাহিনী অমূলক। তবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব সত্য হতেও পারে।

মেডিক্যাল কলেজের তিনি একজন ভালো ছাত্র ছিলেন। ব্র্যাশলি, গুডিভ, ও'শনেসি প্রমুখ ডাক্তাররা তাঁর অধ্যাপক ছিলেন। এই সময় তিনি বাড়িতে ক্যামেরন নামে এক সাহেবের কাছে ইংরেজি পড়তেন।

আইনশাস্ত্রের ছাত্র, বিবাহ

ডাক্তারি ছেড়ে রাজেন্দ্রলাল আইন পড়তে গেলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি কৃতকার্য হতে পারলেন না — নিজের দোষে নয়; ঘটনাচক্রে। এই ব্যাপারও দুটি বিবরণ আছে। একটির মতে তিনি আইনের পরীক্ষায় পাশ করে সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করবার কিংবা মুন্সেফি চাকরি নেবার অনুমতি পান। কিন্তু তিনি কোনোটি পছন্দ না-করে জজ হতে চান। জজিয়তির জন্য পরীক্ষাও দেন কিন্তু পরীক্ষাপত্র হারিয়ে যাওয়ায় তাঁর জজ হওয়া হল না। দ্বিতীয় বিবরণ অনুসারে তিনি আইন পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু উত্তরপত্র হারিয়ে যাওয়াতে পাশ করতে পারেন নি। দ্বিতীয় বিবরণটিই সত্যি বলে মনে হয়।

যাই হোক, তাঁর আইনজীবন এখানেই শেষ হল। কিন্তু তাই বলে তাঁর ডাক্তারি পড়া বা আইন পড়া একেবারে পণ্ড হয় নি। কারণ এই দুটি বিদ্যার অনুশীলন তাঁর মনকে গবেষণার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত হতে সাহায্য করেছিল।

রাজেন্দ্রলাল দু'বার বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ হয় ১৮৩৯ সালে ১৭ বৎসর বয়সে নিমতলার দত্ত বংশের শ্রীধর্মদাস দত্তর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনীর সঙ্গে। বিবাহের পাঁচ বছর পরে ১৮৪৪ সালের ৩০ আগস্ট একটিমাত্র কন্যা রেখে তাঁর স্ত্রী মারা যান। মাতৃবিয়োগের আড়াই মাস পরে কন্যাটিও মারা যায়। ১৬ বছর পরে ১৮৬০ সালে ৩৮ বছর বয়সে তিনি ভবানীপুরের কালীধন সরকারের জ্যেষ্ঠকন্যা ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে রাজেন্দ্রলালের দুই পুত্র হয় — রামেন্দ্রলাল ও মহেন্দ্রলাল।

ভাষাচর্চা

আইন পড়া ছেড়ে রাজেন্দ্রলাল প্রায় তিন বছর ভাষাচর্চায় মন দেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সবসুদ্ধ ১১টি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন; যথা, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত, ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া ও বাংলা। এতগুলি ভাষার ওপর দখল থাকাতে তাঁর গবেষণার কাজ অনেক সুগম হয়েছিল।

মেডিক্যাল কলেজে তাঁর অধ্যাপক ছিলেন স্যার উইলিয়াম ব্রুক ও'শনেসি। তিনি আবার বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারিও ছিলেন। তাঁরই পরামর্শমতো ১৮৪৬ সালে ৫ নভেম্বর মাসিক ১০০ টাকা বেতনে রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই থেকেই তাঁর চাকরিজীবন শুরু হয়, তাঁর ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণারও গোড়াপত্তন হয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজ করেন প্রায় ১০ বছর। ১৮৫৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এই কাজে ইস্তফা দিয়ে মার্চ মাসে মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ পদ স্বীকার করেন। জমিদারদের ৮ থেকে ১৪ বছরের নাবালক ছেলেদের এক জায়গায় রেখে শিক্ষা দেওয়া ছিল এই ইনস্টিটিউশনের উদ্দেশ্য। ২৪ বছর পরে ১৮৮০ সালে ইনস্টিটিউশনটি উঠে গেলে মাসিক ৫০০ টাকা বিশেষ পেনশনে রাজেন্দ্রলাল অবসর গ্রহণ করেন। মোট তিনি ৩৪ বছর চাকরি করেছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি
ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে গবেষণা রাজা উপাধি

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকেই রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রেরণা পান। সমস্ত জীবন তিনি এই কাজে নিয়োগ করেন। চাকরি ত্যাগের পরেও এই সমিতির সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁর কোনোদিন ঘোচেনি। তিনি সমিতির জার্নালে ও কার্য-বিবররণীতে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ১৮৪৮ সালে জানুয়ারি সংখ্যার জার্নালে প্রকাশিত হয়। তারপর খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশি-বিদেশি বহু সাময়িক পত্রিকায়, যথা: *Journal of the Photographic Society of Bengal, The Calcutta Review, Mookerjee's Magazine, Transactions of the Anthropological Society of London* ইত্যাদিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। *Englishman, Daily News, Statesman, Phoenix, Citizen, Friend of India, Indian Field, Hindu Patriot* প্রভৃতি এ দেশীয় সংবাদপত্রেও তাঁর লেখা বহু সমালোচনা, পত্র ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপা হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন, সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত পুস্তক, মানচিত্র ও পাণ্ডুলিপির তালিকা, পুরাতন জার্নালের বিষয়সূচি ও শতবার্ষিকী ইতিহাস ইংরেজিতে রচনা করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন দেশি গ্রন্থাগারে যেসব হাতে লেখা সংস্কৃত পুঁথি আছে তার তালিকা প্রস্তুত করেন ও এইসব পুঁথি উদ্ধার ও রক্ষাকল্পে কী কী প্রচেষ্টা হয়েছে তারও একটি রিপোর্ট লেখেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য তিনি যত পরিশ্রম করেছেন দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের মধ্যে আর ততখানি কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। এশিয়াটিক সোসাইটিও তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সহ-সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাধারণ সদস্য ও চার মাস পরে জুন মাসে কাউন্সিলের সদস্য ; ১৮৫৭ সালে সম্পাদক ; ১৮৬১ সালে সহ-সভাপতি ও ১৮৮৫ সালে সভাপতি নির্বাচিত করে। এই শেষ সম্মানটিকেই তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান বলে মনে করতেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের ও গবেষণার খ্যাতি বাংলা বা ভারতের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ রইল না। সমুদ্র পার হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছল। সেখানকার শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদরা ক্রমশ তাঁর সঙ্গে পত্র ব্যবহার শুরু করলেন ও শেষ পর্যন্ত অনেকেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। যাঁরা তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার, গার্সিন ডি ট্যাসি, ফুসে, মেয়ার ডেয়ার, ওয়েবার, বোথলিঙ্ক, গোল্ডস্মিড্‌ট, এগলিং, জন মিউয়ের, কাউয়েল, এডওয়ার্ড টমাস, ড. হুইটলি, ডয়সেন, ড. রব, ব্রিঁয়া হজ্‌সন, ড. বর্নুফ ও ড. কিলহর্ন-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিদেশে তাঁর পাণ্ডিত্যের সমাদর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অনেক বিজ্ঞান-সভা ও সমিতি তাঁকে সাদরে সদস্যপদে বরণ করে। যেসব প্রতিষ্ঠানের তিনি সভ্য (Honorary Member, Corresponding Member or Fellow) ছিলেন তাদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া হল:

১. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland ;
২. Imperial Academy of Sciences, Vienna ;
৩. Italian Institute for the Advancement of Knowledge ;

৪. Asiatic Society of Italy ;
৫. German Oriental Society ;
৬. American Oriental Society ;
৭. Anthropological Society of Berlin ;
৮. Royal Academy of Sciences, Hungary ;
৯. Royal Society of Northern Antiquities, Copenhagen।

তাছাড়া রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখারও তিনি সভ্য ছিলেন। ফ্রান্সের জাতীয়-শিক্ষা বিভাগ তাঁকে Plam-leaf ও Diploma দিয়ে সম্মানিত করে। স্বদেশেও যে তিনি সম্মান পাননি তা নয়। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৮৭৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে L. L. D. উপাধি, ১৮৭৭ সালে গভর্নমেন্ট রায়বাহাদুর, ১৮৭৮ সালে C. I. E. ও ১৮৮৮ সালে (কোথাও কোথাও ১৮৮৪ আছে) 'রাজা' উপাধি দেন। তিনি জমিদার রাজা ছিলেন না, পণ্ডিত রাজা ছিলেন।

মাতৃভাষা : ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি
সারস্বত সমাজ বিবিধার্থ সংগ্রহ রহস্য সন্দর্ভ

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিশেষত বিজ্ঞান, প্রচারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইংরেজি ভাষার সাহায্যে এই জ্ঞানপ্রসার সম্ভব নয়, তা তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর দৃঢ় মত ছিল যে, মাতৃভাষার মাধ্যম ভিন্ন জগতের জ্ঞানসম্পদকে দেশের আপামর সাধারণের সম্পত্তি করতে পারা যাবে না। এইজন্য তিনি বাংলা ভাষার পরম সমর্থক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। অজ্ঞ দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ছিল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ব্রত। তাই পুরাতাত্ত্বিকের পরেই রাজেন্দ্রলালের অন্য পরিচয় শিক্ষক রূপে। বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাবিস্তার যেসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল তিনি সবগুলির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির তিনি বহু বৎসর সভাপতি ছিলেন, ১৮১৫ সালে স্থাপিত ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি বা বাংলা সাহিত্য সমিতিরও তিনি সভ্য ছিলেন। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল।

১৮৮২ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে কলকাতার 'সারস্বত সমাজ' স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সমাজের সম্পাদক, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সভ্য, বঙ্কিমচন্দ্র সহযোগী সভাপতি ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি হন। বাংলায় পরিভাষা বেঁধে দেওয়া এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রস্তুত করার আবশ্যকতা রাজেন্দ্রলাল ইতিপূর্বেই বুঝেছিলেন ও ১৮৭৭ সালে ইংরেজিতে একটি পরিকল্পনাও প্রকাশ করেছিলেন। সারস্বত সমাজ থেকে প্রথমে ভৌগোলিক পরিভাষা প্রস্তুত করা স্থির হয়। পরিভাষার প্রথম খসড়া আগাগোড়া রাজেন্দ্রলালই তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সমাজের আর অধিবেশন না-হওয়ায় আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সমাজের 'সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ... সেই সভায় আর কোনো সভ্যের

কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্রমহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত, তবে বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তির দ্বারা অনেকদূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই'।

ভূগোল ও মানচিত্রের ওপর রাজেন্দ্রলালের বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি বাংলায় একখানি ভূগোল লিখেছিলেন। স্কুলে ব্যবহারের জন্য বাংলা অক্ষরে ছোট-বড় নানা মানচিত্র ছাপিয়ে ছিলেন। বাংলা, বিহার, ওড়িশার প্রতি জেলার মানচিত্র ও একখানি ভৌত মানচিত্র (Physical Chart) তিনি বাংলা অক্ষরে প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রেও রাজেন্দ্রলাল পথপদর্শক। তাঁর পূর্বে বাংলা অক্ষরে আর-কেউ মানচিত্র প্রকাশ করেননি। বাংলা মানচিত্র ছাড়া নাগরি ও ফারসি অক্ষরে ভারতবর্ষের ও শুধু ফারসি অক্ষরে এশিয়ার মানচিত্রও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।

ভূগোল ছাড়া আরো ৭খানি বই তিনি বাংলায় লিখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর কোনোটিই তাঁর গবেষণামূলক বা সাহিত্য পদবাচ্য নয়। সবগুলিই স্কুলপাঠ্য, যেমন, 'ব্যাকরণ প্রবেশ', 'পত্রকৌমুদী'। দু'খানি বই — 'শিবাজীর চরিত' ও 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত' — ইতিহাস সংক্রান্ত বটে কিন্তু মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থ নয়, স্কুলপাঠ্য পুস্তক। এই দু'খানি বাংলা সাহিত্য সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সাহিত্য না-হলেও এই দুটি ছোট স্কুলপাঠ্য ইতিহাস তাঁর গভীর দেশপ্রেমের সাক্ষ্য দেয়।

আসলে বাংলা ভাষায় তাঁর সাহিত্যসেবা আত্মপ্রকাশ করে স্কুলপাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে দিয়ে নয়, দু'খানি সচিত্র মাসিক পত্রিকার মধ্য দিয়ে। পত্রিকা দু'খানির নাম 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ'। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র। ১৮৫১-১৮৬১ সালের মধ্যে তার মোট ৭ খণ্ড প্রকাশিত হয়, মাঝে তিন বছর বন্ধ ছিল। প্রথম ৬ খণ্ডের সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল, শেষ খণ্ডের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ। বাংলা সাহিত্য সমিতির সাহায্যে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হত।

বাংলা সাহিত্য সমিতি ও কলকাতা টেক্সটবুক সোসাইটি ১৮৬২ সালে মিলিত হয়ে এক নতুন সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সাহায্যে রাজেন্দ্রলাল ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'রহস্য সন্দর্ভ' প্রকাশ করেন। ১৮৬৩-১৮৭১ সালের মধ্যে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় এই পত্রিকাখানির ৬ খণ্ড প্রকাশিত হয় ; মধ্যে তিন বছর বন্ধ ছিল। পরে প্রাণনাথ দত্তর সম্পাদনায় আরো ২ খণ্ড প্রকাশিত হয়।

এই দুটি মাসিকের বহু প্রবন্ধই রাজেন্দ্রলালের রচিত। কিন্তু লেখকের নাম-না দিয়ে প্রকাশিত হওয়ায় আজ জানবার উপায় নেই কোনগুলি রাজেন্দ্রলালের, কোনগুলি অপরের। পত্রিকা দুটিতে যেসব গ্রন্থের সমালোচনা থাকত সেগুলি খুব উঁচু ধরনের। বাংলা সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের আর কোনো দাবি থাক আর নাই থাক, প্রকৃত সমালোচনা পদ্ধতির প্রবর্তক হিসেবে তাঁর দাবি চিরকাল স্বীকৃত হবে।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশের পূর্বে রাজেন্দ্রলাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার সভ্য ছিলেন। পাঁচজন সভ্য নিয়ে এই সভা গঠিত হত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাকি চারজন সভ্যের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু এই পত্রিকার জন্য রাজেন্দ্রলাল কোনো প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিনা জানা যায় না।

দেশভাবনা

রাজেন্দ্রলাল শুধু গবেষণা ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে জীবন কাটাননি। দশের ও দেশের সেবাও করেছেন সক্রিয়ভাবে। ১৮৬৩-১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার পৌরকার্য একটি কমিটির দ্বারা নির্বাচিত হত। এই কমিটির সভ্যদের বলা হত Justice of the Peace। রাজেন্দ্রলালও একজন Justice of the Peace ছিলেন। ১৮৭৬ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই সময়ে রাজেন্দ্রলাল করদাতাদের ভোটে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই পৌর প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে এর প্রতিষ্ঠার দিন থেকে নিজের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর যোগ ছিল। সমস্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় উন্নতি ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। রাজেন্দ্রলাল চার বছর এই সভার সহ-সভাপতি ও চার বছর সভাপতি ছিলেন। তিনি দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নির্ভীকভাবে লড়াই করতে কখনও পরাঙ্মুখ হতেন না। তিনি উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে বলেছিলেন : 'যারা কর্তাদের অনুগ্রহ ও প্রসাদ, সম্মান ও পুরস্কার পাবার জন্য 'আপ্‌কেওয়াস্তে' ও 'জো হুকুম'দের অনুসরণ করে তারা দেশবাসীর স্বার্থ বলি দেয়। সমাজে উচ্চাসন পাবার তারা কোনোমতেই যোগ্য নয়।' তিনি নিখিল ভারতীয় ঐক্য একান্তভাবে কামনা করতেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আর এক অধিবেশনে তিনি বলেন : 'রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যা না-হলেই নয় তা হচ্ছে একতা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের একতা ও সততার অভাবই আমাদের সাফল্যের পথের একমাত্র অন্তরায়। যাঁরাই দেশের মঙ্গল কামনা করেন তাঁদেরই সর্বপ্রথমে একতা ও সততা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা উচিত।' ১৮৮৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাংলায় তখন কৃতী মনস্বীর অভাব ছিল না। এত লোক থাকা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলালকে ওই গৌরবময় পদে বরণ করা থেকে প্রমাণ হয় দেশবাসীর চক্ষে রাজেন্দ্রলালের আসন কত উঁচুতে ছিল।

এই উপলক্ষে তিনি যে-অভিভাষণ দেন তাতে বলেন : 'আমার জীবনের একটি স্বপ্ন ছিল যে আমার জাতির (race) বিক্ষিপ্ত অংশগুলি যেন একদিন একত্র হয়ে মিলিত হয়। স্বপ্ন ছিল যে আমরা যেন ব্যষ্টিরূপেই না-থাকি, কোনোদিন না কোনোদিন যেন সংহত হয়ে জাতি (nation) রূপে বাঁচতে পারি। এই অধিবেশনে আমি সেই মিশনের সূত্রপাত দেখছি — এই কংগ্রেসের মধ্যে দেখছি ভারতের ভাগ্যে এক উজ্জ্বলতর দিনের সূচনা।'

এখানে তাঁর মাত্র তিনটি অভিভাষণ থেকে উদ্ধৃতির অনুবাদ দেওয়া হল। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে আরো অনেক বক্তৃতা দেন। তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ১৮৫৭ সালে *Black Act* উপলক্ষে কলকাতায় যে-সভা হয় সেই সভায় রাজেন্দ্রলাল প্রথম প্রকাশ্য-বক্তৃতা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৯২ সালে রাজা যোগেশ্বর মিত্র তাঁর বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে অন্যান্য অভিভাষণের মধ্যে এইগুলি আছে : রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভা, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃতিসভা, মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভা, দেশি ভাষায় শিক্ষা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রশ্ন, হরিশচন্দ্র মুখার্জির গ্রন্থাগারের উদ্বোধন, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, ভারতে খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকমণ্ডলীর রাষ্ট্র হতে পৃথককরণ, ডা. মণীন্দ্রলাল সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগ, দুর্গাপূজার ছুটির প্রশ্ন, বোম্বাইয়ের পার্শি সম্প্রদায়, ডা. হর্নলির নিয়োগ ও রোমক অক্ষর প্রবর্তন, শিক্ষা কমিশন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল, ইলবার্ট বিল, কলিকাতা ও

উপকণ্ঠস্থ মিউনিসিপ্যালিটিগুলির একীকরণ, ঘিয়ে ভেজাল, হিন্দু-বিবাহ প্রশ্ন, কুষ্ঠরোগীদের পৃথককরণ। পরিশিষ্টে ছিল এনট্রান্স পরীক্ষা কমিটির রিপোর্ট, সহবাস সম্মতি বিল। এসব থেকে বোঝা যায় রাজেন্দ্রলালের প্রতিভা ও প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী, ব্যাপক ও প্রবল।

রচনাবলি

সবসুদ্ধ ৫০টি গ্রন্থ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সম্পাদন বা রচনা করেন। এই ৫০টি গ্রন্থ মোট ১২৮ খণ্ডে বিভক্ত। সমস্ত গ্রন্থের মোট পাতার সংখ্যা ৩৩,০৮৯। ৫০টি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ৪২টির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যথা, বাংলায় ৮, সংস্কৃতে ১৪ ও ইংরেজিতে ২০।

বাংলা

১. প্রাকৃত ভূগোল, ১৮৫৪
২. শিল্পীক দর্শন অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পদার্থ কতিপয়ের প্রস্তুতকরণের বিবরণ গ্রন্থ (সচিত্র), ১৮৬০
৩. শিবাজীর চরিত, নভেম্বর, ১৮৬০
৪. মেবারের রাজেতিবৃত্ত, ১৮৬১
৫. ব্যাকরণ প্রবেশ, ১৮৬২
৬. সাধু নিয়েরসিস ক্লাজেন্‌সিস-এর প্রার্থনা। বাংলায় ও সংস্কৃতে অনূদিত, ১৮৬২
৭. পত্রকৌমুদী অর্থাৎ নাম পত্রাদি লেখনের উপদেশগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত অনারেবল্ ওয়াল্টার স্কট সিটনকার তথা শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সংকলিত, ১৮৬৩
৮. অশৌচ ব্যবস্থা, ১৮৭৩

সংস্কৃত

১. চৈতন্য চন্দ্রোদয়, নাটক ১৮৫৪
২. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১-৩ খণ্ড, ১৮৫৯, ১৮৬২, ১৮৯০
৩. প্রাকৃত ব্যাকরণ, ক্রমদীশ্বর কৃত
৪. তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১৮৭১
৫. গোপথ-ব্রাহ্মণ, ১৮৭২
৬. তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, ১৮৭২
৭. অগ্নিপুরাণ, ১-৩ খণ্ড ; ১৮৭৩, ১৮৭৬, ১৮৭৯
৮. ঐতরেয় আরণ্যক, ১৮৭৬
৯. ললিতবিস্তার, ১৮৭৭
১০. বায়ুপুরাণ, ১-২ খণ্ড, ১৮৮০, ১৮৮৬
১১. নীতিসার, কামন্দক কৃত, ১৮৮৪ (এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম এই গ্রন্থ সম্পাদনার ভার নেন)।
১২. অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা, ১৮৮৮

১৩. বৃহদ্দেবতা, শৌনক কৃত, ১৮৯২
১৪. আর্থর্ব্বানোপনিষদ, (৯ খণ্ডেসম্পাদনা করেন বলে উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় নি)।

ইংরেজি

1. A Descriptive Catalogue of Curiosities in the Museum of the Asiatic Society of Bengal, 1849
2. A Catalogue of Books and Maps in the Library of the Asiatic Society of Bengal, 1856
3. Index to vols. I to XXIV of the Journal of the Asiatic Society, 1856
4. A Translation of Chhandogya Upanishad, 1862
5. Notices of Sanskrit Manuscripts, First Series, 1870–1888
6. Catalogue of Sanskrit Manuscripts existing in Oudh, prepared by C. Browning, Ed. by R, Mitra, 2 Vols 1873–1878.
7. The Antiquities of Orissa, 1875–1880
8. A Report on Sanskrit Manuscripts in Native, Libraries 1875
9. An Introduction to the Lalit Vistara, 1877
10. A Scheme for the Rendering of European Scientific Terms into the Vernaculars of India, 1877
11. A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Asiatic Society of Bengal, Part I : Grammer, 1877
12. Buddha Gaya, the Hermitage of Sakya Muni, 1878
13. The Parsis of Bombay : A lecture delivered in February 26, 1880, at a meeting of the Bethune Society, Calcutta, 1880
14. Report on the Operations carried on to the close of the Official Year 1879–'80 for the Discovery and Preservation of Ancient Sanskrit Manuscripts in the Bengal Province, 1888
15. A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of H. H. the Maharaja of Bikaner, 1880
16. Indo-Aryans. Contribution towards the elucidation of their Ancient and Medieval History, 2 vols., 1881
17. The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, 1882
18. Yoga Aphorisms of Patanjali with the Commentary of Bhoja Raja and English Translation, 1883
19. History of the Asiatic Society, in the Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal from 1784 to 1883, 1885
20. A Translation of the Lalit Vistara, 1886

উল্লিখিত সংস্কৃত ও ইংরেজি গ্রন্থের প্রত্যেকটি রাজেন্দ্রলালের অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল। কিন্তু বিশেষ করে তিনটি গ্রন্থ *Anitquities of Orissa, Buddha-Gaya* ও *Indo-Aryans* তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রথম দু'টি গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাদের নাম থেকেই প্রকাশ। শুধু *Indo-Aryans* গ্রন্থটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সেইজন্য তার বিষয়সূচি এখানে উদ্ধৃত করা হল : ১. ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি ; ২. ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের

মূলনীতি ; ৩. ভারতীয় ভাস্কর্য ; ৪. প্রাচীন ভারতে বস্ত্রালঙ্কার ; ৫. প্রাচীন ভারতের গৃহসজ্জা, তৈজস, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র, ঘোড়া ও রথ ; ৬. প্রাচীন ভারতে গোমাংস ; ৭. প্রাচীন ভারতে মদ্য ; ৮. প্রাচীন ভারতে বনভোজন ; ৯. প্রাচীন ভারতে সম্রাটাভিষেক ; ১০. প্রাচীন ভারতে নরবলি ; ১১. প্রাচীন ভারতে প্রেতকৃত্য ; ১২. সংস্কৃত সাহিত্যিকদের কল্পিত গ্রীক ও যবনের অভিন্নত্ব ; ১৩. বাংলার পাল ও সেন বংশ ; ১৪. গাথা, উপভাষার বিশেষত্ব ; ১৫. ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষ্য ; ১৬. হিন্দি ভাষার উৎপত্তি ও উর্দুর সঙ্গে সম্বন্ধ ; ১৭. গোয়ালিয়র রাজগণের চিহ্নাবশেষ ; ১৮. ধারের ভোজরাজা ও তাঁহার সমনাম ; ১৯. অশোকের প্রথম জীবন ; ২০. আদিম আর্য ; ২১. সংস্কৃত লিপির উৎপত্তি।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে বোঝা শক্ত নয় যে রাজেন্দ্রলাল ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন অদ্বিতীয় মনীষী ছিলেন। তিনি একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যা অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদিতে প্রগাঢ় পণ্ডিত, বহুভাষাবিদ্, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, নাগরিক, বক্তা ও লেখক ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর এ-জাতীয় প্রতিভা নিয়ে আমাদের দেশে আর-কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। ৬৯ বৎসর বয়সে, ১৮৯১ সালে ২৬ জুলাই 'বিশ্বকোষ'-এ ভুলে ২৯ আছে) তাঁর মৃত্যু হয়।

দেশ-বিদেশের পণ্ডিতরা রাজেন্দ্রলালের প্রতিভার উচ্চ সম্মান করেছেন। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি পূর্বেই কিছু উদ্ধৃত হয়েছে এখানে আরো কিছু উদ্ধৃত হল। যাঁরা সম্পূর্ণ বক্তব্য জানতে চান তাঁরা কবির 'জীবনস্মৃতি' পাঠ করবেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> ... রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। ... তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে। ... কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর-কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। ... এক-একদিন ... তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন, এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন। ... তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। ... যোদ্ধৃবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল। ম্যুনিসিপাল-সভায়, সেনেট-সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙমুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। ... বাংলাদেশের এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পর দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই।

আমরা আজ কবিকে সম্মান করছি। কবি যাঁকে এতখানি সম্মান করতেন তাঁকেও যেন সম্মান করতে না-ভুলি।

আচার্য লালবিহারী দে

জনমকথা-পূর্বপুরুষ-শিক্ষাজীবন

বাংলা দেশের উজ্জ্বল রত্ন — বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট গৌরব — আচার্য লালবিহারী দে। মাত্র ঊনষাট বছর আগে তিনি মারা যান, অথচ এরই মধ্যে আমরা তাঁকে ভুলে গিয়েছি বললেও অত্যুক্তি হবে না। যেখানে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন সেই স্কটিশ চার্চ কলেজের হলঘরে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু ও প্রাক্তন ছাত্রগণ তাঁর এক মর্মর স্মৃতিফলক স্থাপন করেছিলেন। বাংলার খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় স্বধর্মী মনীষীর প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। লালবিহারীর মধ্যম কন্যা কুমারী অ্যালিস বি. দে মৃত্যুর সময় পূর্বোক্ত কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড জন কেলাস সাহেবের হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, নিজবিবেচনা মতো পিতার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু বাংলার জনসাধারণ কিংবা তাঁর জেলাবাসীগণ এযাবৎ তাঁর প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করেননি। মনে হয়, এই মানুষটির প্রতি তাঁদের যে-কোনো কর্তব্য আছে এ-চেতনাও সাধারণভাবে তাঁদের মধ্যে ছিল না। সুখের বিষয় ইদানীং এই বোধটি অন্তত তাঁর জেলাবাসীদের মধ্যে ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে। তাই গত দু-বছর থেকে তাঁরা লালবিহারীর স্বগ্রামে তাঁর জন্মদিনে স্মৃতিসভা করে আসছেন এবং পৈতৃক ভিটায় স্মৃতিবেদী স্থাপন করে ও অন্যান্য উপায়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষার প্রচেষ্টা করছেন। তিনমাস পরে আবার তাঁর জন্মবার্ষিকী পালিত-হবার সময় উপস্থিত হবে। তারও আগে ২৮ অক্টোবর তাঁর মৃত্যুর ঊনষাট বৎসর পূর্ণ হবে। এই দুই ঘটনার প্রাক্কালে তাঁর জীবনকথা সংক্ষেপে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বর্ধমান শহর থেকে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে সোনাপলাশি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর লালবিহারীর জন্ম হয়। জাতিতে তিনি সুবর্ণবণিক — বংশগত উপাধি 'দে', নবাব-দত্ত উপাধি 'মণ্ডল'। তাঁর পূর্বপুরুষের বাস এই গ্রামে, আবার তাঁর মামার বাড়িও এই গ্রামে। এখনও এই গ্রামে তাঁর ভগ্ন পৈতৃকভিটা 'মণ্ডলবাটী' ও 'মণ্ডলপুকুর' ও 'দে-পুকুর' বর্তমান।

তাঁর গ্রামের নাম নিয়ে অনেকদিন ধরে একটা গণ্ডগোল চলে আসছিল। লালবিহারী নিজেই এই গণ্ডগোলের সৃষ্টিকর্তা। নিজের পত্রিকা 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'-এ তিনি ছদ্মনামে যে-বাল্যস্মৃতি লিখেছিলেন তাতে তিনি স্বগ্রামের নাম দিয়েছিলেন 'তালপুর'। তাঁর কথা বিশ্বাস করে ম্যাকফারসন সাহেবও লালবিহারীর ইংরেজি জীবনচরিতে এই গ্রাম 'তালপুর' নামেই উল্লেখ করেছেন। ম্যাকফারসনকে অনুসরণ করে তাঁর যে-স্মৃতিফলক পরবর্তীকালে স্কটিশ চার্চ কলেজে স্থাপিত হয় তাতেও গ্রামের নাম দেওয়া ছিল 'তালপুর'। যদিও নানা যুক্তি তর্ক ও দলিলের ফলে

এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, 'তালপুর' নামে বর্ধমান জেলায় কোনো গ্রাম নেই, সোনাপলাশি গ্রামই লালবিহারীর জন্মস্থান, ও এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে কলেজের স্মৃতিফলককে গ্রামের নাম কয়েক বৎসর পূর্বে সংশোধন করা হয়েছিল, তবুও যেন একটু সন্দেহের অবকাশ থেকে গিয়েছিল। সম্প্রতি বেঙ্গল ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে লালবিহারী নিজের নাম দিয়ে স্পষ্ট লিখেছেন যে, তিনি জন্মেছেন সোনাপলাশি গ্রামে। সুতরাং তিনি নিজে যে-সন্দেহ ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন, শেষে নিজেই তার অবসান করেছেন।

এই গ্রামটি আজও সুবর্ণবণিক প্রধান। লালবিহারীর অতি বৃদ্ধ প্র-প্রপিতামহ বৈষ্ণবচন্দ্র দে মণ্ডল এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পুত্র খেলারাম দে মণ্ডল। খেলারামের পুত্র লালবিহারীর প্রপিতামহ গোকুলচন্দ্র দে মণ্ডল বর্ধমান জেলায় বর্গির হাঙ্গামার সময় (আনুমানিক ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে) স্বগ্রাম সোনাপলাশী ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে যান। এই গ্রাম বর্গিরা লুট করেছিল। প্রায় ষাট বৎসর পরে, ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে, গোকুলের পুত্র (লালবিহারীর পিতামহ) গোলোকচন্দ্র দে মণ্ডল সোনাপলাশি গ্রামে ফিরে আসেন। গোলোকের তিন পুত্র : জ্যেষ্ঠ কমললোচন, মধ্যম রাধাকান্ত ও কনিষ্ঠ বেণীমাধব। মধ্যমপুত্র রাধাকান্তই লালবিহারীর পিতা। রাধাকান্তের জন্ম হয় ঢাকাতেই আনুমানিক ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকাতেই তাঁর প্রথম বিবাহ ও দুই সন্তান হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদুটি মারা যায়। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি পিতার সঙ্গে বিপত্নীক অবস্থায় ঢাকা থেকে সোনাপলাশি গ্রামে ফিরে আসেন তখন তাঁর বয়স আন্দাজ ২৩ বছর। পরে এই গ্রামেরই এক কন্যাকে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। এই বিবাহের সন-তারিখ, কন্যার বা কন্যার পিতামাতার নাম, কিছুই জানা যায় না। কন্যার জন্ম হয় আনুমানিক ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে। এই কন্যাই লালবিহারীর মাতা। মাতার বয়স যখন আন্দাজ ১৬ ও পিতার বয়স ৪২, তখন লালবিহারীর জন্ম হয় মাতুলালয়ে। লালবিহারীর আর-একটি ছোটভাই হয়েছিল। তাঁর নাম বনমালী। তিনি লালবিহারীর জীবদ্দশাতেই অল্পবয়সেই পত্নী ভগবতী দাসীকে রেখে মারা যান। বনমালীর জন্ম ও মৃত্যুর সন-তারিখ জানা যায় না। লালবিহারীর ধর্মান্তর গ্রহণের পর প্রথমে বনমালী, পরে তাঁর স্ত্রী, পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

এখানে লালবিহারীর মায়ের কথাটা সেরে নেওয়া ভালো। তিনি লালবিহারীকে এত ভালোবাসতেন যে, একমুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারতেন না। তাঁর বয়স যখন ২৬ বছর, তখন লালবিহারী গ্রাম ছেড়ে কলিকাতায় পড়তে যান। তিন বছর পরে ২৯ বছর বয়সে লালবিহারী-জননী বিধবা হন। স্কুল ও কলেজে পড়বার সময়, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত, লালবিহারী লম্বা ছুটি পেলেই গ্রামে এসে মায়ের কাছে থাকতেন। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি যখন ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর মায়ের বয়স ৩৫ বৎসর। খ্রিস্টান হবার ৬ বছর পরে ১৮৪৯ সালে লালবিহারী আবার একবার স্বগ্রামে আসেন। তখন তাঁর মায়ের বয়স ৪১ বৎসর। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ বেলায় গৃহদ্বারে হারানো ছেলেকে দেখে মায়ের বুকফাটা কান্নার কথা লালবিহারী নিজেই লিখে গেছেন তাঁর অতুলনীয় ভাষায়। তারপর আর আমরা তাঁর মায়ের কোনো খবরই পাই না। তিনি কতদিন বেঁচে ছিলেন, কবে মারা যান, কিছুই জানার উপায় নেই। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। লালবিহারীর মুখ ছিল তাঁর মায়ের মতন।

তাঁর বাপ ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। প্রত্যহ সকালে স্নান, পূজা সেরে ও ১০৮ বার মালা জপ করে খেতেন, রাত্রে দু-তিন ঘণ্টা মালা জপ করতেন। 'হরি হরি রাধে গোবিন্দ' ইত্যাদি বুলি তাঁর মুখে লেগেই থাকত। জীবনে কখনও মাছ, মাংস ছোঁননি। একেবারে খাঁটি লোক

ছিলেন — মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা জানতেন না। তাই ব্যবসা করেও বৈষয়িক উন্নতি করতে পারেননি। তিনি কলিকাতায় কোম্পানির কাগজের ও হুণ্ডির দালালি করতেন। ইংরেজি না-জানলেও ব্যবসার খাতিরে discount, interest ইত্যাদি দু-চারটে ইংরেজি শব্দ বলতে পারতেন। কলিকাতার বড়বাজারে রাজাকাটরায় একটি ঘর ভাড়া করে থাকতেন। প্রতি বছর পুজোর সময় গ্রামে গিয়ে একমাস কাটাতেন। বাকি ১১ মাস কাটত কলিকাতায়। নিজে ইংরেজি জানতেন না বলে ছেলেকে যেমন করেই হোক ইংরেজি শেখাতে হবে, এই ছিল তাঁর পণ। তাই ছেলেকে খ্রিস্টান স্কুলে পড়াতেও কুণ্ঠিত হননি। ছেলের যখন ১০ বছর বয়স তখন তাঁকে গ্রামের পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে কলিকাতায় এনে পাদরি ডাফ সাহেবের স্কুলে ভর্তি করে দেন। তার কারণ, সে-স্কুলে মাইনে লাগত না। আর ছেলের মাইনে দিয়ে পড়াবার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। ১৮৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সে, কলিকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। লালবিহারীর গায়ের রঙ কালো ছিল বলে তিনি তাকে আদর করে 'কালোগোলাপ' বলে ডাকতেন। বেশি বয়সের ছেলে বলে তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। পৌত্তলিক পিতার সম্বন্ধে গোঁড়া খ্রিস্টান লালবিহারী লিখেছেন যে, তাঁর পিতার মতো পিতা সংসারে হয় না।

গ্রামের শিবতলায় গুরু-মহাশয়ের পাঠশালা বসত। ছ-বছর বয়সে হাতেখড়ি দিয়ে লালবিহারীকে পিতা এই পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। সেখানে ভুঁই-পড়ুয়ার শ্রেণীতে এক বছর, তালপাতা-পড়ুয়ার শ্রেণীতে দুই বছর, কলাপাতা-পড়ুয়ার শ্রেণীতে এক বছর — মোট চার বছর পড়ে যখন তিনি কাগজ-পড়ুয়ার শ্রেণীতে উঠলেন, তখন পিতা তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে ১৮৩৪ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। স্কুল বিভাগে তখন মোট দশ বছর পড়তে হত। লালবিহারী দশ বছরের পাঠ সাত বছরে শেষ করে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সাত বছরের মধ্যে সকল পরীক্ষার সর্ববিষয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, মাত্র একবার ছাড়া। এক বছর তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় হন। ওই বছর ক্লাসের কয়েকজন বুড়ো বুড়ো বখা-ছেলের হাতে তাঁকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। এমনকী রাস্তায় একা পেয়ে তারা তাঁকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিতেও ছাড়ত না। লারজিম মণ্ডল নামে এক বলবান সহপাঠীর সাহায্যে তিনি তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতেন। আর ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো-তেরো বছর।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি চোরবাগানে তাঁর এক জ্ঞাতি (পিসতুতো) ভাইয়ের বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে লাগলেন। সেখানে তিনি খ্রিস্টান হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর থাকেন। এই বাসায় এক রাঁধুনি ছিল, তাঁর নাম কুঞ্জর মা। সে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারত না, পক্ষাঘাতে তার দুটো পা-ই পড়ে গিয়েছিল, আসনপিঁড়ি হয়ে দুহাতে ভর দিয়ে সে চলাফেরা করত। তার বয়স ছিল চল্লিশ, রঙ কালো, চেহারা কুৎসিত, চোখ ট্যারা, দাঁত প্রায় সব ক'টি পড়ে গিয়েছিল, তার উপর সে খোনা। সংসারে তার কেউ ছিল না। সে ছিল বালবিধবা, পুত্রহারা। কিন্তু এই বিকলাঙ্গ, কিম্ভূত-কিমাকার নারীটির সেবা ও সাহায্য না-পেলে লালবিহারীর সে-বাসায় থাকা ও পড়াশোনা করা আদৌ সম্ভব হত না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কুঞ্জর মা ভোরবেলায় উঠে স্নান করে লালবিহারীকে খাইয়ে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিত। আবার সন্ধের দিকেও সকাল-সকাল তাঁকে খাইয়ে দিত, লালবিহারী তারই ঘরের একপাশে শুয়ে ঘুমতেন। সে রান্নার তেল থেকে একটু একটু বাঁচিয়ে লালবিহারীর পড়ার জন্য সরিয়ে রেখে দিত। মাঝরাতে লালবিহারীকে ঘুম থেকে তুলে দিত। লালবিহারী ভোর পর্যন্ত সেই তেলের প্রদীপে পড়াশোনা করতেন।

এ-রকম করার কারণ এই যে, সন্ধেবেলা থেকে তাঁর জ্ঞাতিভাইয়ের একটিমাত্র ঘরে তার বন্ধুবান্ধবরা এসে অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা করত। সে সময়ে সেই ঘরে বসে লালবিহারীর পক্ষে পড়াশোনা করা অসম্ভব ছিল। তাই সে-সময়ে তিনি খেয়ে-দেয়ে কুঞ্জর মা'র ঘরে ঘুমতেন। আর গভীর রাতে যখন আড্ডা ভেঙে বাড়ি নিস্তব্ধ হত তখন তিনি উঠে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু এ-ব্যবস্থার মূলে ছিল কুঞ্জর মা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত কষ্ট স্বীকার করে ছেলেবেলায় পড়াশোনা করতে হয়েছিল সে-কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু লালবিহারীকে যে সেই রকম বা তার চেয়েও বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল লেখাপড়া শেখবার জন্য, সে-কথা খুব কম লোকেই জানে। যতই দরিদ্র হোন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা অনেকদিন জীবিত ছিলেন। লালবিহারীর পিতাও নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। সেই পিতাকেও হারালেন লালবিহারী মাত্র তেরো বছর বয়সে। তখন পৃথিবীতে তাঁকে সাহায্য করবার কেউই রইল না। হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে ভালো করে পাশ করতে পারলে হিন্দু কলেজে বিনা বেতনে পড়া যায়, এই ভেবে তিনি গেলেন হেয়ার সাহেবের কাছে। কিন্তু হেয়ার সাহেব তাঁকে কিছুতেই তাঁর স্কুলে ভর্তি করলেন না। তাঁকে এই বলে বিদায় দিলেন যে, খ্রিস্টান কলেজে পড়ে তাঁর মতিগতি নিশ্চয়ই খ্রিস্টান ধরনের হয়ে গেছে। আর সে-রকম ছেলেকে ভর্তি করলে তাঁর স্কুলের ছেলেরাও খ্রিস্টান হয়ে যাবে। এই ঘটনাটি লালবিহারীর নিজের ইংরেজি লেখা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করছি :

> ... As I approached him (Mr. Hare) he called me to his side, took my hand, patted me on the chest, put his left arm round my neck and asked me what I wanted. Lal Behari — I want, sir, to be admitted into your school. Hare — What school do you attend ?
>
> Lal Behari — I am reading now in the General Assembly's Institution.
>
> Hare — What books do you read ?
>
> Lal Behari — I read Marshman's Brief Survey of History, Lennie's Grammer, Geography, Euclid Book II, New Testament and Bengali.
>
> Hare — Why do you wish to leave the General Assembly's Institution ?
>
> Lal Behari — People say there is better teaching in your school, besides I have a great desire to go to the Hindoo College from your school.
>
> Hare — You should better remain where you are. ...
>
> Lal Behari — No, sir, kindly admit me into your school.
>
> Hare — You read the New Testament, You are half a Christian, You will spoil my boys.
>
> Lal Behari — I read the New Testament because it is a class book. I don't believe in it.
>
> Hare — All Mr. Duff's pupils are half Christians. I won't take any of them into my school. I won't take you, you are half Christian, you will spoil my boys.
>
> 'I begged hard,' Mr. Dey continues, 'I earnestly besought him to take me into his school, but he kept repeating the words "you are half Christian. You will spoil my boys".'

হাতে বই কেনার পয়সা নেই, অথচ একটা ইংরাজি অভিধান না-কিনলেই নয়। কারণ তখনও নোটবুক বা মানের বই চালু হয়নি। অতি কষ্টে কয়েক আনা জমিয়ে তাই দিয়ে একখানি পুরাতন জনসন সাহেবের পকেট অভিধান কেনা হল, কিন্তু তার প্রথম অক্ষরের সব কটি পাতাই ছেঁড়া। এই অভিধানটি তাঁর চিরসঙ্গী ছিল। কিন্তু শুধু অভিধান দিয়েই তো একটি বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। তার জন্য ইংরাজি সাহিত্যের নামকরা লেখকদের বই পড়া দরকার। কিন্তু সেসব বই কেনার পয়সা কোথায়? তখনকার দিনে নতুন বা পুরাতন বইয়ের এত দোকান ছিল না। চটের থলেতে যে যা পারে পুরনো বই পুরে সেটা পিঠে ঝুলিয়ে মুসলমান ফিরিওয়ালারা কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় বই ফিরি করে বেড়াত। এই রকম এক ফিরিওয়ালা ছিল 'পাগলা চাচা'। কী যেন কেন, সে বালক লালবিহারীকে একটু স্নেহ করত। লালবিহারী একদিন কয়েক আনা দিয়ে একটি বই কিনলেন তার কাছ থেকে। কয়েকদিনের মধ্যে সেটাকে পড়ে শেষ করে পাগলা চাচাকে বললেন, 'চাচা, আমার তো বইটি পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো গরিব মানুষ। প্রতিবার যে নগদ পয়সা দিয়ে তোমার কাছ থেকে নতুন নতুন বই কিনব সে ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যদি এই বইটি ফেরত নিয়ে আরেকটি বই আমায় পড়তে দাও তো বড় ভালো হয়। আবার সেটি হয়ে গেলে আরেকখানি দিও।'

পাগলা চাচা কী ভেবে সে-প্রস্তাবে রাজি হল। এই রকম করে লালবিহারী Addison-এর Spectator, Gibbon-এর Decline and Fall of the Roman Empire ও Hume-এর History of England পড়েন। বই কিনতে পারতেন না বলে আর-একটি রোগে তাঁকে ধরেছিল। আর এই রোগ তাঁর বহুদিন পর্যন্ত ছিল। রাস্তার উপর নজর রেখে তিনি চলতেন, আর কোনো ছাপানো কাগজ বা বইয়ের ছেঁড়া পাতা পড়ে থাকতে দেখলেই সেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে আনতেন ও পড়ে সযত্নে গুছিয়ে রেখে দিতেন।

কিন্তু এই দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেও তিনি কি স্কুলে কি কলেজে ক্লাসের সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করতেন। কোনো বিষয়েই কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। ১৮৪১ সালে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় তিনি দুটি প্রবন্ধ লিখে যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ৩৫ টাকা পুরস্কার পান। পর বৎসর তৃতীয় শ্রেণীতে ম্যাকফারলেন স্বর্ণপদক লাভ করেন। কলেজ বিভাগের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে চার-পাঁচ দিন ধরে লিখিত পরীক্ষা দিয়ে সব বিষয়ে যে-ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করতে পারত সে-ই এই পুরস্কার পেত। এখন এই ছাত্রকে বলা হত *Dux of the Institution* অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা বা সর্দার-পড়ুয়া। ১৮৪২ সালে তাঁর কলেজের পাঠ সমাপ্ত হলেও তিনি স্বেচ্ছায় আরো দুই বৎসর (১৮৪৪-৪৫) কলেজে অধ্যয়ন করেন। এবং এই দুই বৎসরও ম্যাকফারলেন স্বর্ণপদক পান। মোট বারো বছর তিনি স্কুল-কলেজে পড়েছিলেন। তার মধ্যে এগারো বছর তিনি নিজ শ্রেণীর নেতা ও তিন বছর সমস্ত বিদ্যালয়ের নেতা হয়েছিলেন।

কলেজ ক্লাসে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের তখন উচ্চ-গণিত ও বিজ্ঞান পড়তে হত। গণিতের বিষয় ছিল — Mechanics, Hydrostatics, Pneumatics, Optics, Differential Calculas, Conic Sections, Spherical Trigonometry, Analytical Geometry; বিজ্ঞানের বিষয় ছিল — Physics, Chemistry, Astronomy, Geology, Principle of Steam Engine, Navigation; কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে সংস্কৃত পাঠ্য ছিল 'মুগ্ধবোধ' ও ফারসিতে 'গুলিস্তাঁ' ও 'বোস্তাঁ'।
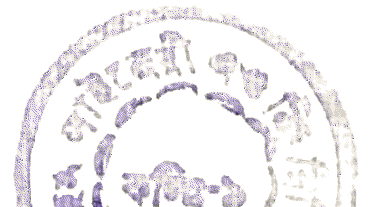
ভাষা-অর্জনে আগ্রহ

লালবিহারী ইংরাজি ছাড়াও বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু, ফারসি, গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু-ভাষা জানতেন। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও পাশ্চাত্যদর্শন — এই কয় বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন। অধ্যবসায় থাকলে চরম দারিদ্র্যও যে বিদ্যার্জনের পথে বাধা হতে পারে না তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লালবিহারী। এ-বিষয়ে তাঁর জীবন দরিদ্র ছাত্র-মাত্রকেই চিরকাল উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাবে।

খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা—'ক্যাটেকিস্ট'—আলেকজাণ্ডার ডাফ

কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার সময় ১৮৪৩ সালের ২৩ জুলাই লালবিহারী তাঁর শিক্ষক টমাস স্মিথের দ্বারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এর ফলে জ্ঞাতি-ভাইয়ের বাসা ছেড়ে কলেজ-সংলগ্ন কনভার্টস হোমে এসে তাঁকে বাস করতে হয়। সেকালে নিজধর্ম ত্যাগ করা একটা যে-সে ব্যাপার ছিল না। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, স্বজাতি, সমাজ, সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা যুদ্ধ ঘোষণার সমান ছিল। সুতরাং স্বধর্ম-ত্যাগীর প্রতি কারো ক্ষমা ছিল না। নিকটতম আত্মীয় পর্যন্ত তাকে শুধু ত্যাগই করত না, তার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারও করত। প্রকৃত বীর বা বিদ্রোহী ছাড়া অন্যের পক্ষে এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। লালবিহারী খাঁটি বিদ্রোহী ও বীর ছিলেন। তৎকালীন হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। তাই পাশ্চাত্যের উন্নততর সমাজের ধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন। তার জন্য তাঁকে বড় রকমের মূল্য দিতে হয়েছিল। এমনকী, পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। সে-যুগের এমন আরো কয়েকটি বীর ও বিদ্রোহী বাঙালি সন্তান হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়)। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন ও বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিমাত্রেরই নমস্য হয়ে আছেন।

১৮৪৬ সালে লালবিহারী ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের Catechist নিযুক্ত হন। পাঁচ বছর পরে ১৮৫১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ধর্মপ্রচার করবার অনুমতি পান। কালনা মিশনের অধীনে তাঁকে কাজ করতে পাঠানো হয়। কালনা থেকে তিনি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতেন। এই সময় প্রত্যেক দিনের বিবরণ তিনি রোজনামচার মতো লিখে রাখতেন। এই বিবরণীগুলিকে বলা হয় তাঁর *Journal of Preaching Tours*; এই 'ভ্রাম্যমানের ডায়েরি'তে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক পল্লীবাংলার অবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। এই সময় তিনি কোনো এক গ্রামে জীবন্ত গোবিন্দ সামন্তের সাক্ষাৎ পান। এই বিবরণীগুলি ছাপানো হয়েছিল কিনা তার হদিশ পাওয়া যায় না। ৪ বৎসর পরে ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি Minister বা আচার্য হন। এই খ্রিস্টমণ্ডলীতে তিনিই প্রথম বাঙালি আচার্য। কিন্তু আচার্য হয়ে দেখলেন যে, ধর্মের ক্ষেত্রেও বর্ণভেদ আছে। মিশন পরিষদে শ্বেতাঙ্গ আচার্যদের স্থান আছে, কৃষ্ণাঙ্গদের নেই। এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর গুরু ডাক্তার ডাফ — যাঁকে তিনি পিতার মতো ভক্তি করতেন — তাঁর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বাদানুবাদ ও মনোমালিন্য হয়। অবশেষে তিনি

পদত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করেন। ডাক্তার ডাফ তাঁকে অন্তত এক বছরের জন্যে কালনা মিশনের সুপারিনটেনডেন্টের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন ও প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর কাজের উপর কোনোরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। এই শর্তে তিনি কালনায় যান। কিন্তু যখন দেখলেন যে, সত্যই তাঁর কাজে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না তখন তিনি পদত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করে চার বছর কালনায় থেকে যান। চার বছর কালনায় কাজ করার পর তাঁকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ডাফগির্জার আচার্য করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এইখানে তিনি ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৬৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত আচার্যের কাজ করেন।

১৮৬০ সালের দোসরা জানুয়ারি তিনি স্থলপথে বোম্বাই প্রদেশের সুরাট শহরে গিয়ে রেভারেন্ড হরমুসজী পেসটনজী নামে এক খ্রিস্টান পার্শি ভদ্রলোকের বাইশ বছরের কন্যা কুমারী বাচুবাইকে বিবাহ করেন। বোম্বাই থেকে জলপথে সস্ত্রীক কলকাতায় ফিরে তিনি গির্জা-সংলগ্ন আচার্যের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। এই বাড়ির জন্য কোনো ভাড়া লাগত না বটে কিন্তু বাড়িটি বড় অস্বাস্থ্যকর ছিল। এখানে তাঁর পরপর তিন কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। তার মধ্যে দ্বিতীয় কন্যাটি ১৮৬৪ সালে, তৃতীয় কন্যাটি ১৮৬৬ সালে ও পুত্রটি ১৮৬৭ সালের জুলাই মাসে মারা যায়। এই সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার ফি ও আচার্যের বেতন দুই মিলিয়ে তাঁর মোট আয় ছিল মাত্র দেড়শত টাকা। এই অল্প আয়ে তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিবারের ব্যয় সংকুলান করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। তিনি সেই জন্য ডাফ সাহেবের কাছে তাঁর কলেজে একশো টাকা বেতনের একটি আংশিক অধ্যাপকের চাকরির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সাহেব-আচার্যদের এইরূপ অধ্যাপকের কাজ দেওয়ার নজির থাকা সত্ত্বেও ডাফ সাহেব লালবিহারীকে ওইরূপ সুবিধা দিতে অস্বীকার করেন।

লালবিহারী খ্রিস্টধর্ম প্রচারকেই জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে, এই কাজ তাঁকে কোনোদিন ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পরপর তিনটি সন্তানের মৃত্যু, তার উপর অর্থকষ্ট, এই দুই কারণ মিলে তাঁকে পৌরোহিত্যের কাজ থেকে বিদায় নেওয়ার কথা চিন্তা করতে বাধ্য করল। এমন সময় ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যাসলি ইডেন-এর আদেশে তিনি বহরমপুর সরকারি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

এখন থেকে তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল — শিক্ষাব্রতীর অধ্যায়। কিন্তু এই জীবনেও তিনি নিজের নামের পূর্বে রেভারেন্ড বা আচার্য পদবি লিখতে ছাড়েননি, যদিও তাতে তাঁর ক্ষতি বই লাভ ছিল না। চার বৎসর বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনার পর ১৮৭২ সালে হুগলি কলেজে বদলি হন। এখানে তিনি আঠারো বৎসর ইংরেজি সাহিত্যের ও পাশ্চাত্য দর্শনের অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। ১৮৮৯ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ১০০০ টাকা। শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার জন্য তিনি বহু প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষমহল তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হননি।

অবসর গ্রহণের পর তিনি কলকাতায় এসে অবশিষ্ট জীবন ২ বেনেপুকুর লেনের বাড়িতে বাস করেন। কিন্তু শেষের দিনগুলি তাঁর শান্তিতে কাটেনি। ১৮৭২ সাল থেকে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' নামে তিনি একটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছিলেন। এই পত্রিকাটির পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এই কারণে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর বড়ছেলে লালবিহারী দে-কে (তাঁর নামেই পুত্রের নাম)

বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়। পরে জানা যায় যে, সে রোমান ক্যাথলিকদের পাল্লায় পড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। এই কারণেও তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তা কম ছিল না। তার উপর তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে শেষে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অবশেষে তাঁর অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় বহুদিন শয্যাশায়ী থেকে তিনি ১৮৯৪ সালের ২৮ অক্টোবর প্রায় সত্তর বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের কড়েয়া রোড সমাধিক্ষেত্রে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়। সেখানে, তাঁর, তাঁর স্ত্রীর ও পুত্র-কন্যাগণের সমাধি আজও বর্তমান।

লালবিহারী দে দেশের ও সমাজের সেবা করে গেছেন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। এই ভাষার উপর তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। তাঁর মতো ইংরেজি, ভারতবাসী কেন, অনেক ইংরেজও লিখতে পারতেন না। রো নামে বিখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপক নিজের বইয়ে বাঙালিদের লেখা ইংরেজিকে 'বাবু ইংরেজি' বলে ঠাট্টা করেছিলেন। লালবিহারী স্বজাতির এই অপমান নীরবে সহ্য করতে পারেননি। তিনি এক প্রবন্ধ লিখে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন ও রো সাহেবের নিজের লেখা থেকে ভূরিভূরি ইংরেজি ভুল বার করে দেখিয়ে দেন। এই মুখের মতো জবাবে শুধু বাঙালিরই নয়, সমস্ত ভারতবাসীর মাথা উঁচু ও গর্বিত-ইংরেজের মাথা হেঁট হয়েছিল। এই ঘটনায় সেই সময়ে বাংলা দেশে লালবিহারীর নামে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। বাংলা দেশের একজন অখ্যাত দরিদ্র পল্লীবালক কেমন করে ইংরেজির মতো এক কঠিন বিদেশি ভাষার উপর এমন অতুলনীয় অধিকার লাভ করেছিলেন তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। একজন বাঙালির লেখা ইংরেজি বই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা ইংরেজি গদ্য রচনার আদর্শ হিসাবে ছাত্রদের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হবে এটা সামান্য গৌরবের কথা নয়। এ-গৌরব ভারতবাসীদের মধ্যে একমাত্র লালবিহারী অর্জন করেছেন।

তিনি শুধু ধর্মযাজক ও অধ্যাপক ছিলেন না, সাংবাদিকও ছিলেন। কলিকাতা রিভিউ, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি সে-সময়ের প্রসিদ্ধ সাময়িকপত্রে তিনি সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। বেথুন সভা, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা ইত্যাদি বহু সভার তিনি সদস্য ছিলেন ও সেইসব সভার অধিবেশনে ইংরেজি ভাষায় বহু প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সেগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ও স্বতন্ত্র পুস্তক, পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি নিজেও চারখানি সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন। প্রথমটি তাঁর একমাত্র বাংলা ভাষায় সম্পাদিত মাসিক, নাম 'অরুণোদয়'। এই পত্রিকা ১৮৮৫-৮৬ সালে কলিকাতা ও কালনা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ সালে তিনি 'ইন্ডিয়ান রিফরমার' পত্র সম্পাদনা করেন অল্পদিনের জন্য। ১৮৬৬ সালে সাপ্তাহিক 'ফ্রাইডে রিভিউ' সম্পাদনা করেন, এটাও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর সর্বশেষ পত্রিকা মাসিক 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' ১৮৭২ সালের আগস্ট মাসে হুগলি কলেজে এসে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা বহু বছর চলেছিল। তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনাগুলি হুগলি কলেজে অধ্যাপনাকালে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

লালবিহারী রচিত প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া গেল। সবগুলি প্রবন্ধই ইংরেজিতে লেখা।

'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ:

১. চৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, জানুয়ারি ১৮৫১
২. বাঙালির খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ, জুন ১৮৫২
৩. বাংলার পালা-পার্বণ, জুলাই ১৮৫২ (বেথুন সভায় পঠিত)

৪. বাংলা দেশে বাংলা শিক্ষা
৫. বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা
৬. বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা, ডিসেম্বর ১৮৬৮
৭. বাংলা দেশের কলেজে ইংরেজি শিক্ষণ, মার্চ ১৮৭৪
৮. পার্শিদের সম্বন্ধে, মার্চ, ১৮৭৫
৯. রেভারেন্ড ডাক্তার জন উইলসন, ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬

বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত :

১০. স্বর্গীয় বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র
১১. আমার ছাত্র-জীবনের স্মৃতি
১২. বাংলা দেশের সুবর্ণবণিক জাতি
১৩. ডাক্তার কেরীর জীবন ও সাধনা

এই প্রবন্ধগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন :

১. গোবিন্দ সামন্ত বা বাঙালি কৃষকের জীবন

এটি একটি উপন্যাস। ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে পুস্তকখানির রচনা সম্পূর্ণ হয়। শেষে আরো তিন অধ্যায় জুড়ে দিয়ে ১৮৭৪ সালের মাঝামাঝি 'বাঙালি কৃষকের জীবন' এই নামে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস লিখে লালবিহারী উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঘোষিত ৫০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

২. আলেকজান্ডার ডাফ স্মৃতি

লালবিহারীর শিক্ষা ও ধর্মগুরু ডাফ সাহেবের মৃত্যুর পর ১৮৭৮ সালে বইখানি লেখা ও ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি লালবিহারীর আত্মজীবনী।

৩. বাংলা দেশের রূপকথা

১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। যেসব গল্প শুনিয়ে একসময়ে বাংলার ঠাকুমা-দিদিমারা তাদের ছোট নাতি-নাতনিদের ভোলাতেন সেইসব গল্পের সংগ্রহ। এই গ্রন্থখানি লালবিহারীর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। গণমানুষের গভীরে যেসব আশা-আকাঙ্ক্ষা অব্যক্ত থাকে সেইগুলি অভিব্যক্ত হয় রূপকথার আকারে। বাংলা দেশের রূপকথা সংগ্রহ করে লালবিহারী বাঙালি গণমানসের সঙ্গে বাঙালি জাতির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই হিসাবে তিনিই বোধ হয় এযুগে বাংলা দেশের আদি লোক-সাহিত্যিক।

কালনা মিশনের সর্বাধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি শ্বেতাঙ্গ পাদরি সাহেবদের এদেশীয়দের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পরে সেই বক্তৃতাগুলি ছাপিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন *Searchings of Heart* এই বক্তৃতামালায়। তাঁর পূর্বে কোনো দেশি পাদরি বিলাতি পাদরিদের এমন কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে সাহসী হননি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পার্শি মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহের পরোক্ষ কারণ এই বইখানি। এই বইখানি পড়েই তাঁর ভাবী স্ত্রী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

আরেকটি কথা না-বলে লালবিহারী প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। সেটি হচ্ছে তাঁর স্বদেশ স্বজাতিপ্রীতি। বিদেশি ধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালি। বাংলা দেশ ও বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অগাধ। তাঁর তেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে নয়টি ও তিনটি গ্রন্থের

মধ্যে দুটি বাংলা ও বাঙালিকে নিয়ে লেখা। তাই বাঙালিমাত্রেরই কর্তব্য তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা। কিন্তু বাংলা মায়ের সন্তানদের মধ্যে যারা তাঁর সমস্ত হৃদয় ও চিন্তা অধিকার করে ছিল তারা হচ্ছে বাংলার পল্লীবাসী সরল, অনাড়ম্বর, দরিদ্র, নির্যাতিত কৃষক সমাজ। পল্লীসমাজ থেকে দূরে নির্বাসিত হয়েও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও এইসব 'মূঢ়মূক'-দের কথা ভোলেননি, এরা ছিল তাঁর পরম আত্মীয়। তাঁর যে কী গভীর মমতা ও সমবেদনা ছিল এই অবজ্ঞাত, অশিক্ষিত লোকগুলির প্রতি তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে 'গোবিন্দ সামন্ত'র পাতায় পাতায়।

'নীলদর্পণ' যদি হয় বাঙালি কৃষকের মহানাটক, 'গোবিন্দ সামন্ত' নিশ্চয়ই তাদের মহাকাব্য। বাংলার পল্লীসমাজের ও কৃষকজীবনের এমন সর্বাঙ্গীণ নিখুঁত ছবি তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো ভাষাতেই কেউ আঁকতে পারেননি। এ-ছবি একরঙা নয়, দোরঙা। চাষির জীবনে একদিকে যেমন আছে সুখ, আহ্লাদ, তেমনি অন্যদিকে আছে কষ্ট, অশান্তি; যেমন খেলাধুলা, নবান্ন, পৌষপার্বণ, তেমনি দেশি জমিদার ও বিদেশি কুঠিয়ালের শোষণ ও অকথ্য অত্যাচার। এ অবস্থায় কৃষকের প্রতিরোধ ও সংগ্রাম অনিবার্য। এই সংগ্রামকে তিনি কোথাও চাপবার বা এড়াবার চেষ্টা করেননি। শিল্পী হিসাবে নিরপেক্ষতার ভান তাঁর মধ্যে নেই। নির্যাতিতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। চাষিদের অপমানে নিজে অপমানিত বোধ করেন, তাদের উপর অত্যাচার হলে নিজের উপর অত্যাচার হচ্ছে মনে করে রাগে জ্বলে ওঠেন। তাদের হাজার দুর্বলতা তিনি ক্ষমা করতে পারেন, পারেন না শুধু একটি — কাপুরুষতা। যখনই তাদের মধ্যে বীরত্ব দেখেছেন আনন্দে, গর্বে তাঁর বুকে ফুলে উঠেছে। তাই তো বর্ধমান জেলার এক উগ্র-ক্ষত্রিয় চাষিপরিবারকে তাঁর গল্পের নায়ক করেছেন। কারণ তাঁর মতে সমস্ত বর্ধমান জেলায় উগ্র-ক্ষত্রিয়দের মতো এমন স্বাধীনচেতা, সাহসী বীর কৃষক সম্প্রদায় আর দ্বিতীয় নেই। 'গোবিন্দ সামন্ত' গ্রন্থটি পড়ে ১৮৮১ সালে জগৎ বিখ্যাত জীববৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন অযাচিতভাবে লালবিহারীর পুস্তক প্রকাশককে লিখেছিলেন, 'গ্রন্থকারকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন যে, "গোবিন্দ সামন্ত" পড়ে আমি যেমন শিক্ষা, তেমনি আনন্দ লাভ করেছি।'

দুঃখের বিষয় বিদেশি ভাষায় লেখা বলে এই কাহিনী যাদের নিয়ে লেখা তাদের কাছে আজ পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। সম্প্রতি এই বইখানির একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বইখানির তর্জমা বর্তমানে একটিও নেই; বাংলার কৃষকেরা যখন এই উপন্যাসের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হবে তখন নিজেদের জীবনের বাস্তব চিত্র দেখে একদিকে যেমন তারা খুশি হবে অন্যদিকে তাদেরই পূর্বপুরুষেরা একদিন এই দেশের মাটিতেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা জেনে প্রেরণা পাবে। তখন তারা লালবিহারীকে তাদের পরম বন্ধু বলে মানবে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল তাঁর নাম স্মরণ করবে। 'গোবিন্দ সামন্ত'র লেখককে আমরা ভুলতে পারি — তারা ভুলবে না কখনও।

পরিশিষ্ট

লালবিহারীর বংশধরদের বিষয়ে জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তাঁদের সম্বন্ধে যা জানা যায় সংক্ষেপে লেখা হল।

লালবিহারীর সর্বসমেত দশটি সন্তান হয়েছিল। তার মধ্যে পাঁচটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা। দুটি কন্যা ও একটি পুত্র শৈশবেই মারা যায়। বাকি তিনটি কন্যা বহুদিন বেঁচে ছিলেন। অবশিষ্ট

চারপুত্র যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে মারা যান। কিন্তু তাঁদের জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখ পাওয়া যায় নি। ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বড়ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যান ও ইউরোপে মারা যান। তিনি বিবাহ না-করায় তাঁর ধারা লুপ্ত। বাকি তিন ছেলে বিবাহ করেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র আবগারির ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন, তিনি দুমকায় মারা যান। তাঁর ইংরেজ স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তাঁরা বিলাতে থাকেন। তৃতীয় পুত্র পাটের ব্যবসা করতেন। তিনি ইংল্যান্ডে মারা যান। তাঁর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা আছেন, এঁরাও বিলাতে থাকেন। চতুর্থ পুত্র এখানে রেলে চাকরি করতেন, পরে বিলাতে মারা যান। তাঁর স্ত্রী রুমেনীয়, তাঁর সন্তানাদি হয়নি। কন্যাদের মধ্যে মাত্র সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহ করেন, বাকি দুটি কন্যা অবিবাহিত থাকেন। এখন কোনো কন্যাই জীবিত নেই। বড়মেয়ের বিবাহ হয় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মণিলাল স্যান্ডেলের সঙ্গে। তাঁর পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা হয়। তৃতীয় সন্তান কন্যা, বাকিসব পুত্র। প্রথম পুত্র, চতুর্থ পুত্র ও কন্যাটি জীবিত নেই। অবশিষ্ট তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয়টি অসুস্থ ও তৃতীয়টি দুঃস্থ। লালবিহারীর একমাত্র দৌহিত্র যিনি এখনও সুস্থ ও ভালোভাবে বেঁচে আছেন তাঁর নাম এন. এল. (নরম্যান লিওনার্ড) স্যান্ডেল। তিনি মার্টিন কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করতেন। মাতৃভাষা ইংরেজি হলেও বাংলা ভাষায় সুন্দর কথাবার্তা কইতে পারেন। লালবিহারীর বংশধরদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্যই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। তিনি অবিবাহিত, বয়স সত্তর বছর। লালবিহারীর বংশধরদের অনেকেরই ফোটো তাঁর কাছে আছে। তিনি কলকাতায় ২৯ ইলিয়ট রোডের বাড়িতে ১৯৫৩ সালের ৬ আগস্ট পর্যন্ত ছিলেন।

লালবিহারীর পার্শি স্ত্রী শ্রীমতী বাচুবাই দে ১৮৩৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯২৪ সালের ১ ডিসেম্বর ৮৬ বৎসর ৭ মাস বয়সে ২৯ ইলিয়ট রোডের বাড়িতে দেহত্যাগ করেন। ইনি মৃত্যুর পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী মেয়েদের জন্য লিখে রেখে যান। তাঁর মৃত্যুর পর এটি তাঁর মেয়েরা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি চতুর্থ ও পঞ্চম কন্যা নিয়ে কিছুকাল ২ বেনেপুকুর লেনের বাসায় থাকেন। পরে ২৯ ইলিয়ট রোডের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন।

শীল উপাধিধারী একজন সুবর্ণবণিক এই বাড়ির মালিক ছিলেন। এই ভদ্রলোক মারা যাবার পর অনুমান ১৯০৪-৫ সালে প্রায় ১৮০০০ টাকায় বাচুবাই তাঁর পুত্রের কাছ থেকে এই বাড়ি খরিদ করেন। এই বাড়িতেই তিনি ও তাঁর দুই কন্যা — কুমারী অ্যালিস (Alice) ও কুমারী হেলেন মারা যান। কুমারী অ্যালিস Official Trustee ও Administrator-General-কে তাঁর সম্পত্তির এক্সিকিউটার করে যান। এই বাড়িটি এতদিন Administrator-General-এরই তত্ত্বাবধানে ছিল। শ্রীযুক্ত এন. এল. স্যান্ডেল তাঁরই অনুমতিক্রমে এই বাড়িতে একা বাস করতেন। এই বৎসরের গোড়ার দিকে Administrator-General বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছেন। বিক্রির টাকা থেকে লালবিহারীর তিন পৌত্র, দুই পৌত্রী ও তিন দৌহিত্র মোট এই আটজন জীবিত উত্তরাধিকারী সমান অংশে ভাগ পাবেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লালবিহারীর জ্যেষ্ঠাকন্যার বিবাহ হয় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মণিলাল স্যান্ডেল এম. এ., বি. এল-এর সঙ্গে। মণিলালের জন্ম ১৮৪৪ সালের ১২ মার্চ, মৃত্যু ১৮৯৭ সালের ৯ জানুয়ারি। কলকাতার রিপন স্ট্রিটের মাঝখানে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল। সে-বাড়ি বিক্রি হয়ে গছে। মণিলালের পিতা ছিলেন রেভারেন্ড হরিহর স্যান্ডেল (জন্ম : ১৮২০ মৃত্যু : ১৮৮৭) ও মাতা রাইমণি স্যান্ডেল (জন্ম : ১৮২১ মৃত্যু: ১৮৯৩)। ইনি সাঁতরাগাছির

লাহিড়ী বংশের মেয়ে। এঁরা সবাই ছিলেন চার্চ অব ইংল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড প্রোটেস্ট্যান্ট সমাধিক্ষেত্রে এঁদের তিন জনেরই সমাধি বিদ্যমান। স্বামীর মৃত্যুর পর লালবিহারীর জ্যেষ্ঠাকন্যা, মাতা ও ভগিনীদের সঙ্গে ২৯ ইলিয়ট রোডের বাড়িতে কোনোদিন থাকেন নি। তিনি বিডন স্ট্রিটে একটি বাড়ি ভাড়া করে স্বতন্ত্রভাবে বাস করতেন। এই বাড়িতেই তিনি মারা যান।

লালবিহারী দে-এর পূর্বপুরুষগণ

১. বৈষ্ণবচন্দ্র মণ্ডল
(বর্ধমান জেলার সোনাপলাশি গ্রামে বাস)

২. খেলারাম দে মণ্ডল
(ঐ গ্রামে বাস)

৩. গোকুলচন্দ্র দে মণ্ডল
(বর্গীর হাঙ্গামার সময় আনুমানিক ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে স্বগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে যান)

৪. গোলোকচন্দ্র দে মণ্ডল
(১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে সোনাপলাশি গ্রামে ফিরে আসেন)

৫. কমললোচন

রাধাকান্ত
(জন্ম ঢাকায় আনুমানিক ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে পিতার সঙ্গে সোনাপলাশি গ্রামে ফিরে আসেন। দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ করেন ঢাকায়। সেই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। স্ত্রী ও পুত্র দুটি ঢাকায় মারা যায়। দ্বিতীয় বিবাহ করেন স্বগ্রামে। এই স্ত্রীর জন্ম আনুমানিক ১৮০৮)

বেণীমাধব

লালবিহারী দে
(ইনি মণ্ডল উপাধি ত্যাগ করেছিলেন)
জন্ম : ১৮. ১২. ১৮২৪, মাতুলালয়ে
মৃত্যু: ২৮. ১০. ১৮৯৪, কলকাতায়

বনমালী দে মণ্ডল
(লালবিহারীর জীবদ্দশাতেই ইনি মারা যান)
+ভগবতী দাসী

লালবিহারী দে-এর বংশধরগণ

লালবিহারী দে (কন্যাগণ)
+বাচুবাই দে
৬
কন্যা
মিসেস মেরি ম্যাকে স্যান্ডেল
(১৮৬০-৩০.৯.১৯৪৪)
৭
কন্যা
অ্যালিস হরমুশজী দে
(১৮.১১.১৮৬১-
১.২.১৮৬৪)
৮
কন্যা
মারিয়া মিচেল দে
(১৭.৫.১৮৬৫-
২০.৩.১৮৬৬)
৯
কন্যা
কুমারী অ্যালিস বাচুবাই দে
(১৮.১১.১৮৭৩-
নভেম্বর ১৯৫০)
১০
কন্যা
কুমারী হেলেন পরেশমণি
রতনবাই দে
(২৩.১১.১৮৭৬-২৮.৬.১৯৩৬)
+মণিলাল সান্ডেল
এম. এ. বি. এল.
(১২.৩.১৮৪৪-৯.১.১৮৯৭
কলকাতা হাইকোর্টের উকিল)

১
পুত্র
আর এল. এ.
সান্ডেল (মৃত)
২
পুত্র
নর্মান লিওনার্ড সান্ডেল
(মার্টিন কোম্পানির
ইঞ্জিনিয়র, অবিবাহিত। জীবিত,
বয়স সত্তর)
৩
কন্যা
কুমারী জেসিকা
অগাস্টা
সান্ডেল (মৃত)
৪
পুত্র
হ্যারল্ড লায়োনেল
সান্ডেল (জীবিত, বয়স
চৌষট্টি বছর)
৫
পুত্র
জেমস লিউইস সান্ডেল
(মৃত)
৬
পুত্র
টমাস জর্জ
সান্ডেল (জীবিত
বয়স ষাট বছর)

হরিনাথ দে

বংশ-পরিচয় ও পূর্বকথা

আমি হরিনাথ দে-র জীবনী লিখতে বসিনি। ছয়-সাত মাস আগে হরিনাথ দে-র জন্মশতবার্ষিকী পালিত হল। সেই উপলক্ষে দেরিতে হলেও, এই লেখা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন। আমি এখানে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের ঘটনাবলীর মাত্র রূপরেখা দেব। আমার প্রধান উদ্দেশ্য তাঁর পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল ও তাঁর নিজের পুত্রকন্যার এবং তাঁর পিতার আশ্রয়দাতা ভঞ্জদের বংশতালিকা দেওয়া যা এর আগে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

হরিনাথ দে-র পিতা ছিলেন ভূতনাথ দে। ভূতনাথ দে-র পিতামাতার নাম কেউ জানে না। তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল তাও অজানা। অনুমান করা হয় যে তাঁর নিবাস ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহড়ু (বড়ু) গ্রামে কিংবা তারই কাছাকাছি আর-কোনো গ্রামে। বহড়ু গ্রাম বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা লাইনে, উত্তরে দক্ষিণ বারাসাত ও দক্ষিণে জয়নগর-মজিলপুরের মধ্যে অবস্থিত। বহড়ুগ্রাম কায়স্থপ্রধান গ্রাম। এখানে বসু, মিত্র, ভঞ্জ ইত্যাদি উপাধিধারী কুলীন ও মৌলিক কয়েকটি কায়স্থ বংশের বাস।

বহড়ু গ্রামের জমিদার বংশের আদিপুরুষ ছিলেন দেওয়ান নন্দকুমার বসু। প্রথম জীবনে তিনি স্বনামধন্য রামদুলাল সরকারের সঙ্গে 'শিপ-সরকার' ছিলেন। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীরে পরপর কাশিমবাজার রেশমকুঠি, পাটনা আফিমকুঠি ও কলিকাতার কাস্টমস হাউসের দেওয়ান হন। শেষ জীবনে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবুর মতো বৃন্দাবনবাসী হন। বৃন্দাবনে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের নতুন মন্দির তৈরি করে দেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনেই তিনি দেহরক্ষা করেন। নন্দকুমারের বংশে জন্মান রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু। তিনি একাধারে নাটক রচয়িতা ও দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৫. ৬. ১৯১৯ তারিখে। তাঁর পুত্র জানকীনাথ বসুও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতার মানিকতলা স্ট্রিটে বৈকুণ্ঠনাথ বসুর বাড়ির দক্ষিণ অংশ কিনে সেই জমিতে বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক যতীন্দ্রনাথ মৈত্র নিজের বাড়ি তৈরি করেন।

হরিনাথ দে-র পিতা ভূতনাথ দে-র প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে তিনি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। বহড়ু গ্রামের দ্বিতীয় বিখ্যাত

বংশ হচ্ছে ভঞ্জ বংশ। এঁরা দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থদের বাহাত্তর ঘরের মৌলিক কায়স্থ। এই বংশের দ্বারকানাথ ভঞ্জ দয়াপরবশ হয়ে বালক ভূতনাথকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে পুত্রের মতন মানুষ করেন। কী সূত্রে ভূতনাথের সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় হয় তা জানা যায় না। ভূতনাথ ছিলেন দ্বারকানাথের চেয়ে ২২ বছরের ছোট। ভূতনাথের বাল্য ও যৌবনের খানিক অংশ প্রথমে বোধ হয় বহড়ু গ্রামে, পরে কলিকাতায় ভঞ্জদের বাড়িতেই কাটে। দ্বারকানাথ ভঞ্জ কলিকাতায় ১০ রঘুনাথ চাটুজে স্ট্রিটে ১৮৫৪ সালে বাড়ি করেন। এই বাড়ি থেকেই ভূতনাথের বিবাহ হয় উত্তর চব্বিশ পরগনার আড়িয়াদহ গ্রামে উমাচরণ মিত্রের ছোটমেয়ে এলোকেশীর সঙ্গে। রঘুনাথ চাটুজ্যে স্ট্রিটের বাড়িতে দ্বারকনাথের বংশধরেরা এখনও বাস করছেন।

দ্বারকনাথ ভঞ্জের ছোটভাই হরনাথ ভঞ্জ লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন। 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' এই নামে দুই খণ্ডে এক বই লেখেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সালে ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮২ সালে।

ভূতনাথ দে ওকালতি পাশ করে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন। তিনি কালক্রমে সেখানে পাবলিক প্রসিকিউটর ও গভর্নমেন্ট প্লিডার হন। গভর্নমেন্ট তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধি দেন। রায়পুরে তাঁর সঙ্গে আইন ব্যবসা করতেন দুজন ব্যারিস্টার — তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি প্রিয়ংবদা দেবীর স্বামী ও ব্যারিস্টার শ্রী শঙ্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যাঠা এবং প্যারীচরণ সরকারের মেজছেলে যোগীন্দ্রনাথ সরকার। সেই সময়ে রায়পুরের পাশের জেলা বিলাসপুরে অ্যাটর্নিগিরি করতেন স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত।

রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে ১৯০০ সালে ৫৫ বছর বয়সে ওকালতি ত্যাগ করে কলিকাতায় আসে এবং ৩০ বাহির মির্জাপুর রোডে স্ত্রীর নামে বাড়ি তৈরি করে বাস করেন। তিনি রায়পুরে থাকতেই সেখানে একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। দেওঘরেও একটা বাড়ি ছিল তাঁর। কলিকাতার পৈতৃক বাড়িতেই হরিনাথ দে বাস করেন ১৯০৭ সালের শেষ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। হরিনাথের মৃত্যুর ২-৩ বছর পরেই তাঁর মা এলোকেশী দেনা শোধ করবার ভয়ে এই বাড়ি বিক্রি করে দেন। এই বাড়িতে পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮-১০ বছর ভাড়া ছিলেন। এখন বাড়ির নম্বর হচ্ছে ৩১ ও রাস্তার নাম হয়েছে হরিনাথ দে রোড, যদিও বাড়ির প্রবেশদ্বার ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রিটের ওপর। বর্তমানে এই বাড়ির মালিক হচ্ছেন 'কালিকা টাইপ ফাউন্ড্রি' নামে বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

হরিনাথ দে-র মা বিদুষী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষা ছাড়া ইংরেজি, হিন্দি ও মারাঠি ভাষা জানতেন। কিন্তু তিনি পুত্রের প্রতি তত সদয় ছিলেন না। তিনি বেশিরভাগ সময় হয় রায়পুরের বাড়িতে অথবা দেওঘরের বাড়িতে বাস করতেন।

হরিনাথ দে কলকাতার পৈতৃক বাড়িতে বাস করতে যাবার আগে প্রায় আড়াই বছর আরেকটি বাড়িতে বাস করেছিলেন। সেটা হচ্ছে ৭৮ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়ি। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হয়ে আসেন ৮. ২. ১৯০৫ তারিখে। ওই সময় থেকে ১৯০৭ সালের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি এই বাড়িতে বাস করেছেন। এই বাড়িতেই রুশদেশীয় বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত F. I. Scherbatskoy ও চীনা উপ-প্রধানমন্ত্রী হরিনাথ দে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হরিনাথ দে এখান থেকে চলে যাবার পর এই বাড়িতে থাকেন ঢাকা জেলায় মালখানগরের সত্যানন্দ বসু (ঠাকুর)।

১৮৯৫ সালে হরিনাথ দে শরৎশোভা বসুকে বিবাহ করেন। শরৎশোভার পিতা ছিলেন কলিকাতার গরাণহাটার বসু বংশের নন্দলাল বসু ও মা ছিলেন কবি সাংবাদিক কাশীপ্রসাদ ঘোষের (হেদোর উত্তর ধারে প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়ির মালিক) বংশধর গয়াপ্রসাদ ঘোষের ভগিনী। গয়াপ্রসাদ হরিনাথ দে-র মামাশ্বশুর হলেও অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অভিন্ন সঙ্গী ছিলেন। হরিনাথ দে-র শ্বশুর গ্রীক সওদাগরি অফিস পেট্রো-কোচিনের খাজাঞ্চি ছিলেন। কানে কালা ছিলেন বলে লোকে তাঁকে বলত কালানন্দ। তিনি ১০ গোকুল বড়াল স্ট্রিটে বাস করতেন।

জন্মকথা ও শিক্ষা-অর্জনের পর্ব, চাকরি জীবন

আড়িয়াদহ গ্রামে মামার বাড়িতে ১২. ৮. ১৮৭৭ তারিখে হরিনাথের জন্ম। বছরখানেক মামার বাড়িতেই থাকেন। তারপর মা তাঁকে রায়পুরে বাবার কাছে নিয়ে যান। তখন রেল হয়নি, গোরুর গাড়িতে করে যেতে হত। সে-যাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবীও এলোকেশীর সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি যাচ্ছিলেন বিলাসপুরে স্বামী বিশ্বনাথ দত্তের কাছে।

হরিনাথ দে-র প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে। তারপর রায়পুরে মিশন স্কুলে। তিনি অঙ্কে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বরাবরই কাঁচা ছিলেন। ১৮৮৭ সালে রায়পুরের নর্মাল স্কুল থেকে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর সেখানকার সরকারি হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯০ সালে ওই স্কুল থেকে মিডল স্কুল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে ছাত্রবৃত্তি পান। ১. ৫. ১৮৯১ তারিখে কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সেই সময় পিতা তাঁকে রিপন স্ট্রিটে McGraw নামে এক সাহেবের কাছে রাখেন। ১৮৯২ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

১৮৯৪ — সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পাশ করে একটা সাধারণ স্কলারশিপ ও ভাষায় প্রথম হওয়ায় ডাফ স্কলারশিপ পান।

১৮৯৬ — প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় দুই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে পাশ করেন। ল্যাটিন অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। মাসিক চল্লিশ টাকার একটি ছাত্রবৃত্তি পান।

ওই বছরেই প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাটিন ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন ও একটি সুবর্ণপদক পান। তিনি ওই বিষয়ে এত নম্বর পেয়েছিলেন যে সে-পর্যন্ত আর-কেউ তত নম্বর পায়নি।

১৮৯৭—এপ্রিল মাসে বিলেতে যান। জুলাই মাসে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। ১৫ নভেম্বর বিলেত থেকে বিশেষ অনুমতি পেয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাষায় পরীক্ষা দেন। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ও স্বর্ণপদক পান। অধ্যাপক টনি সাহেব তাঁর পরীক্ষক ছিলেন।

প্যারিসে Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত অ্যাসিরিয় ভাষার পণ্ডিত J. Menant-এর তত্ত্বাবধানে অ্যাসিরিয় ভাষা অধ্যয়ন করেন।

১৮৯৮ — ভারত গভর্নমেন্ট তাঁকে বছরে ২০০ পাউন্ড হিসাবে তিন বছরের জন্য State Scholarship দেন।

কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনার জন্য চ্যান্সেলারের সুবর্ণপদক পুরস্কার পান।

ইজিপ্টে কিছুদিন থেকে উচ্চ আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। জার্মানির মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা শিক্ষার আধুনিক প্রণালী শিক্ষা করেন।

১৮৯৯ — কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজের সিনিয়র ক্ল্যাসিকাল স্কলার নির্বাচিত হন।

১৯০০ — কেম্‌ব্রিজের ক্ল্যাসিকাল ট্রাইপসের প্রথম ভাগ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপক কাওয়েলের কাছে সংস্কৃত ও অধ্যাপক বেভন ও রিউর কাছে আরবি ভাষা অধ্যয়ন করেন।

১৯০১ — কেম্‌ব্রিজের মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাসমূহের ট্রাইপস পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করেন।

ইংরেজি সাহিত্যে স্কীট পুরস্কার পান।

অধ্যাপক বেভন, রিউ ও কাওয়েল তাঁকে অ্যালেন গবেষণা ছাত্রবৃত্তির জন্য সুপারিশ করেন।

গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন।

১ ডিসেম্বর — ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট তাঁকে ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে নিযুক্ত করেন।

৭ ডিসেম্বর — ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন।

৩.৬.১৯০৩ — কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সদস্য নির্বাচিত হন।

৮.২.১৯০৫ — ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন।

সংস্কৃত, আরবি ও ওড়িয়া ভাষায় হাই প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষা দিয়ে যথাক্রমে ২০০০ টাকা, ২০০০ টাকা ও ১০০০ টাকা পুরস্কার পান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও মুসলিম ইনস্টিটিউটের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯০৬ — বর্ধমানের মহারাজার দোভাষী হয়ে দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাত্রা করেন।

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

৬ নভেম্বর — অধ্যক্ষ রূপে হুগলি কলেজে যোগ দেন।

১৯০৭ — ২৩ ফেব্রুয়ারি কলিকাতার Imperial Library-র লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ইনি দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিক। প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সহকারী গ্রন্থাগারিক জন ম্যাকফারসন্ (১৯০৩-১৯০৬)। এপ্রিল মাসে Calcutta Historical Council-এ (পরিষদে) নির্বাচিত হন।

আরবি ভাষায় ডিগ্রি অব অনার প্রথম বিভাগে পাশ করে ৫০০০ টাকা পুরস্কার পান।

১৯০৮ — প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যে 'এ' ও 'ই' গ্রুপে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রত্যেক গ্রুপে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

৯. ৩. ১৯১১ তারিখে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির পরিচালকসভা তহবিল তছরূপ, কর্তব্যে অবহেলা প্রভৃতি ১৪ দফা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনেন। ৬. ৫. ১৯১১ তারিখে তিনি ওই অভিযোগের উত্তর দেন। লাইব্রেরির পরিচালক সভার চারজন সদস্যের উপর ওই উত্তর পরীক্ষা করার ভার দেওয়া হয়। এই চারজন ছিলেন — কলিকাতার লর্ড বিশপ (প্রেসিডেন্ট), জজ স্যার আশুতোষ মুখার্জী, মিস্টার এ. আর্ল ও ড. এডওয়ার্ড ডেনিসন রস। সর্বসম্মতিক্রমে হরিনাথকে কর্মচ্যুত (ডিসমিস) করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদ থেকে ও ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস থেকে বরখাস্ত হন।

জীবনাবসান

১৫. ৮. ১৯১১ তারিখে হরিনাথের টাইফয়েড হয়। নীলরতন সরকার, প্রাণধন বোস প্রমুখ কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁর চিকিৎসা করেন। তাঁদের সব চেষ্টা বিফল হয়। ৩০. ৮. ১৯১১ তারিখে হরিনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেইদিনই নিমতলা শ্মশানে তাঁর দেহ দাহ করা হয়। একজন দিকপালের পতন হল, কিন্তু কলিকাতার লোক টেরই পেল না। কলিকাতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারো মুখে একটু শোকের চিহ্ন বা চোখে একফোঁটা জল দেখা গেল না।

কিন্তু এ-রকম লোক মরেও মরেন না। হরিনাথ দে অমর। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্‌রূপে চিরকাল স্মরণে থাকবেন। তিনি মাত্র ৩৪ বছর বেঁচেছিলেন। এই ৩৪ বছরের মধ্যে তিনি ৩৪টি ভাষা ভালো করে শিখেছিলেন। সেই ভাষাগুলি হল:

ভাষাশাস্ত্রী হরিনাথ
ইউরোপীয়ান ভাষা

গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, ওল্ড ফ্রেঞ্চ, প্রভেসাল, পর্তুগিজ, রুমানিয়ান, ডাচ, ড্যানিশ, অ্যাংলো-স্যাক্‌সন, গথিক, ওল্ড এবং মিডল হাই জার্মান, ইংরাজি (১৬)।

এশিয়াটিক ভাষা

সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠি, গুজরাটি, হিব্রু (বিব্‌লিক্যাল), চীনা (ক্লাসিক্যাল), তিব্বতী (ক্লাসিক্যাল), তুর্কি, জেন্দ, জাপানি, বর্মী, সিংহলী, (১৮)।

আমার মনে হয় একটি ভাষা উপরের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে — সেটি আর্মেনিয়ান

ভাষা। হরিনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বোর্ড অফ স্টাডিজ-এর সদস্য ছিলেন— গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান, সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, ও আর্মানি। অথচ উপরের দুটি ভাষার তালিকার কোনোটাতেই আর্মানি ভাষার নাম নেই। এই ভাষাটিকে যোগ দিলে হরিনাথ দে মোট ৩৫টি ভাষা জানতেন।

এখানে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বহু ভাষাবিদ্‌দের অন্তত কয়েকজনকে স্মরণ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইউরোপের — Leibnitz (গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক), William Humboldt, Baron Bunsen, Cardinal Mezzofanti, Jonadal (মরক্কোর ইহুদি), Picco della Mirandola, Niebhur, Sir John Bowring, Elihu Burrit, Sir William Rowan Hamilton, এবং সেইসব জার্মান, ফরাসি, ইংরেজ, ইতালীয় ও রুশীয় পণ্ডিত যাঁরা প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ বা প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ বলে পরিচিত। এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই শুধু সংস্কৃতই জানতেন না, সংস্কৃত ছাড়া আরবি, ফার্সি, ইত্যাদি অনেক এশীয় বা প্রাচ্য ভাষাও জানতেন। তাঁদের সংখ্যা এত বেশি যে প্রত্যেকের নাম করতে গেলে তালিকা প্রকাণ্ড হবে। সুতরাং আমি তাঁদের নাম এখানে দিলাম না।

এইসব প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজন ভারতবর্ষে এক বা একাধিকবার এসেছেন, কিছুদিন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, বা কোনো কোনো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তারপর আবার স্বদেশে ফিরে গেছেন।

আবার কতকগুলি ইউরোপীয় মিশনারি ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসে দীর্ঘকাল এদেশে বাস করে গেছেন — কেউ কেউ এদেশের মাটিতেই দেহরক্ষা করেছেন। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা শিখে এদেশে এসেছিলেন ও এদেশে দীর্ঘকাল থাকার ফলেই হোক অথবা এশীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের তাগিদেই হোক, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন।

প্রথমে এসেছিলেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত জেসুইট পাদরি। প্রধানত দক্ষিণ ভারত তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল। তাঁরা সংস্কৃত ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষা শিখেছিলেন। এঁদের কয়েকজনের নাম মাত্র উল্লেখ করলাম — Robert de Nobili, R. C. Beschi, Heinrich Nolh, Hauxladen, Jean Philippe Werdin (ইনি Father Paulinus নামে বেশি পরিচিত), Antequil Du Perron ও Rask (Rasmus Christen)।

এঁদের পরে এলেন প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা। এঁদেরও কর্মক্ষেত্র প্রথমে ছিল দক্ষিণ ভারত তারপর উত্তর ভারতে। দক্ষিণ ভারতের বড় তিনজন মিশনারি ছিলেন Schwartz, Ziegenbalg ও Caldwell এবং উত্তর ভারতের শ্রীরামপুরের চারজন Willam Carey, Joshua Marshman, Felix Carey ও William Yates। এই চারজনই ব্যাপটিস্ট পাদরি ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় ভাষা শিখেছিলেন উইলিয়াম কেরী। আর-একজন ছিলেন বিশপস্ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. W. H. Mill। ইনি ছিলেন অ্যাংলিকান পাদরি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারীরাও পিছিয়ে রইলেন না। তাঁরাও সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শিখলেন — যেমন, Nathaniel Brassy Halhead, তাঁর ভাইপো Nathaniel John Halhead, Sir Charles Wilkins, Henry Thomas Colebrooke, Horace Hayman Wilson, Sir William Jones, E. B. Cowell, John Beams। এঁদের মধ্যে Sir Wiliam Jones সবচেয়ে বেশি প্রাচ্য ভাষা শিখেছিলেন।

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদের সকলেই ও ছাত্রদের অনেকেই বহু প্রাচ্য ভাষায় প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, যেমন, Gilchrist, Edmonstone, Malcolm, Macnaughten, Jenkins, Bayley, Lumsden, James Princep, John Herbert Harringtor ও F. A. Gladwin।

কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির তিনজন সদস্য Francis Wilford, Dr. John Leyden ও Csoma de Koros (হাঙ্গেরীয়) অনেকগুলি প্রাচ্য ভাষা শিখেছিলেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার কয়েকজন অধ্যক্ষও বহু প্রাচ্য ভাষা জানতেন — যেমন, Dr. Aloys Sprenger, M. D. William Nassau Lees, Blockman, Hoernle, Denison Ross।

বাঙালিদের মধ্যেও কয়েকজন অনেকগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন, যেমন, রামমোহন রায়, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্যামাচরণ সরকার, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নীলরত্ন হালদার, আনন্দকৃষ্ণ বসু, প্রিয়নাথ সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রবি দত্ত, ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী।

উপরে যেসব বহুভাষাবিদদের নাম করা হল তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ হলেন ইতালিদেশীয় রোমান ক্যাথলিক Giuseppe Mezzofanti (১৭৭৪-১৮৪৯)। তিনি ৭৫ বছর বেঁচে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি নাকি সবসুদ্ধ ১১৪টি ভাষার সঙ্গে পরিচিতি হন ও একমতে ৭৮টি ভাষা ও অন্যমতে ৫৮টি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। হরিনাথ দে মাত্র ৩৪ বছর বেঁচে ছিলেন। তার মধ্যেই তিনি ৩৫টি ভাষা ভালোরকম আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি যদি মেতসোফ্যান্টির মতো ৭৫ বছর বাঁচতেন তাহলে তিনি সবসুদ্ধ কতগুলি ভাষা শিখতে পারতেন তা ঠিক বলতে পারা না-গেলেও অনুমান করতে বাধা নেই। Jonadal ২৮টি ভাষা জানতেন। Picco dela Mirandola ১৮ বছর বয়সে ২২টি ভাষা শিখেছিলেন।

Sir William Jones মোট ২৮টি ভাষা জানতেন। তারপর Niebhur, Sir Jonn Bowring, Elihu Burrit ও Csoma de Koros প্রত্যেকে ১৮ থেকে ২০টি ভাষা জানতেন। Dr. John Leyden জানতেন ২০টি ভাষা। আয়ারল্যান্ডের Sir William Rowan Hamilton (১৮০৫-৬৫) ১৩ বছর বয়সে ১৩টি ভাষা শিখেছিলেন আর ১৭ বছর বয়সে একজন উঁচুদরের গণিতজ্ঞ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ডাবলিনে ট্রিনিটি ছাত্র থাকাকালীন ১৮২৭ সালে ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ও আয়ারল্যান্ডের রাজকীয় জ্যোতিষী নিযুক্ত হন।

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বেশি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে মিরাণ্ডোলা ও রাওয়ান হ্যামিলটন, হরিনাথ দে-র চেয়েও বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এঁদের কেউই মোট ভাষা হরিনাথ দে-র চেয়ে বেশি শেখেননি।

বাঙালি ভাষাবিদ্‌দের মধ্যে কে কত ভাষা শিখেছিলেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। আমি কয়েকজনের মোটামুটি একটি হিসাব দাঁড় করিয়েছি। অন্যদের বেলায় কোনো হিসাবই পাইনি। আমার হিসেবে কিছু ভুল থাকা অসম্ভব নয়।

হরিনাথ দে-র পরেই নাম করতে হয় অমূল্যচরণ (ঘোষ) বিদ্যাভূষণের। তিনি মোট ২৬টি ভাষা জানতেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি মোট ক'টা ভাষা জানতেন জানি না। তবে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের চেয়ে বেশি না-জানলেও, নেহাত কম জানতেন না বলে আমার ধারণা। রামমোহন রায় ৭টি, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০টি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র অন্তত ১০টি, মাইকেল মধুসূদন ১৩-১৪টি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৮টি, আনন্দকৃষ্ণ বসু ৯টি, শ্যামাচরণ সরকার ৯টি ও রেভারেন্ড লালবিহারী দে ৮টি ভাষা জানতেন। প্রিয়নাথ সেন ও রবি দত্ত প্রত্যেকে কতগুলি ভাষা জানতেন তার হিসেব কোথাও নেই। সৈয়দ মুজতবা আলী নাকি ২৫টি ভাষা জানতেন। আর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কতগুলি জানতেন তা বলা শক্ত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভাষাজ্ঞানে কার্ডিনাল মেতসোফ্যান্টির পরেই হরিনাথ দে স্বদেশি ও বিদেশি ভাষাচার্যদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন।

হরিনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স থেকে এম. এ. পর্যন্ত পরীক্ষায় গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, পালি, ইংরেজি, আরবি ও ফারসি ভাষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন।

৩৪ বছর বয়সের মধ্যে ৩৫টি ভাষা শিক্ষা করা অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। তাঁর স্মৃতিশক্তি শুধু অসাধারণই নয়, সত্যিই অবিশ্বাস্য ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অভিধান ২-৩ বার পড়লেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। যে-কোনো সময়ে সেইসব অভিধান পাতার পর পাতা অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। একবার যা পড়তেন ভুলতেন না। একটা সম্পূর্ণ নতুন ভাষার ব্যাকরণ এক থেকে দু-সপ্তার মধ্যে পড়ে শেষ করতে পারতেন। আর তাঁকে কখনও সে ব্যাকরণের পাতা ওল্টাতে হত না। আর যে-ভাষা শিখতেন সেই ভাষা নাকি সেই দেশের লোকের মতো বলতে পারতেন। কেউ ধরতে পারত না যে তিনি বিদেশি কিংবা সেই ভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয়। এক একটা নতুন ভাষায় সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়েছেন ২-৩ মাসের মধ্যে। যতই শক্ত ভাষা হোক সেই ভাষায় সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিতে তাঁর ছ'মাসের বেশি সময় লাগেনি।

রচনা-পরিচিতি

অনেকে অনুযোগ করে থাকেন তিনি তো এত ভাষা শিখলেন, এত পড়লেন, এত জানলেন, কিন্তু মৌলিক রচনা তো কিছু রেখে গেলেন না আমাদের জন্য। তার উত্তর এই — দেশ-বিদেশের ৩৪-৩৫টি ভাষা আয়ত্ত করতেই তো মাত্র ৩৪ বছর কেন, একটা সুদীর্ঘ জীবনেও কুলোয় না। তিনি মাত্র ৩৪ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে এই অসাধ্য সাধন করেছেন। এই ৩৪-৩৫টি ভাষা শিক্ষা ছাড়া তিনি যদি আর কিছু না-ও করতেন, এক লাইন না-ও লিখে যেতেন, তাতেও আমাদের বলবার কিছু থাকত না। কিন্তু তিনি লেখালেখির দিক থেকেও কিছু কম কাজ করে যাননি। আমি মাত্র তাঁর প্রধান কতকগুলি কাজের কথা এখানে উল্লেখ করছি।

তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সম্পাদনা করেছেন। যেখানে আবশ্যক হয়েছে নিজে

টীকা-টিপ্পনী যোগ করেছেন। ১. লঙ্কাবতারসূত্র ২. নির্বাণ ব্যাখ্যাশাস্ত্রম্ ৩. সুত্তপিটক, খুদ্দক নিকায় ৪. তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গী ৫. শাহ্-আলম-নামা ৬. মেকলের মিল্‌টনের উপর প্রবন্ধ ৭. মেকলের গোল্ডস্মিথের জীবনী ৮. স্যার ওয়াল্টার স্কটের 'ওয়েভার্‌লি' উপন্যাসগুলি থেকে চয়নিকা।

তাছাড়া বিভিন্ন ভাষা থেকে তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন অনেক। কয়েকটির উল্লেখ করছি :

১. নাগার্জুনের মাধ্যমিককারিকার পঞ্চম অধ্যায়, আচার্য কুমারজীবের মূল চীনা ভাষা থেকে অনুবাদ ;
২. নাগার্জুনের মাধ্যমিককারিকার ষড়বিংশ অধ্যায়, আচার্য কুমারজীবের চীনা ভাষা থেকে অনুবাদ ;
৩. সুত্তপিটক খুদ্দকনিকায় থেরিগাথা 'সুভার প্রলোভন' ;
৪. তারানাথের ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। মূল তিব্বতী ভাষা থেকে অনুবাদ ;
৫. সুত্তনিপাতের ধনিয়াসুত্ত ছন্দে অনুবাদ ;
৬. ইবন্ বতুতার আরবি থেকে 'বাংলার বর্ণনা'-অংশের অনুবাদ ;
৭. হাফেজ-এর ফারসি থেকে 'সুলতান গিয়াসউদ্দিনের প্রতি' কবিতার অনুবাদ ;
৮. কালিদাসের 'শকুন্তলা'র প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের ছন্দে অনুবাদ ;
৯. পুশকিনের গল্পের রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ ;
১০. লারমন্তফের কবিতা রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ ;
১১. লেপার্ডির কবিতার মূল ইতালীয় থেকে অনুবাদ ;
১২. বেনেঘিলের কবিতার ফরাসি ভাষা থেকে অনুবাদ।

এছাড়া বিদ্যাপতির অনেক বিখ্যাত পদও তিনি অনুবাদ করছেন।

অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজিনী বসু, রানী মৃণালিনী ও প্রিয়ম্বদা দেবীর বাংলা থেকেও তিনি অনেক অনুবাদ করেছেন। অমৃতলালের 'বাবু', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্', মাইকেলের 'আশার ছলনে ভুলি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া দা ফানো নামে একজন ইতালীয় সন্ন্যাসীর সংগৃহীত তিব্বতী-ল্যাটিন শব্দকোষ, সুবন্ধুর বাসবদত্তার অনুবাদ ও সুবন্ধুর কাল-সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

প্যালগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি'-র উপর ও ওয়েবের কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে নির্বাচিত কবিতাবলির উপর তাঁর নোট বা টীকাও উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং উপরের তালিকার উপর চোখ বোলালে এ-অভিযোগের কোনো ভিত্তি থাকে না যে, হরিনাথ ভাষা শিক্ষা ছাড়া আর-কিছুই করেননি।

ঢাকা কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হুগলি কলেজে হরিনাথের কাছে ইংরেজি সাহিত্য পড়েছেন এমন ছাত্রের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তাঁর কাছে বিভিন্ন ভাষা শিখেছেন এমন ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। এদিক থেকে ব্যারিস্টার অরুণ সেন ছিলেন তাঁর প্রধান ছাত্র। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত, অন্যদিকে তেমনি ছিল তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলায়

অসামান্য জ্ঞান। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললিতকলার প্রথম অধ্যাপক। তাঁর ও আমার মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল চল্লিশ বছরেরও উপর। তিনি মারা গেছেন ৮. ৩. ১৯৬৮ তারিখে ৮১ বছর বয়সে। শ্রীমান সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বাংলা ভাষায় হরিনাথ দে-র জীবনী লিখেছেন তাঁকে আমি-ই অরুণ সেনের কাছে নিয়ে যাই। অরুণ সেন হরিনাথ দে-র কাছে মাত্র ২টি ভাষা শিখেছিলেন — গ্রীক ও ল্যাটিন। এই দুই ভাষায় তাঁর হাতেখড়ি হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এক জার্মান অধ্যাপকের কাছে আর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় হরিনাথ দে-র কাছে। তাঁর কাছ থেকে হরিনাথ দে সম্বন্ধে এত গল্প শুনেছি যে তা লিখতে গেলে একটা ছোটখাটো বই হয়ে যাবে। সুতরাং তা থেকে বিরত রইলাম। অরুণ সেনকে বাদ দিলে হরিনাথ দে-র কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। হরিনাথ প্রসঙ্গে তাই তাঁর নাম উল্লেখ করলাম।

এতক্ষণ পণ্ডিত হরিনাথ দে সম্বন্ধে বললাম, এখন মানুষ হরিনাথ সম্বন্ধে কিছু বলি।

হরিনাথ লম্বায় মাঝারি ধরনের ছিলেন। মুখ গোল ও ভরাট। মাথাটা খুব বড়। ঘাড় সহজে ফেরাতে পারতেন না। ধীরে ধীরে হাঁটতেন। মুখের মধ্যে একটা ছেলেমানুষি ভাব ছিল। বাইরে থেকে তাঁকে গম্ভীর দেখালেও তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন না, খুব ফূর্তিবাজ ছিলেন। ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে কত রকমের রগড়, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাসি-ঠাট্টা, হৈ-হুল্লোড় এমনকী জড়াজড়ি করে নাচানাচি পর্যন্ত করতেন। সে-অবস্থায় তাঁকে দেখলে কেউ মনেই করতে পারতেন না যে তিনি এত বড় পণ্ডিত। মস্তিষ্কের চর্চা করে তিনি মস্তিষ্ক সর্বস্ব হননি। তাঁর অন্তরকে তাজা ও সরস রেখেছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হত প্রয়োজনের খাতিরে। নিজে থেকে তিনি তাঁদের সঙ্গ চাইতেন না। তাঁর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল। তারা অতি সাধারণ মানুষ, কেউ পণ্ডিত ছিলেন না। লেখাপড়া তাদের ছিল যৎসামান্য। অসাধারণ হয়েও তিনি সাধারণ লোকের সঙ্গে অতি সাধারণভাবে মেলামেশা করতে পারতেন। বেশভূষার পারিপাট্য, বাহ্য-চালচলন কিছুই ছিল না। বাড়িতে সাদা মোটা ধুতি ও চটিজুতা পরে থাকতেন। অনেকসময় খালি গায়ে ও খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটতেন।

তাঁর দানের সীমা ছিল না। কিন্তু দান করতেন গোপনে। কেউ টের পেত না। তাঁর কাছে চেয়ে কেউ কোনোদিন খালি হাতে ফিরে যায়নি। ছাত্রদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কত ছাত্রকে সাহায্য করতেন তার ইয়ত্তা নেই। সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছিল না। মারপ্যাঁচ বুঝতে পারতেন না। সরল মনে সকলকেই বিশ্বাস করতেন। কাউকেই সন্দেহ করতে পারতেন না।

তাঁর পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। আগেই বলেছি মা তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন না। অথচ তিনি মাকে খুবই ভালোবাসতেন। দাম্পত্যজীবনও সুখের ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গেও বনিবনা হত না। তাই সান্ত্বনা খুঁজতেন মদ ও কবিতায়। ভাষার চেয়েও কবিতা তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি জন্মকবি ছিলেন। তাই অজস্র কবিতা বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। শুধু ইংরেজিতে নয়, বাংলাতেও।

হয়তো কবি হরিনাথকে, সাহিত্যিক হরিনাথকে লোকে ভুলে যাবে। কিন্তু ভুলবে না ভাষার জাদুকর হরিনাথকে। কতযুগ পরে বাংলার মাটিতে এক হরিনাথ জন্মেছে, আবার কতযুগ পরে এই মাটিতে আর-এক হরিনাথ জন্মাবে কে জানে। জন্মাতে না-ও পারে। হরিনাথ প্রকৃতির এক উদ্ভট সৃষ্টি। এরকম সৃষ্টি বারেবারে হয় না।
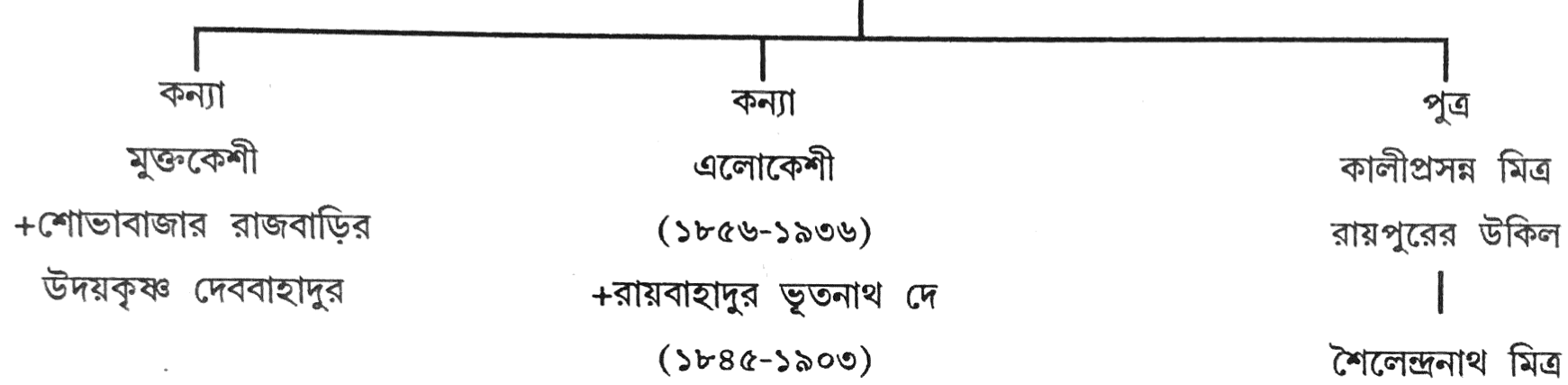
৮

ভূতনাথ দে-র শ্বশুরবংশ
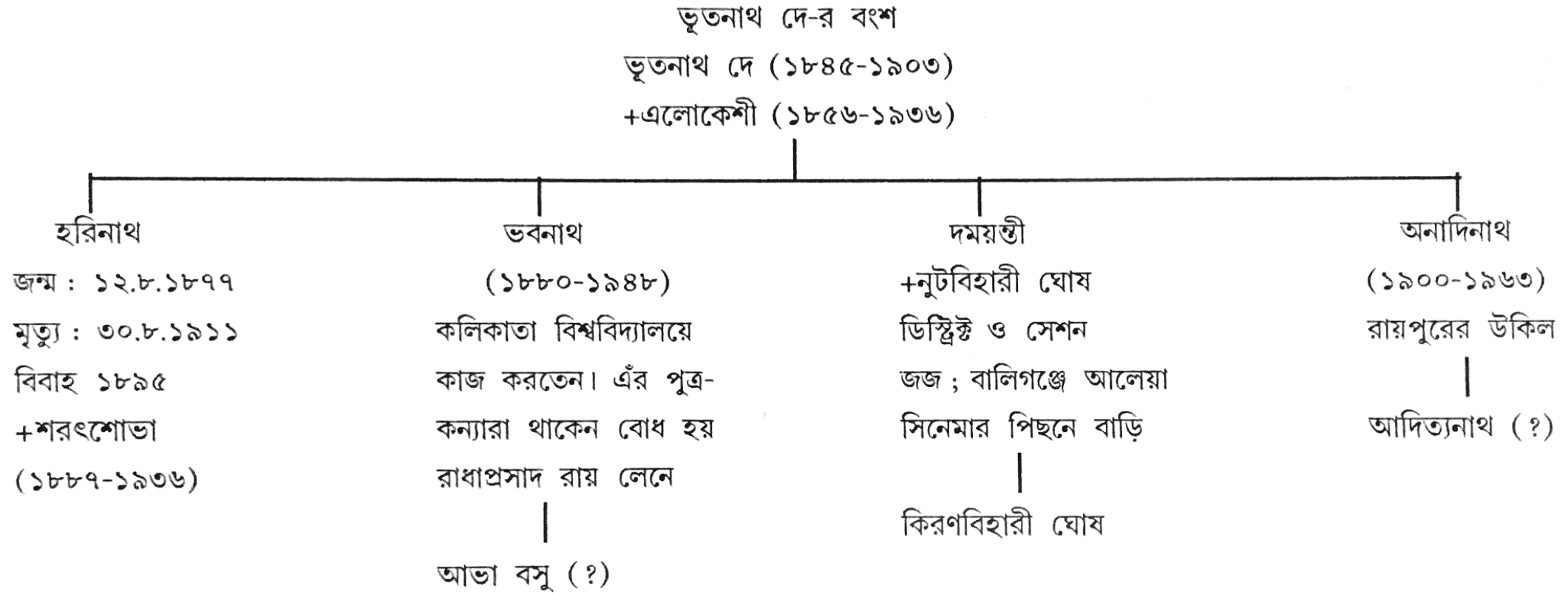
ভবনাথ দে ও অনাদিনাথ দে-র পুত্র-কন্যাদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারিনি। হরিনাথের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী আভা বসু হরিনাথ দে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি কোন ভাই-এর কন্যা, কোথায় থাকেন, তাঁর কয়টি ভাইবোন জানি না। আর-একজন বংশধরের নাম পেয়েছি — আদিত্যনাথ দে। তিনি বোধহয় ৯৩ রমাপ্রসাদ রায় লেনে থাকতেন। তিনি কি অনাদিনাথ দে-র পুত্র? এঁরা যদি পত্রদ্বারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে আমি হরিনাথ দে-র দুই ছোট ভাইয়ের বংশতালিকা সম্পূর্ণ করতে পারি। নইলে এই কুলপঞ্জি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হরিনাথ দে-র বংশ

হরিনাথ দে (১২.১৮৭৭-৩০.৮.১৯১১)
+শরৎশোভা (১৮৮৭-১৯৩৬)
বিবাহ : ১৮৯৫

- পুত্র
  প্রাণধন দে (ভুলু)
  জন্ম : ১৯০৩
  মৃত্যু : ২.১২.১৯৩৮
  কলিকাতা
  হাইকোর্টের উকিল
- কন্যা
  বেণু
  (১৯০৫-১৯১৬)
- কন্যা
  সোনামণি
  জন্ম : ১৯০৭
  মৃত্যু : ১৯০৯/১০
- কন্যা
  বিভাবতী (মুনু)
  জন্ম : ১৯০৯
  মৃত্যু : জানুয়ারি, ১৯৩৮
  +সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
  জন্ম : ১৮৯৭
  মৃত্যু : ১৯৫৭
  (২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার)
  - অলোক
  - প্রণব
    জন্ম : ১৯২৮ ; বিশ্বভারতীর জার্মান ভাষার অধ্যাপক, ৬টি ইউরোপীয় ভাষা জানেন।
- পুত্র
  রাজেন্দ্রনাথ দে
  জন্ম : ১৯২১
  ৭/৮ মাস বয়সে মৃত্যু

বহড়ু ও কলিকাতার ভঞ্জ বংশ

কৃষ্ণমোহন ভঞ্জ

জন্ম : বহড়ু গ্রামে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৃত্যু : ১৮৩৩ কাঁথি ; নিমকমহলের পেশকার ছিলেন ও তেজারতি করতেন। ১৮২০ ও ১৮২২ সালে তাঁর বাড়িতে দু'বার ডাকাতি হওয়ায় সর্বস্বান্ত হন।

দ্বারকানাথ ভঞ্জ
কন্যা
কালিদাস
কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি
কন্যা
দেবেন্দ্রনাথ
১. ভ্যান্সিটার্ট রো-এ জামবন্ কোম্পানিতে চাকরি ও অবসর সময়ে বাল্মীকি প্রেসের তত্ত্বাবধান করতেন।
কন্যা
উপেন্দ্রনাথ
বিচার বিভাগে চাকরি — মুন্সেফ
হেমচন্দ্র
দ্বারকানাথের ব্যবসা, জমিদারি, বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। কয়েকদিন সওদাগরি অফিসে বেনিয়ন বা মুৎসুদ্দি ছিলেন।
কন্যা
কন্যা
কন্যা
ক্ষেত্রনাথ
ব্রজেন্দ্রনাথ
মনীন্দ্রনাথ
দ্বিজেন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ
কন্যা
বীরেন্দ্রনাথ
হীরেন্দ্রনাথ
কন্যা
নীরেন্দ্রনাথ
ধীরেন্দ্রনাথ
গোপেন্দ্রনাথ
কন্যা
দীপেন্দ্রনাথ
কন্যা
কলকাতা স্মল কজ কোর্টের উকিল। ৬৮ বছর বয়স। ৩, রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বাস। এঁরই সৌজন্যে এই বংশলতিকা আমি পেয়েছি।
সুধীন্দ্রনাথ
কন্যা
যতীন্দ্রনাথ
মনুজেন্দ্রনাথ
সরোজেন্দ্রনাথ
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক।
সৌমেন্দ্রনাথ
গৌতম

হরিনাথ দে-র শ্বশুরবংশ

নন্দলাল বসু (কালানন্দ)

(কলিকাতার গরানহাটার বসু)

গ্রীক্ সওদাগরি অফিস Petrocochino-র খাজাঞ্চি ছিলেন। ১০, গোকুল বড়াল স্ট্রিটে বাড়ি। হেদোর উত্তরে মোটা মোটা থামওয়ালা বাড়ির মালিক কবি-সাংবাদিক কাশীপ্রসাদ ঘোষের বংশধর গয়াপ্রসাদ ঘোষের ভগিনীকে বিবাহ করেন।
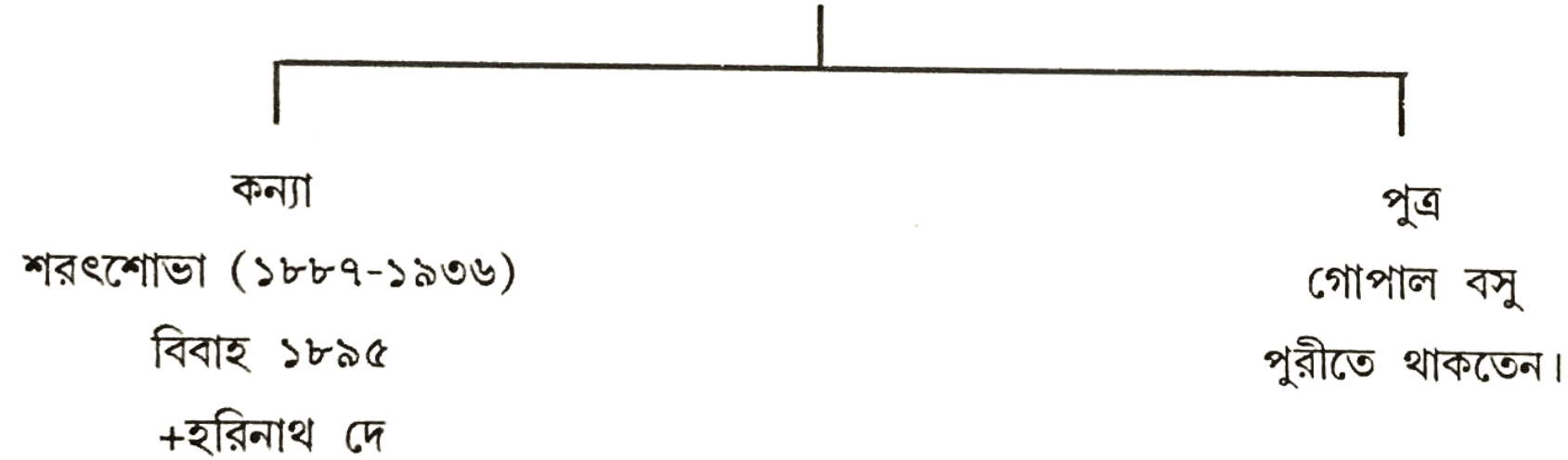
এই বংশের সৌভাগ্য ও উন্নতির মূল দ্বারকানাথ ভঞ্জ। এঁর জীবনকথা সবিস্তারে বলতে গেলে অনেক কিছু লিখতে হয়। তা এখানে সম্ভব নয়। সুতরাং অতি সংক্ষেপে তাঁর জীবনী এখানে দেওয়া হল। ছেলেবেলায় ইনি কলকাতায় রামমোহন রায়ের স্কুলে পড়ে বেঙ্গল কোম্পানির গুদাম-সরকার নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সালে রবার্ট (বা চেরিয়েল) কোম্পানির অফিসে ২ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট নিবাসী শিবচন্দ্র মল্লিকের সহকারী এবং পরে ক্রমে ক্রমে বেনিয়ন নিযুক্ত হন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে ইনি কেরানির কাজ থেকে শেষে আপিসের সর্বোচ্চ পদে উঠে প্রচুর ধনসম্পত্তি রেখে যান। আশ্রিতদের প্রতি দয়া ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান তাঁর আজীবন ব্রত ছিল। তাঁর উপর লোকের এমনই বিশ্বাস ছিল যে, একশোর উপর লোককে বাড়িতে রেখে খেতে দিয়ে তাদের জীবিকার উপায় করে দিয়েছিলেন। তিনি দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সেবার জন্য প্রায় তিরিশ হাজার টাকা দামের সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান কীর্তি বাংলা ভাষায় বাল্মীকি রামায়ণ প্রথম প্রচার করা। এঁরই সাহায্যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন রামায়ণ সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করেন। এজন্য দ্বারকানাথ ১৬৩০০ টাকা দান করেন। ইনি জীবনের শেষ দশ বছর ধরে প্রায় চব্বিশটি ছেলের স্কুলের মাইনে দিয়ে এসেছেন। এরকম লোক যে হরিনাথ দে-র পিতা ভূতনাথ দে-কে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে মানুষ করবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে।

দ্বারকানাথ ১৮৫৪ সালে কলকাতার ১০ রঘুনাথ চাটুজ্যে স্ট্রিটের বাড়িটি কেনেন। তারপর ১৮৭৪ সালে ওই স্ট্রিটের ৮ নং বাড়ি ও ১৮৮১ সালে ৩ নং বাড়ি কেনেন। ৮ নং বাড়িটি দুর্গাদেবীর সেবায় উৎসর্গ করে গেছেন। ৩ নং বাড়িতে শ্রীদীপেন্দ্রনাথ ভঞ্জ থাকেন। বাকি বংশধরেরা থাকেন ১০ নং বাড়িতে। এখন ওই বাড়ি চারভাগ হয়েছে। তারপর দ্বারকানাথ কেনেন ১১ নং, ১৩ নং , ও ১০ নং ব্রজনাথ মিত্র লেনের তিনটি বাড়ি ও ১০০/১, মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের বাড়ি।

বিলিতি জাহাজের আমদানি ও রপ্তানি মাল খালাস ও বোঝাই করবার জন্য তিনি অনেকগুলো cargo boat কেনেন। এছাড়া একটি দড়ি তৈরির কল ও পাটের গাঁট বাঁধবার 'হাইড্রলিক প্রেসও কেনেন। কলিকাতার সম্পত্তি ছাড়াও মফস্বলে অনেক জমিদারি কেনেন। শেষ বয়সে কাশীবাস করে সেখানেই মারা যান।

সংযোজন

DAVID HARE

David Hare is said is to have been a native of Scotland. He was born on February 17, 1775. The names of his parents are not known. Aberdeen in Scotland is supposed to be his birthplace. But Babu Pearychand Mitra, the biographer of David Hare, obtained the following particulars from Mr. Rust of the Union Bank of Scotland regarding Hare and his family :

'David Hare never was a watchmaker in Aberdeen. His father was a watchmaker in London, who married an Aberdeen lady. David visited Aberdeen before coming out to India to be introduced to his mother's relatives and that was his only visit to Aberdeen. David had three brothers—(1) Joseph, a London merchant who long resided at 48, Bedford Square; (2) Alexander, who came out to India after David where he is supposed to have died, leaving a daughter, Janet ; and (3) John, who also went to India, returned with a competency and resided with his brother Joseph. He died leaving a daughter Rosalind who married Dr. B. Hodge of Sidmouth.'

But at page 3 of *A Biographical Sketch of David Hare* we get the names of the three brothers of David as John, Joseph and James (instead of Alexander). We do not know their respective dates of birth, but it is David who appear to be the eldest. Two of the brothers died while David was in India.

David Hare must have learnt the trade of watchmaking from his father in London. We know nothing about the education he received at home. It must have been of an elementary kind. He came in India in 1800 when he was at twenty five. But David was not the first member of the Hare set to have come out to india. We have come across the names of a Francis Hare who was a storekeeper under the Government of India Committee of Works in Calcutta in 1770, and of a F. Hare who was Sheriff of Calcutta in 1782. Were the two identical ? May be. But it does not seem probable, because from a storekeeper to a Sheriff was a too long jump even for those good old days. We also find the name of a Dr. James Hare, M.D., who gave a donation of Rs. 100 and a subscription of Rs. 50 to the Calcutta School Book Society in 1817-18, the first year of the Society's existence. Was he, by any chance, the brother of David? It does not seem likely, because this James was an M. D., and James, David's brother (if he really had a brother named James) has not been spoken of as a Doctor and an M. D. at that.

For the first 15 years from 1800 to 1814 David Hare quietly carried on the business of clock-and watch-making in Calcutta. What else he did during this period is not known. From the beginning he, like some other Europeans in India, was pained to notice the moral and intellectual degradation of the contemporary Indians — their ignorance, their superstitious-beliefs and

practices and moral vices. Like the most other Europeans he did not hate them, he knew that once they were civilised and cultured. He pondered deeply over the causes of the degeneration and their remedies. Gradually the conviction grew upon him that it is nothing but the diffusion of European science and literature among them would enlarge their minds and elevate their morals. After this the introduction of a liberal Western education in Bengal became the mission of his life. In connection with his trade he came into contact with a large number of respectable Bengalee gentlemen and became intimate with them. To quote his own words : 'I was in the habit of constant and familiar intercourse with the great majority of native gentlemen of Calcutta.' He never missed an opportunity to impress on these gentlemen the imperative and necessity of the introduction of an English system of eduction of the highest type and ultimately won over a substantial number among them to his own views. To quote David Hare again : 'A few years after my arrival in this country, I was enabled to discover, during my intercourse with several native gentlemen, that nothing but education was requisite to render the Hindoos happy, and I exerted my humble abilities to further the interest of India; and with the sanction and support of the Government and of a few leading men of your community I endeavoured to promote the cause of education.'

THE HINDOO COLLEGE AND DAVID HARE

It was David Hare who conceived the idea of the Hindoo College as early as 1815 and prepared a scheme for it. At the invitation of Sir Edward Hyde East, the then Chief Justice of the Calcutta Supreme Court, a large number of the leading Hindu gentlemen of the town met at his residence on May 14, 1816 for the preliminary discussion on the desirablity of having an English educational institution of the highest degree for the education of their sons. At the next and more largely attended meeting on May 21, 1816 it was unanimously resolved to establish the Hindoo College 'for the tution of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages and in the literature and science of Europe and Asia'. Funds were contributed mostly by the Indian gentlemen, and the Hindoo College was opened in Guranhata on January 20, 1817. David Hare was one of the twenty European gentlemen who in the beginning assisted in framing the rules of the College. The Hindoo College was the first English college not only in Bengal but in India. Thus, by ushering the Hindu College into existence David Hare earned the distinction of being the 'father of English education in India', and anticipated Macaulay's and Lord William Bentinck's policy of promoting English education alone in

India by about 20 years; for when the Hindoo College was formed it was the policy of the Government of India to promote only Oriental Learning through the cultivation of Sanskrit, Arabic and Persian languages and literatures.

David Hare was not only the founder but the greatest friend and benefactor of the Hindoo College. It always claimed his first consideration. He placed his time, labour, advice, and even property ungrudgingly at its service. When the College was in financial straits in 1823, it was the Hare's advice that the Managers of the College applied for the Governmental assistance and received the same. He was elected a Manager of the College in 1825, and filled that office till death. On his daily rounds of the educational institutions with which he was connected, it was the Hindoo College that always first visited by him. His various services and benefactions to the College will be indicated later on.

THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY AND DAVID HARE

On July 4, 1817 the Calcutta School Book Society was founded by a number of European gentlemen 'for the preparation, publication and cheap or gratuitous supply of useful school books, other than religious, in English and oriental languages'. This Society was established mainly with a view to the improvement of the system of instruction in the Native Indigenous Schools (private pathsalas and maktabs) in Calcutta and Bengal. The pupils in the pathsalas hardly read anything in those days, for there were no printed books to read from, manuscripts were not easily available and were full of orthographical mistakes. Hare was not a member of the Managing Committee of this Society but he was one of its enthusiasts from its inception and attended all its annual meetings and annually subscribed Rs. 100 to its funds from the first year till his death. In 1827 he wrote to the Society, 'I believe there is no other institution in Calcutta that publishes books of the same discription (i.e., useful school books — R. M.), and I think the friends of education in this country are much indebted to your Society for the regular supply it has afforded.'

THE CALCUTTA SCHOOL SOCIETY AND DAVID HARE

On September 1, 1818 the Calcutta School Society was founded by the members and supporters of the Calcutta School Book Society 'to assist and improve existing schools, and to establish and support any further schools and seminaries and to select pupils of distinguished talents and merits from elementary and other schools and to provide for their instruction in

seminaries of a higher degree with the view of forming a body of qualified Teachers and Translators who may be instrumental in enlightening their countrymen and improving the general system of education. Where the funds of the Institution may admit of it, the maintenance and tuition of such pupils in distinct seminaries will be an object of importance'.

The realisation of the above object was left to the discretion of an annually elected committee of 24 managers consisting of 16 Europeans and their descendants and 8 natives — 4 Hindus and 4 Mahomedans. Rule 9 of the Society provided for 'a Treasurer, a Collector, an European and a Native Recording (i.e., Principal) Secretary, an European and a Native corresponding (i.e., Assistant) Secretary, with as many other Secretaries of Sub-Commitees as the business of the Society may render necessary'.

At the inaugural meeting of the Society, Lieutenant (later Captain) Francis Irvine of the 4th Bengal Native Infantry was elected the first European Recording Secretary and Mr. E. S. Montagu, the first European Corresponding Secretary of the Society. Maulana Mirza Kazam Ali Khan, Mir (i.e., chief) Munshee of the office of the Persian Secretary of the Government of India, was elected Mahomedan Native Secretary. He did not knew English. As a matter of fact, none of the four Mahomedan members of the Committee knew English. The election of the remaining two Hindu members of the Committee and of the Hindu Native Secretary from amongst all the Hindu members was deferred for the time being. At the same meeting the great Sanskrit and Bengali scholar Rev. W. Yates and Mr. David Hare and only two Hindu gentlemen out of four were elected members of the Committee.

There is a general impression that David Hare was the Recording European Secretary of the Society from the very beginning. But it is not true. To show how and when Hare became the European Secretary it is necessary to give here a brief account of the changes among the executives of the Society that took place from time to time.

Shortly after the inaugural meeting, Rev. Yates' services having been considered to be more useful for the Calcutta School Book Society, he was transferred to the latter body and his place on the Committee was taken by Rev. W. H. Pearce.

On March 9, 1819 in a full meeting of the Committee the managers of the Society divided themselves into three Sub-Committees with their respective provinces as follows :

Sub-Committee No. I — For the establishment and supervision of limited number of Regular Vernacular Schools. This sub-committee was assigned to Mr. E. S. Montagu as its Secretary. Babu Russomoy Dutt was a native member of this sub-committee.

Sub-Comitttee No. II — For aiding and improving the Indigenous Schools (i.e., Pathsalas), originated and supported by the Natives them-

selves. Rev. W. H. Pearce became the Secretary of this sub-committee and Babu Umacharan Banerjee was attached to this sub-committee as a Native member.

At the same meeting of March 9, 1819 Raja Radhakanta Deb was for the first time elected one of the Hindu members of the Committee and at the same time Recording Native Secretary of the Society. He attached himself to sub-committee No. II.

Sub-Committee No. III — For English and higher branches of tuition. Lieutenant F. Irvine was attached to this sub-committee as Secretary and Babu Radhamadhab Banerjee as a Native member.

The European Recording Secretary of the Society, Lieutenant Irvine, having received orders to join his battalion then stationed at Barrackpore, resigned his office on and from June 1, 1819, and Mr. E. S. Montagu, the European Corresponding Secretary was elected Recording Secretary and Rev. W. H. Pearce, the Corresponding Secretary of the Society. Lieutenant Irvine still continued to be the Secretary of sub-committee No. III and also a member of the Committee.

On May 4, 1820 Mr. Montagu notified all members of the Committee that Captian Irvine had departed for New South Wales and had consequently vacated the office of the Secretary to Sub-Committee No. III as well as his place on the Committee. Rev. Townley was elected secretary to sub-committee No. III and Rev. Yates was brought back from the Calcutta School Book Society to fill the vacancy of the Committee.

Sometime towards the middle of 1821 Mr. Montagu resigned the office of the Recording Secretary of the Society. The Corresponding Secretary Rev. W. H. Pearce was appointed Recording Secretary-cum-officiating Corresponding Secretary. Mr. David Hare *for the first time* was elected Secretary to the sub-committe No. II, i.e. the department for improving indigenous schools or Pathsalas in the place of Mr. Pearce. Pandit Gourmohan Vidyalankar, the Inspecting Pandit of the Society, was Hare's assistant.

On December 31, 1822 : Mr. W. H. Pearce tendered his resignation on two grounds — (1) lack of time owing to his pre-occupation as a missionary and printer (of the Baptist Mission Press, Calcutta — R. M) and (2) ill health. He had his first attack of bilious fever in the autumn of 1821, a second in October 1822 followed by a third in November 1822. In his letter of resignation he wrote : 'I retained the appointment simply because I could find no gentleman willing to succeed me...I should be truly happy could I mention any gentleman as my successor ; my anxiety, however, is relieved by the assurance that our active and valuable friend Mr. Hare, who has for a long time paid so much attention to the interest of the Society as Secretary of the Indigenous Department will extend his services to the General direction of its affairs till we shall be able to secure some other benevolent gentleman to
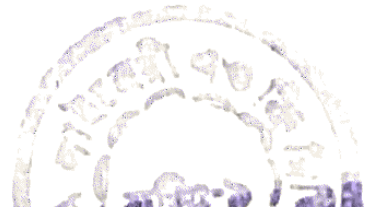
share is labours.' 'On this suggestion of Mr. Pearce', Mr. Carey commented, 'I fully concur in the belief that Mr. Hare's acceptance of the office would realize to the Society the advantages Mr. Pearce anticipate.'

Mr. J. C. Larkins, Vice-President of the Society, remarked as follows : 'If Mr. Hare would kindly undertake to officiate as secretary until some arrangement could be made, *he will be conferring a favour on us.*' Mr. Larkin's remarks were endorsed by Mr. George Money and four other European members of the Committee and by Raja Radhakanta Dev.

Thus it was that Mr. David Hare became the European Recording Secretary (the office of the Corresponding Secretary had ceased to exist independently for want of a separate incumbent) of the Calcutta School Society with effect from January 1, 1823, and continued in that capacity till the death of the Society, as no other benevolent European gentleman was found either to relive him or to share his labours.

OPERATIONS OF THE CALCUTTA SCHOOL SOCIETY

The School Society established early in its career as a Regular Bengali school (i. e., a model Pathsala) at Arpooly (Thanthania) opposite the Kali temple. David Hare superintended the school personally and literally conducted it at his own expense. This testifies to his solicitude and zeal for the promotion of indigenous education as well. From May 1819 to Februray 1833 the Society patronised and superintended upwards of a hundred indigenous schools or private pathsalas. In 1820 four other Regular Bengali schools were established by the Society within the Mahratta Ditch but these were all relinquished in 1822 for lack of funds which dwindled from year to year. On April 14, 1823 the Society applied to the Governor-General, John Adam, for a monthly aid of Rs. 500 which was promptly granted from May 1 following. This Government grant did not cease even after. Hare's death. Later in the same year two English schools were established by the Society —the first and the more elementary one at Arpooly near the regular Bengali Pathsala and the second of a more advanced type at College Square or Pataldanga. The students of the first class of this school were admitted to the second class of the Junior Department of the Hindoo college.

In 1832 - 33 a number of agency houses in Calcutta including the House of Messers. Mackintosh & Co., the second Treasurers of the Society, failed and almost all sources of help dried up, so the Society was forced to relinquish the patronage of the indigenous schools in February 1833. Only the Arpooly English School and the Pataldanga English School survived. In September 1833 one-third strength of the Arpooly Pathsala and the entire Arpooly English School were removed to the compound of the Pataldanga

English School. At the end of May 1834 the attenuated Pathsala was abolished under tragic circumstances and the two English schools were amalgamated into one with effect from about June 10 following.

From May 1829 to February 1830 the Society provided pecuniary assistance to two English schools established by native gentlemen in the suburbs of Calcutta — one at Bhowanipore and the other at Kiddeerpore. In March 1830 they were brought together under the same roof at Birjitala under the name of the 'Union School' which continued to receive aid and patronage from the Society till 1837.

On November 24, 1818 the managers of the Hindoo College resolved that 'as the committee of the School Society intend to send some boys to the school of the Institution, the terms shall be reduced to five Rupess per month, should the number so sent equal or exceed twenty.' In consequence of this resolution 20 meritorious boys selected from the Regular schools of the School Society as well as from the indigenous schools partronised by the Society were sent every year to the Hindoo College for education in English from January 1819 onwards. On July 24, 1820 the Head-Master of the Hindoo College reported : 'that the School Society has sent to this Institution an additional number of 10 boys selected from the Indigenous schools and to be paid for by the Society from the 1st of the present month.' After the establishment of the society's two English schools, boys were sent to the Hindoo College from these seminaries also. But from June 1834 onwards the sole surviving school of the society — the Pataldanga English School — enjoyed the monopoly of sending 30 boys to the Hindoo College for higher training. These boys ranked among the ornaments of the Hindoo College. It would be worthwhile to mention here just a few names — Rev. Krishnamohan Bandoypadhyaya, Ramtanoo Lahiri, Rajnarain Bose, Dr. Durgacharan Banerjee, Dinabandhu Mitra, Pearycharan Sircar, Dr. Mahendralal Sircar, Haragobinda Sen, Rai Bahadur Brahmamohan Mullick and Rai Bahadur Rajendranath Mitra.

DAVID HARE
VISITOR AND SUPERINTENDENT OF THE HINDOO COLLEGE

Till the end of May 1819 the School Society's boys receiving education in the Hindoo College were looked after by the European Secretary of the College, Lieutenant F. Irvine. After his resignation the following letter was addressed on June 12, 1819 to David Hare by the Managers of the Hindoo College : 'Your sound judgement in matters of education and friendly regard towards literary institutions induces us to request the favour of you to become a visitor of the the Hindoo College. We shall feel infinitely obliged by your

inspecting it at your convenience and communicating such finds and observations as may occur to you for its improvement.' Thus from June 12, 1819 Hare became a 'Visitor' to the Hindoo College. He was at the same time made Superintendent of the School Society's boys receiving instructions at the College. This we know from the following communication of David Hare made in 1834 to the Committee of the Society. He says, 'when Mr. Irvine left Calcutta, the Hindoo College Managing Committee did me the honour of appointing me superintendent of "our boys" in the College.'

All the schools, Bengali and English, established by the Calcutta School Society were not only entirely free but the pupils thereof were also provided free with books, slates, paper and other stationery. This system prevailed till death and for some time after.

It was the invariable practice of Hare to visit and inspect all the Society's schools and the Hindoo College daily from 10 A. M to 5 P. M. From February 1835 the newly established Medical College was added to the list of institutions daily visited by him. Later, when he had to attend to his public duties at the Court of Requests he visited three instituitons daily — the Hindoo College, the Pataldanga English School and the Medical College from after 3 P. M. till 6 and sometimes in the evening.

But although the five regular Vernacular schools and the two English schools were all founded by the Calcutta School Society, only one, the Pataldanga English School was officially designated 'The Calcutta School Society's School' and popularly called *Mr. Hare's School.* Expenditure to the tune of about Rs. 30 per month for this school in excess of the sum defrayed out of the monthly Government grant of 500 sicca rupees Hare used to meet from his own pocket.

THE HARE SCHOOL

In the course of its long career this school assumed different names at different times. In the beginning it was called the *School Society's School* (because it was established and supported by the Society), *Preparatory School* (because it prepared students for higher education in Hindoo College), *Pataldanga School* (because it was situated near the then Pataldanga police station the locality is still called Pataldanga, though Pataldanga Street is far off). Babu Kishorichand Mitra called it *Champatala School* though Champatala was further south and south-west. David Hare always called it *the School Society's English School at College Square.* Immediately after Mr. Hare's death in 1842 the Managing Committee of the Hindoo College took the initiative to maintain the school. It was on their proposal that it came under the control and management of the Hindoo College in consequence of

which it assumed the name of the *Hindoo College Branch School* or simply 'Branch School'. (The name 'Branch School' is used to be applied in those days to a school which was attached to, and which fed, a 'Central College'. A Branch School was different from what subsequently came to be styled a 'Collegiate School'. The Hindoo College School Department was a 'Collegiate School' while Hare School was 'Branch School'). Richard Jones, the Head Master of the Hindoo College, was appointed visitor to the 'Branch School' on Rs. 50 per month in addition to his own pay from the College. On the dissolution of the Committee of Management of the Hindoo College on February 1, 1854 it came under the control of the Principal of the Hindoo College and from June 15, 1854 under the control of the Principal of the newly founded Presidency College, when it assumed the name of the *Colootola Branch School* (instead of the Presidency College Branch School). In April 1843 the school was forced to leave its Pataldanga habitation and was given shelter by the Hindoo College on its own grounds in the rear of the present Presidency College premises where it remained till the close on the year 1871 when it migrated to its own present residence on January 1, 1872. The locality where it remained from 1843 to 1871 was at the time called 'Colootala'. This accounts for the name *Colootala Branch School.* It was in 1867 at the suggestion of the then Head Master, Babu Pearycharan Sircar, to the Visiting Lieutenant-Governor of Bengal, Sir William Grey, that the school assumed its present name *Hare School.*

DAVID HARE AND THE CALCUTTA MEDICAL COLLEGE

Hare was not only the father of English education and promoter of vernacular education in Bengal but the friend and supporter of all kinds of education for the Bengalees, including Medical education. By an order of the Governor-General-in-Council passed on January 28, 1835, the Native Medical Institution for Native Doctors, the Medical classes of the Calcutta Sanskrit College and the Medical classes of the Calcutta Madrasah were abolished and the Calcutta Medical College was established on February 1, 1835 to teach European Medical Science through the medium of the English language alone. Assistant Surgeon M. J. Brameley was appointed the first 'Superintendent' of the College. His designation was changed to that of the 'Principal' on 5 August 1835.

Here is what Dr. Bramley says about what David Hare did for the Medical College : 'This zealous co-adjutor and valuable assistant was Mr. David Hare. Scarcely had the order of Government for the institution of the college appeared before this gentleman, prompted by the dictates of his own

benevolent spirit ... immediately afforded me his influence in furthering the ends it has in view. His advice and assistance have been to me, all times, most valuable. He frequently attended at the lectures and at the Institution. ... His patience and discretion have animated and supported me under the circumstances of peculiar difficulty which at one time appeared to threaten the very existence of the Institution. In truth, I may say that *without Mr. Hare's influence an attempt to form a Hindu Medical class would have been futile,* and under this feeling ... I avail myself of the present opportunity to record publicly, though inadequately, *how much the cause of Native Medical Education owes* to that gentleman, as well as the extent of my deep obligation to him personally.' *(A Biographical Sketch of David Hare).*

Hare himself wrote in 1840 : 'Through the kind permission of Dr. O'Shaughnessy (Assistant Surgeon William B. O'Shaughnessy, Professor of Chemistry and Materia Medica in the Medical College — R. M.) the first and second classes of the school (the Pataldanga English School — R. M.) enjoy the privilege of attending his lectures on Chemistry and Natural Philosophy at the Medical College, At the end of the same *Report* he wrote : 'Fifty-five (scholars) who have been educated under the (School) Society's patronage have, upon strict examination, been found qualified and admitted into the Medical College while all the other schools have only supplied about thirty.' At the instance of Hare a teacher of his school joined the Medical College and became a famous physician of Calcutta. He was Dr. Durgacharan Banerjee, father of Sir Surendranath Banerjee.

It was because of this yeoman's service rendered to the cause of Medical education that after the death of Dr. Bramley in Calcutta on January 19, 1837 the post of 'Principal' was abolilshed and David Hare was appointed Secretary and Treasurer of the College from 1837 to 1841 when he resigned his office and Dr. F. J. Mouat, M. D., Professor of Chemistry and Materia Medica (who was at the same time also the Secretary of the Council of Education for many years — R. M.) succeeded him as secretary and Treasurer. But in recognition of his services to the Medical College, Hare was appointed by the Government an Honorary Member of the Council of the College.

The only sphere of Education in which Hare did not play a direct part was Female Education, because he thought the time for it was not yet. Nonetheless he had abundant sympathy for the cause. It is demonstrated by the facts that he was a subscriber to the 'Ladies Society for Native Female Education' established in 1824, and that he graced by his presence periodical examinations of Hindoo girls which were held at the residence of Raja Radhakanta Deb. He is reported to have remarked once that if he lived ten years more he would introduce female education in Bengal.

Hare was also a subscriber to the Institution for the support and

encouragement of native schools formed by Marshman and Ward in Serampore in 1816.

The Academic Association founded by Derozio was, after his resignation from the Hindoo College on April 25 1831, removed to Mr. Hare's school at Pataldanga and Hare was elected its President. The meetings were held once a week. The Association lingered on there till probably 1837.

DAVID HARE AND DEROZIO

Hare was a great friend and admirer of that young genius, Derozio. At the fateful meeting of the Managers of the Hindoo College on April 23, 1831 the following resolution was brought forward : 'Whether the Management had any grounds to conclude that the morals and tenets of Mr. Derozio, as far as ascertainable from the effects they have produced upon his scholars, are such as to render him an improper person to be entrusted with the education of youth'. David Hare, who attended the meeting as a Manager, voted, along with Dr. H. H. Wilson, against the resolution, expressing the opinion that such an efficient and able teacher as Derozio was rarely to be found and that he thought the scholars of the Hindoo College had been immensely benefited by his excellent teaching. On this resolution six of the nine Managers supported Derozio and only three voted against him. Then a fresh resolution was tabled. It was 'whether in the present state of public feeling amongst the Hindu community of Calcutta, it was expedient to dismiss Mr. Derozio from the College'. David Hare and Dr. Wilson, being foreigners, refrained from expressing an opinion on a matter which concerned the Hindu Community, and also from voting.

Hare persuaded Derozio to deliver a course of lectures on Metaphysics at his school. The lecture was open to the public. Some four hundred youngmen used to attend this.

How much Hare loved Derozio will be apparent from a remark of the Head Master of the Hindoo College. One day Derozio took the monthly progress report of his class to the Head Master, D' Anselme. Hare was standing near his desk. Derozio was no good at drawing up progress reports. The sight of the report so much enraged the Head Master that he lifted his hand to strike Derozio who averted it by receding. Failing to strike Derozio, the Head Master vented his wrath on Hare by calling him 'a vile sycophant', meaning 'sycophant of Derozio'. Hare was at the time a Manager of the College *(A Biographical Sketch of David Hare).*

On March 12, 1838 a meeting of Hindu gentlemen was held at the Sanskrit College and the Society for the Acquisition of General Knowledge was established. David Hare who was present at this meeting was elected Honorary

Visitor. He attended the meeting of the Society regularly just as he used to those of the Academic Association during Derozio's time.

The students of Derozio founded many schools in different parts of Calcutta for imparting gratuitous instruction in English and Vernacular to poor boys who could not afford to pay schooling fees. Hare frequently visited these schools and sometimes conducted their examinations.

The Managers of the Hindoo College decided to establish a Bengali Pathsala for the better instruction of boys in the Bengali language. At the request of the Managers David Hare laid the foundation of the institution on June 14, 1839 on the grounds belonging to the Hindoo college at the back of the present Presidency College. Hare performed the ceremony with a suitable speech after which Sir Edward Ryan, the Chief Justice of the Supreme Court and President of the General Committee of Public Instruction, complimented Mr. Hare in the most eulogistic terms. the Pathsala began to function of and from January 18, 1840.

HARE'S OTHER INTERESTS

But though education was Mr. Hare's ruling passion, it was not his sole interest. He had other interests as well and could find time to indulge them.

He was a member of the Agricultural and Horticultural Society of India from 1836 and was a regular attendant at its monthly meetings. He was also a member of the Asiatic Society of Bengal and a subscriber to the District Charitable Society.

On January 15, 1835 a public meeting of the inhabitants of Calcutta was held at the the Town Hall for petitioning the Governor-General to repeal the repressive Press Regulation passed in 1823 and to remove the restraints upon public meetings. Among the speakers was David Hare who moved the resolution 'that the Sheiff do sign on behalf of the inhabitants the respective petitions now adopted by this meeting'. He was elected a member of the Committee for carrying out the objects of the meeting.

The emigration of Indian labourers to Mauritius and Bourbon Islands commenced in 1835. Many labourers were deceitfully and forcibly sent away. About one hundred or more coolies had been kept in durance in a house in Pataldanga. On seeing them locked up, Mr. Hare cosulted Mr. Longueville Clark, the eminent barrister who accompanied Hare to the spot and they secured the release of the coolies wrongfully detained. A public meeting was held at the Town Hall on July 10, 1835 to call the attention of the Government to the abuses. A petition was presented to the President in Council in consequence of which Government appointed a Committee of Enquiry in Au-

gust, 1835. David Hare was one of the witnesses who gave evidence before the Committee whose report helped to ameliorate the condition of the coolies to a large extent.

On July 8, 1835 a public meeting was held at the Town Hall for the purpose of adopting such measures as might be best calculated to secure trial by jury in civil cases in the Supreme Court and to extend the jury system throughout the country. David Hare was appointed one of the members of the Committee for preparing the draft of an Act or suggestions to be forwarded to the Governor-General in Council and for taking other measures necessary to further the object of the meeting.

In 1835 Hare also took a very active part in the preparation and presentation of a petition on behalf of the Managers and students of the Hindoo College and their parents, guardians and connections, to the Governor-General in India in Council, praying that the Judges of the Muffusil courts might have the option of using the English language equally with Persian and Bengali in the pleadings and proceedings of the Courts of Justice in Bengal. The Secretary to the Government of India replied on February 10, 1835 the desired legislation was under the consideration of the Government.

When the British India Society was established in England in 1839 a largely attended public meeting was held in Calcutta with a view to offering co-operation to that Society. Hare seconded a resolution at that meeting. *(A Biographical Sketch of David Hare).*

HARE GIVES UP BUSINESS

Hare's labours in the case of education of Indians commenced in the year 1815. They required so much of his time and attention that he could hardly spare any of either for his business — the sole source of his livelihood and philanthropy. If he devoted more time to the one, the other sufferred. He increasingly felt he could not carry on both with equal zeal and efficiency. So one of the two had to be given up. Which one was it to be — his self-imposed mission or his business ? It was a difficult decision for him to make. After five years he decided to give up business. On Jaunuary 1, 1820 he disposed of his business to his relative, Mr. Edward Grey, for, it is said, one lakh of rupees, by issuing a public notice in the Government Gazette of January 6, 1820 and invested the bulk of the sale proceeds in purchasing land on the north and south (and some say, to the west also) of the present College Square, to have an assured income for the rest of his life to enable him to apply himself to his work of education, unhampered by financial worries.

The Calcutta Lottery Committee appointed by the Marquis of Hastings in 1817 had recently begun construction of the great highway from Park Street

on the south to the Barrackpore Trunk Road on the north the different segments of which bore until lately the names of Wellesly Street, Wellington Street , College Street and Cornwallis Street. Hare had this much business acumen in him that the value of land on either side of this arterial road was bound to appreciate. It is definitely known that he purchased the entire amount of land on the north side of College Square, measuring 5 bighas and 7 cattahs. Towards the end of 1823 Government purchased from him, for the erection of the projected Sanskrit College building; 2 bighas of land at Rs. 500 a cattah. Of the remaining 3 bighas and 7 cattahs of land he made a free gift to the Government for the construction of the two wings of the Sanskrit College for the accommodation of the Hindoo College. The college could not have a permanent home but for this munificent gift of Hare. How much land he owned on the south side of the College Square is not definitely known but there is no doubt that he owned some, because after his death his tomb was erected on his own land. He also purchased some landed property in the name of his 'Banian', Babu Golak Karmakar, who lived in Pataldanga. It is interesting to know that he had, after the fashion among the Europeans of his time, besides a 'Banian', a 'Dewan' named Babu Baidyanath Das who lived on the present Mirzapore Steet, almost opposite his tomb.

But the expenditure of Hare always outstripped his means. Here are a few items of his expenditure. He bore the entire expense of the Arpooly Pathsala for 16 years and part of the expense of the Pataldanga English School for 19 years. His annual subscriptions to the various educational and other societies added up to a not inconsiderable sum. Gift of toys, sweets, books and cash to children, distribution of dhotis, sarees, medicines and food to them and their parents, secret charities to the poor, helpless and needy, drained away his resources, with the result that he was in chronic debt. To meet the pressing demands of his creditors he was led to indulge in speculation which brought about his ruin. He owned a half-finished house on Hare Street. He finished it and sold it to satisfy his creditors. For the same purpose he sold all the landed property that he held in the name of his 'Banian'. Babu (later Raja) Dakshinaranjan Mukherjee had inherited a fortune from his maternal grandfather, Babu Surjakumar Tagore, the eldest son of Babu Gopeemohan Tagore. Hare, in utter straits, borrowed Rs. 60,000 from Dakshinaranjan. He could repay only a portion of the loan, not in cash but by assigning a parcel of his land on the south side of the College Square, worth about Rs. 10,000. Those who know may recall that when in May 1849 Babu Dakshinaranjan came to know of Mr. J. E. D. Bethune's intention of founding a school in Calcutta for the education of respectable Hindu girls he offered to Mr. Bethune a piece of land on Mirzapore Street for the school building. It was no other than Hare's land transferred to him.

THE COUNCIL OF EDUCATION ON MR. HARE

Mr. J. C. C. Sutherland, Secretary to the General Committee of Public Instruction and Visitor to the Hindoo College, in his Report on the Committee for the year 1835, wrote as follows:

'I cannot conclude this without again noticing the invaluable services which Mr. Hare, my co-visitor, continues to render to the Hindoo College and the cause of education generally. Such disinterested services (inappreciable as they are by money) merit, I think, some public acknowledgement from the General Committee and indeed from the government itself.'

In the same report the General Committe of Public Instruction of which Mr. Macaulay was the President, had the following observations to make :

'With reference to what Mr. Sutherland has said regarding Mr. Hare, we think it right to call the particular attention of Government to the merits of this benevolent individual. Of all those who now take an interest in the cause of Native Education, Mr. Hare, we believe, was the first in the field. His exertions essentially contributed to induce the Native inhabitants of the capital to cultivate the English language ; not, as they had done before to the slight extent necessary to carry on business with Europeans, but as the most convenient channel through which access was to be obtained to the science of the West. He assisted in the formation of the School Society and the Hindoo College, and he has since year after year patiently superintended the growth of these institutions, devoting to this object not, as might be expected, a portion only but the whole of his time. He is constantly present as the encourager of the timid, the adviser of the uninformed, the affectionate reprover of the ideal or bad. Disputes among the students are generally referred to him and he often called in as the mediator between parent and child. In these and in other ways the cause of Native Education is much indebted to Mr. Hare for its present advanced state, and we, therefore, think that he is entitled to some recompense from the public. We trust that your Lordship in Council will take the subject into serious consideration, not only out of regard to Mr. Hare's claims, but also with a view to mark the light in which efforts like his for the intellectual and moral improvement of the people are considered by Government of India. There is no fear of establishing an inconvenient precedent. Few will be found like Hare to bestow years of unremitting labour upon this object, noble and interesting as it is, without any expectation of reward except what is to be derived form the gratification of benevolent feeling.'

MR. JAMES KERR ON MR. HARE

Mr. James Kerr, M. A., in his *Review of Public Instruction in the Bengal Presidency from 1835 to 1851* concludes his account of the Hindoo College of which he was at one time Principal, in the following words :

'This sketch of the Hindoo College would be incomplete without some special notice of a very remarkable man who was connected with it for several years as visitor and as a member of the comittee. This was David Hare, a most benevolent man and a thoroughly disinterested friend of Native Education.'

After quoting the whole of the observations of the General Committee of Public Instruction cited above, Mr. Kerr continues, 'Mr. Hare was subsequently appointed a Commissioner of the Court of Small Causes in Calcutta, the duties of which office he continued to discharge up to the period of his decease on June 1, 1842. His appointment in the Court fo Small Causes did not prevent him still devoting a large portion of his time to the Hindoo College and the School Society's school, which he continued to visit daily. It was not in the of direct teaching that he was useful. It was the manifest interest he felt in the work, in the exertions of the masters and in the progress of the students, mixing freely with the latter, hearing patiently what they had to say, joining in their amusements, and in particular cases, giving them advice, always affectionately, and assisting them, when it was in his power, in obtaining situations, that made him so beloved and so useful. He used also, when they were sick, to visit them at their houses, bringing medicine to them, and taking a fatherly and affectionate interest in their welfare. On these occasions, it is said, even Hindu women would lay aside their reserve and consult him as they would a father or brother. They never doubted that the object of this good man, the object nearest to his heart, was the real welfare of their children. The writer of this imperfect notice, looking back ten years, can see Mr. Hare in his white jacket and old-fashioned gaiters, or on great days when the Committee met, in his blue coat, gliding quietly into the College and finding immediately some object to interest him.

'It has often been said that Mr. Hare, though so great a friend of education, was himself an uneducated man. This is not strictly correct. He must have received a good plain education. He was a man generally well informed. He spoke well, that is, simple and to the purpose. He wrote a good certificate or letter. He had read some of our best authors. He might even have passed for a well educated man, but for his simplicity and sincerity which were natural to him and which raised him above the pedantry of learning. With the usual love of paradox he was set down as an uneducated man friendly to education. It is far, however, from my wish to persuade any one that he was a man of extensive learning. He was chiefly remarkable for benevolent feeling, and this beyond all question he possesed in a very eminent degree.

'The Natives have not forgotten David Hare. They followed him to his grave with tears and heart-felt sorrow. They have in various ways since his death shown that they cherish his memory with affectionate gratitude. Among these not the least interesting is the custom which they observe of meeting

yearly on the anniversary of his death when an appropriate address is read in which he is affectionately mentioned.'

PUBLIC RECOGNITION OF DAVID HARE

Public recognition came to Mr. Hare rather tardily. The Court of Requests established in 1753 was predecessor to the Calcutta Small Causes Court established in 1850. The former Court had at the time three 'Commissioner' (they were styled 'Judge' after the constitution of the Court of Small Causes) as follows :

1.	First or Senior Commissioner	salary	Rs. 1400 per month
2.	Second Commissioner		Rs. 1200 ,, ,,
3.	Third or Junior Commissioner		Rs. 1000 ,, ,,

In 1837 Babu Russomoy Dutta, for a long time Secretary to the Hindoo College as well as to the Sanskrit College, had been appointed Third Commissioner of the Court of Requests. On March 17, (another version says, on March, 10) 1840, the Second Comissioner, Mr. J. W. Macleod, retired on pension and on that date Babu Russomoy Dutta was appointed Second Commissioner and David Hare Third Commissioner in the chain of the vacancy. This appointment, though belated, considerably eased the financial position of David Hare.

RECOGNITION OF HARE BY THE STUDENTS OF THE HINDOO COLLEGE

But long before Government recognition came to Hare the students of the Hindoo College had presented him a public address of February 17, 1831 on his 56th birthday. The function was held at the house of Madhabchandra Mullick at Jorasanko and Hare was asked to sit before Mr. Charles Pote, the East Indian painter, for his portrait. The proposal was first mooted at a meeting of the students of the Hindoo College convened for the purpose on Novemrber 28, 1830. A committee of 13 members, all famous Derozians, was elected to draw up a suitable address. The following were the members of the Committee : Krishnamohan Banerjea, Russickkrishna Mullick, Harachandra Ghosh, Dakshinaranjan Mukherjea, Ramgopal Ghosh, Radhanath Sikdar, Madhabchandra Mullick, Tarachand Chakrabarty, Kashiprasad Ghosh, Moheshchandra Ghosh, Pearymohan Bose, Kirshnamohan Mitra and Umacharan Bose. The address drawn up by the Committee was approved on January 30, 1831. On February 17, 1831 the address signed by 565 (another version gives the figure 500) students of the Hindoo College was read by
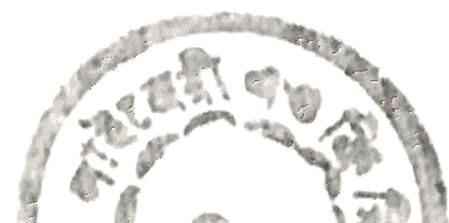
Dakshinaranjan Mukherjea. The whole of the address is worth quoting. But I shall quote only one memorable sentence from it : 'We have, therefore, resolved upon soliciting the favour of your sitting for your portrait ... it will be gratification to our feeling if we are permitted to keep among us a representation of the man who has breathed a new life into Hindu Society, who has made a foreign land the land of his adoption, who has voluntarily become the friend of a friendless people, and set an example to his own countrymen and ours, to admire which is fame and to imitate, immortality.'

Of course, Mr. Hare obliged them by complying with their request. But what was his first reacation to the proposal ? Let David Hare himself speak : 'Gentlemen, were I to consult my private feeling I should refrain from complying with your request. It has always been a rule with me never to bring myself into public notice.'

We have already noticed that benevolence was the most dominant trait of Hare's character. In this matter he was a close second to Iswarchandra Vidyasagar. But unobtrusiveness or modesty is no less charecteristic of this remarkable man than his benevolence. He kept himself so completely behind the scenes that few even of his contemporaries knew that he was the real originator and founder of Hindoo College. Unnecessary controversy has been raised over the question as it who was the founder of the Hindoo College. Some have named Raja Rammohan Roy, others have associated the Raja with David Hare, yet others have suggested Sir Edward Hyde East. As in the matter of education, so in the matter of his private philanthropy, Hare scrupulously shunned publicity. Truly, his left hand did not know what his right hand gave.

The last trait of Hare's character was his rationalism. Herein also he was a kindred of Vidyasagar. Hare was anti-Christian, anti-religious and anti-God. This trait he shared in common with the free-thinking radical Derozio. They were twin souls having a common outlook and a common ideal. This is the reason why Derozio was so dear to Hare. It was Hare's rationalism that was shocked at the superstitious beliefs and practices of the Hindus and that led him to discover the cure in a purely secular western education.

The Hindoo College was founded by orthodox Hindu gentlemen who had strong faith in their own religion. Even the mild religious and social liberalism of Raja Rammohan Roy was anathema to them. How is it that they banned all sorts of religious teaching including the teaching of their own dear Hindu religion, within the walls of the Hindoo College, while religious teaching was permitted in Christian and Mahomedan seminaries? How is it they chose a purely secular education for their sons? One suspects the unseen hand of David Hare behind the decision. Without this postulate the phenomenon would be inexplicable.

We have it on the authority of Pandit Krishnakamal Bhattacharya, late Principal of the Ripon (now Surendranath) College that 'David Hare never made a

secret of the fact that he was an atheist'. How strongly anti-Christian Hare was is proved by a little anecdote narrated by the late Rev. Lalbehari Day. One day Lalbehari went to Hare's house to request him to admit him into his school. Lalbehari writes : 'As I approached him (Mr. Hare) he called me to his side, took my hand, patted me on the cheek, put his left arm round my neck and asked me what I wanted.

Lalbehari — I want, sir, to be admitted into your school.

Hare — What school do you attend?

Lalbehari — I am reading now in the General Assembly Institution.

Hare — What books do you read?

Lalbehari — I read Marshman's Brief Survey of History, Lennie's Grammer, Geography, Fuclid Book II, New Testament and Bengali.

Hare — Why do you wish to leave the General Assembly's Institution?

Lalbehari — People say there is better teaching in your school, besides I have a great desire to go to the Hindoo College from your school.

Hare — You should better remain where you are.

Lalbehari — No, Sir, kindly admit me into your school.

Hare — You read the New Testament, you are half a Christian, you will spoil my boys.

Lalbehari — I read the New Testament because it is a classbook but I don't believe in it.

Hare — All Mr. Duff's pupils are half-Christians. I won't take any of them into my school. I won't take you, you are half a Christian, you will spoil my boys.

'I begged hard', Mr. Day continues, 'I earnestly besought him to take me into his school, but he kept repeating the words "you are half a Christian. You will spoil my boys".'

It should be mentioned here that upto November, 1852 none but Hindu boys were admitted into the Hare School.

RAJA RAMMOHAN ROY AND DAVID HARE

The name of Raja Rammohan Roy has been alluded to in connection with the foundation of the Hindoo College. There is no doubt that Hare called on Rammohan as soon as he returned from Rungpore towards the end of 1814, and picked up his acquaintance. There is also no doubt that at the beginning of 1815 Hare discussed with Rammohan his favourite subject — the deterioration of the moral and intellectual condition of the Hindus and how to bring about a regeneration. The two agreed on the object but differed as to the means. The Raja advocated religious reformation and the foundation of an *Atmiya Sabha* (a spiritual society, precursor of his later *Brahma-Sabha*) for the teaching of the doctrines of the Vedanta. Hare pleaded for the foundation of an

English College for teaching European Science, Philosophy and Literature. The two parted, each going his own way. But this disagreement did not create any rift between the two. The relation of Hare with Rammohan remained cordial to the end.

When Rammohan sailed for England in 1830 Hare wrote to his brother in London to do everything in their power for him. 'With great difficulty they at last prevailed upon the Raja, some months after his arrival, to accept a home in their house, and when he went to France, one of them accompanied him to Paris. ... In September, 1833 Rammohan arrived at Stapleton Grove, near Bristol, accompanied by Miss Hare, a niece of David Hare. ... During the Raja's illness Miss Hare took great care of him, and often read the Bible to him. John Hare, Joseph Hare and James Hare were present with others, at the interment of Rammohan Roy, on October 18, 1833.' (*A Biographical Sketch of David Hare*)

BABU BHOLANATH CHANDRA ON DAVID HARE

Babu Bholanath Chandra, one of the distinguished scholars of the Hindoo College and the author of *The Travels of a Hindoo,* has left us a description of Hare in his old age. Writes he : 'My remembrance of Mr. Hare is that of an old man, somewhat short of stature, with a perfectly bald head, heavy jaws and mouth, and one or two teeth. In his plain countenance there was nothing to strike or excite interest. But he, by no means deserved the uncomplimentary language of Mr. Marshman that "Nature had not intended his figure for a statuary". The lines of benevolence pencilled by Her on his face constituted a grace that was beyond the reach of Art.'

Hare never married. He had an extraordinary power of walking, again resembling Vidyasagar in this matter. He was as simple in his diet as in his dress. In the matter of food he acquired the tastes of a Bengalee. He was exceedingly fond of Magoor fish and coconut-milk. He knew Hindustanee and could converse in broken Bengali.

After selling out his own house hare lived under the roof of his relative, E. Grey, on Hare Street. There he was attacked with cholera on the night of May 31, 1842. About 5000 people in sobs and tears followed his bier under torrential rain to the College Square where his mortal remains were laid to rest.

It is a common knowledge that Christains are never buried outside a consecrated burial ground which is, therefore, called 'God's Acre'. Why was it that Hare was not buried in the Scottish Cemetery in Karaya or in the neighbouring Circular Road cemetery opened in 1840 ? There may be two reasons for it. The whole Christian community of Calcutta, specially the European Missionaries, were secretly hostile to him for his anti-Christianity. They would not

have easily permitted his interment in their cemeteries. Secondly, Hare being anti-Christain, might not himself have liked to be buried in a Christian burial-ground and might have left instruction to Mr. Grey to be interred on his own piece of land in College Square — the scene of his daily labour for the last twenty years. Whatever the reason, there was he laid to rest, between, and in sight of, his two spiritual children — the Hindoo College in front and his own School behind.

The Bengal Spectator and *The Friend of India* noticed Hare's death in long editorials. On June 17, 1842 Raja Krishnanath Roy of Cossimbazar called a meeting at the Medical College Theatre to determine on a suitable memorial to the departed. The meeting voted a life-size statue with suitable inscription which formerly stood in the quadrangle of the Sanskrit College and now stand between the Presidency College and the Hare School. The tomb over his grave with a touching epitaph on it was raised by rupee subscription by his students, friends and admirers. A mural tablet erected by the teacher and students of the Hare School in commemoration of Hare is in the School Hall. Hare's portrait painted by Charles Pote which formerly was hung in the upper Hall of the Sanskrit College now adorns the Library room of the Hare School. A clock made by Hare himself and presented by him to his School still exists in the office room, though long out of order. The street on which he lived still bears his name. His house was, until recently, marked by a marble tablet inserted by the Government of India but opinion differs as to the identity of the house — whether it is 2, Hare Street, or 2, Church Lane. The David Hare Training College and the Hare School preserve his name.

These are all the material relics of David Hare to remember him by. But he does not live in these external relics. He lives in the hearts of countless students and teachers of the Hindu and Hare school and will continue to so live as long as these two Institutions will endure. The English educated people of Bengal will not forget him before that calamitous day (if it ever comes) when English education is swept out of India. Being one of the ruling race, he did not come here to rule. He dedicated his life to the disinterested service of a subject race. Himself a white man, he loved the swarthy children of Bengal more than any father loves his own. He sacrificed everything he had — his fortune, his time, his comfort, his rest, his country, his home, his kith and kin, and his life for the poor, benighted and disinherited people of a foreign clime and of an alien race. He is one of the world's first practical internationalists. Truly it has been said of him : '(He was) one of those persons disabled by temperament from accepting the dogma of religion but compelled by his heart to lead an exceptionally Christian life'. No man had shown a greater love for his fellowmen than this humble Scotsman who adopted Bengal as his motherland. It is no small honour to us, Bengalees, that he sleeps on our soil. Let us kiss the dust of the sacred ground where he rests in immortality.

THE STORY OF THE HARE SCHOOL AS TOLD BY DAVID HARE

Hare School is said to have celebrated its centenary in the year 1918 and has accordingly decided to celebrate its 150th anniversary on and from September 1, this year [1968]. Those connected with the school believe that it is an amalgam of three separate schools founded at different times by The Calcutta School Society : I. Arpooly Bengali Pathshala, II. Arpooly English School and iii. Pataldanga English School. The Arpooly Bengali Pathshala was the earliest of the three, being founded in the year 1818. Hence, they argue, it is legitimate to hold that the present Hare School was established in 1818.

The earliest authority for this view is Babu Kishorichand Mitra, who, in course of an address entitled *The Hindoo College and its Founder* delivered at the 20th Hare Anniversary meeting, observed : 'The Calcutta School Society established two regular . . . schools. Both the Tuntuneah and the Champatala (i. e., Pataldanga — R. M.) schools were attended with remarkable success. The former consisted of a Bengalee and an English Department. The latter. . .was entirely an English School. The two schools were amalgamated at the end of 1834.' The text of the entire speech has been appended by Babu Pearychand Mitra in his *A Biographical Sketch of David Hare.*

The second authority is Raisaheb Ishanchandra Ghosh, the great Head Master of the Hare School, who in his *A Short History of the Hare School* written in 1906, has followed in this matter Babu Kishorichand Mitra (without naming him — R. M.) rather than his elder brother Babu Pearychand Mitra on whom he has otherwise mainly relied. Raisaheb writes, 'Among the schools established and supported by the School Society was a Pathshala at Arpooly which was made over to Mr. Hare at his own request. (In the margin he notes 'Arpooly pathsala established in 1818 *vide* Life of David Hare by Pearychand Mitra'). In 1823 an English School was started near the Pathsala whence the best boys were transferred to it for further training. These two schools were *subsequently* (he does not say, when — R. M.) amalgamated, so that from that time the Pathsala had two Departments — English and Bengalee. The School Society had another school known as the Calcutta School Society's Preparatory English School. It was located at Pataldanga (in the margin he notes 'established about 1822'). The Arpooly Pathsala was amalgamated with the Preparatory School in 1834.' Here we have the story in its most explicit form.

But Babu Pearychand Mitra has another story to tell in his *A Biographical Sketch of David Hare*, published in 1877. He says, 'The Arpooly Pathsala continued to be under the exclusive superintendence of David Hare. In 1823 the English School was established near the Pathsala whence the best boys were transferred to that school. This English School was afterwards amalgamated with Hare's School.'

Three things are to be noted here : I. Babu Pearychand Mitra does not say

that the Arpooly Pathsala and the Arpooly English School were amalgamated, II. he says the Arpooly English School was amalgamated with Hare's school and III. he calls the Pataldanga School *Hare's School*, even before the amalgamation with it of the Arpooly English School.

Which version is correct? It is useless to refer to the contemporary evidence of Raja Radhakanta Deb and the Rev. William Adam, although one was a member of the Committee of Management of the School Society from 1824 to 1833 and the other was the Principal Native Secretary of the Society from March 1819 to February 1833. They have not been believed.

Nothing less than the Calcutta School Society's reports will be believed. The Society printed and published altogether five reports. The first covered the period 1818 – 1819, the second 1820, the third 1822 – 1823, the fourth 1824 – 1825 and the fifth and last 1826 – 1828. None of these reports is now available. As no report was published after 1828 we do not known *authoritatively* what happened to the three School Society's schools after that year.

But to our good luck, we have two reports on the Calcutta School Society, drawn up, signed and dated by David Hare himself — the first embracing the years 1829 to 1832 and the second from 1833 to 1839. Both the reports are lengthy and both remain unpublished hitherto. I am presenting here for the first time relevant extracts from them, bearing on the question at issue.

Mr. Hare introduces the first report thus : 'I also enclose a written copy (of a report — R. M) which was prepared in the month of April, 1833 but on account of the great pecuniary distress of the public at that time the Committee were of opinion that it was better to postpone the printing of it till a future time when it would be more likely to gain subscription. The papers were left in the hands of the Honorable Sir Edward Ryan (the President of the Society — R. M) for perusal who being very unwell was under the necessity of going to the Cape of Good Hope and forgot to return the papers.' In course of the report Hare states : 'The labours of this Society have continued to be divided into different departments as before, namely, Regular Bengalee Schools, Indigenous Bengalee School and English Schools,' and proceeds to detail the operations of each department in the same order.

THE DEPARTMENT OF REGULAR BENGALEE SCHOOLS

Under this Department Hare writes : 'The Regular Bengalee School at Arpooly is still carried on. The number of pupils in this school has been a little augmented. The School at present contains 260 boys who are instructed in every branch which is usually taught in Bengalee, viz writing, reading, spelling, grammer and arithmetic.'

We omit the Department of Indigenous Schools in which we are not interested and pass on to the Department of English Scools.

THE DEPARTMENT OF ENGLISH SCHOOLS

Under this Department Hare writes : 'The English School at Arpooly which was the first that was established under the patronage of the Calcutta School Society is still carried on and the pupils for it are selected from the Regular Bengalee school according to their proficiency in that language. The School now contains 113 scholars, a small number having been added since the last report. The boys in this school have not so much time for their English studies as at other schools, having to attend the Bengalee School, and the most proficient are promoted to the Society's School at College Square and the Hindoo College when they have acquired a sufficient knowledge of English. After giving a statement of studies in the five classes of this school Hare continues : 'This seminary has now existed upwards of eleven years. As the Bungalow in which this school is conducted is very old and much out of repairs, it will soon be necessary either to give it a very extensive repairs, or to rebuild it altogether. The Committee, therefore, propose to remove it to the compound of the School at College Square which they hope will be approved of, as it will not only save the ground rent (Rs. 7 per month—R. M) of this school but enable the Society by the junction of the two Institutions to reduce the general expenditure and as the two schools are situated so near each other, it will occasion no inconvenience to the pupils of either.'

Next, Mr. Hare gives a brief account of the Society's English School at College Square. He writes : 'The number of students in the Society's English School at College Square has been considerably increased since the General Meeting. There are now upwards of 150 students in the Seminary formed into six classes.' Next he detailed a statement of studies of each class.

Hare then gives a fairly long account of an English School at Birjitola called the 'Union School' patronised by the Society, and of the Society's contribution to the Hindu College and concludes the *Report* by appending abstracts of accounts of the Society's income and Expenditure year be year from 1829 to 1832.

The Second Report on the Calcutta School Society signed by David Hare and dated April 10, 1840, begins thus :

'In order that the operations of the Society may be more clearly understood I have thought it proper to go back as far as the beginning of the year 1833 at which time our last Report was drawn up and when, in consequence of the very great mercantile and other failures, the Society not only lost a very considerable sum of money which was in the hands of its Treasurers, Messrs. Mackintosh & Co, but also lost nearly all its most liberal subscribers, was left considerably in debt and compelled to reduce its expenditure as much as possible by very considerably curtailing the extent of its operations.

'The Society had, up to this period, carried on three different departments — the department of Regular Bengalee School, the department

of Indigenous Schools, and the English department, but as all these could no longer be supported, the Committee had to consider which of them could be best given up, and after most careful deliberation it was considered that the Indigenous department was the one the immediate relinquishment of which would be productive of the least injury to the objects of the Society.

'It was, therefore, given up in the month of February, 1833 and effected a saving to the Society of about 200 Sicca Rupees per month.'

'The Regular Bengalee School at Arpooly which had been maintained from the commencement of the Society up to this time, as well as the English School which was attached to it, were still flourishing, but unfortunately the Bungalows in which they were carried on were so much out of repair (having been built upwards of 12 years) and the bamboos and other materials of which they were constructed were so decayed that it was dangerous to occupy them longer. It, therefore, became necessary either to erect new ones or abandon the schools altogether, as no house in the neighbourhood could be found at a moderate rent sufficiently spacious to hold either of them.

'The Committee were very loath to relinquish these schools, and after a very serious consideration of every particular, resolved to construct a very large Bungalow on the spare garden ground adjoining the Society's School at College Square, capacious enough to accommodate the whole of the pupils in the English School at Arpooly and all the best boys in the Bengalee School, amounting to about two hundred.

'By this plan of having both schools in the same compound, the Committee were of opinion that a considerable saving would accrue to the Society by reduction in the management and the saving of the ground rent paid for the ground at Arpooly.

'This determination, therefore, was forthwith carried into execution and an excellent large Bungalow (ninety feet in length and twenty-two in breadth) with a pucca tiled floor was constructed and fitted up completely with new teakwood furniture, as all the old furniture, having been made of Zarool wood with the feet fixed in the earth, was entirely rotten and useless.

'The boys belonging to the Arpooly Schools were removed into the new school-room in the month of September, 1833 and continued to prosecute their studies prosperously in it until the month of May following (1834). On the 27th of that month very early in the morning the new Bungalow was discovered to be on fire and the flames spread so rapidly that before any assistance could be procured the whole Bungalow with every article of furniture and the things belonging to the School were entirely consumed.* The

* Immediately after the accident the '*Samachar Darpan*' of Serampore reported : "The Bengalee Pathsala situated within the compound of Mr. Hare's English School at Pataldanga was burnt to ashes by fire on the 27th May, 1834. The construction of The Bungalow had cost a great deal of money." (English translation of the original Bengali in *Sambadpatre Sekaler Katha* by Sri Brojendra- Nath Bandyopadhyaya.—R. M)

cause of this unfortunate accident could never be discovered, not a single individual belonging to the school was present except the Doorwan who was sleeping in his own place near the gate at a considerable distance from the Bungalow and at the other side of the house quite out of sight of it.

'At the time that this grievous occurence took place the cash account of the Society showed a very cosiderable balance against it, so that means were wanting to rebuild the school. The Committee, therefore, made very urgent application to Raja Nursing Chunder Roy, the lanlord of the whole premises on which the schools stood and who had a large brick-built house adjoining on the northern side which had been long without a tenant and was much out of repair, to allow the use of it to the school. With this application the Raja very kindly complied and agreed to let the Society have the whole premises at the very moderate rent of Sicca Rupees Fifty per mensem, the society making the necessary repairs. This was only an increase of ten Rupees on the rent formerly paid.

'In the lower apartment of the house the Committee were able to accommodate the whole of the boys in the English department, but were obliged for want of room to suspend the Bengalee department which it has never since been able to rusume.

'By the assistance of the Managers of the Hindoo College who very kindly accommodated the Society with the loan of money, many articles of school furniture, it was enabled to get the lower apartments of the above mentioned house repaired and fitted up so as to admit the pupils and to recommence the school about the 10th of the following month of June.

'After this junction of the two schools the whole number of pupils amounted to three hundred and fifty who were carefully examined and divided into classes according to their abilities. In this way the school still continues . . .'

After this Hare gives an exhaustive account of the Hare School up to the end of the year 1839.

At the end of the *Report* Hare has given Abstracts of Accounts for each of the years from 1833 to 1839.

From the above two *Reports* we get to know :

1. that the Regular Bengali School at Arpooly (i. e. Arpooly Pathsala) was maintained from the commencement of the Society (i. e. from 1818). Such a clear statement is not to be found anywhere else ;

2. that the English School at Arpooly was the first English school to be established by the Society and that by April, 1833 it had already existed upwards of 11 years which means it was established in the quarter of 1822 at the latest and the Pataldanga English school was established either later in the same year or in the early part of 1823. So the statement in Raisaheb Ishanchandra's *History of the Hare School* that the Arpooly English School about 1822 is a reversal of the true order of foundation of the two schools.

Mr. Hare's statement calls for certain comments which we reserve till the end of this article.

3. that the Arpooly Bengali Pathsala and the Arpooly English School were never amalgamated either before or after their migration to the compound of the Pataldanga School. They were under separate managements, had seperate instructive staff and were located in separate buildings. The Bengali School was managed by the Regular Bengali School Department or Sub-Committee of the School Society, whereas the English School was managed by the English Schools Department cr Sub-Committee. The instructive staff of the Bengali School consisted of Bengalee pundits and gurus, whereas the teahchers or masters of the English School were youngmen educated at the Hindoo College and the Society's English Schools. In Arpooly they were housed in separate bungalows, that is, bamboo-and-mud structure. True, the two schools were accommodated under the same roof after their removal to Pataldanga but still they maintained their separate entitites. Otherwise Mr. Hare would not have said after the conflgaration, 'the Committee were obliged to suspend the Bengalee Department which it has never since been able to resume."

Another point to note is that the whole of the Arpooly Pathsala was not taken to Pataldanga but only its best boys; on the other hand, the entire English School was removed. Let us mark the proportion. At the end of 1832 the Pathsala contained 260 scholars and the English School 113. By September 1833 when they were removed the number of pupils in both the schools must have increased. Assuming the numbers to be what they were at the end of 1832, only 87 boys out of a total of 260 of the Pathsala were taken to Pataldanga. This constitutes exactly one-third of the total strength of the school. The remaining two-thirds were dismissed.

Another significant fact that deserves notice in this connection is the total absence of Bengali language and literature from the curriculum of every one of the five classes of Arpooly English School, because Bengali was taught not in the English school, but in the Pathsala which was an entirely separate institution. Had the two been integrated in any way Bengali was bound to have found a place among the subjects of study of the English School.

4. That only the Arpooly English School was amalgamated with the Pataldanga English School. So Babu Pearychand Mitra is right and both Babu Kishorychand Mitra and Raisaheb Ishanchandra Ghosh are wrong.

5. That the year of foundation of the Hare School is not 1818. In which year was it founded then ? Informations furnished by Hare in the first of the above two reports, it should be 1822. But I doubt, either Hare's memory played him false or his mathematics went wrong. For David Hare of April 1833 is contradicted by David Hare of April 1823. On April 14, 1823 all the members of the Committee of Management of the Calcutta School Society including their European Recording secretary, David Hare, signed a petition to the then Governor-General, Mr. John Adam, Soliciting a monthly aid of Rs. 500 from
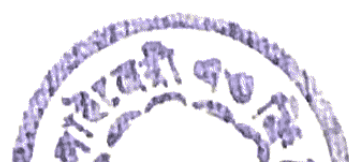
his Government. In that long petition they brought to the notice of the Governor-General the extremely low state of the Society's finances and the nature and extent of the Society's activities under each of the three Departments of Regular Bengali Schools, Indigenous Bengali Schools and English Schools. They pointed out that for want of funds they had to relinquish all the Regular Bengali Schools supported by the Society. (The Arpooly Pathsala was an execption, because it was not supported by the Society — R. M.). Under the English School Department the only expenditure they mentioned was the tution of 30 best boys selected from different indigenous schools in the Hindoo College at a total cost of 150 sicca rupees paid by the Society. They did neither mention the Arpooly English School nor the Pataldanga School. That means even on April 14, 1823 not a single English school of the Society existed. Had they existed the expenditure incurred by the Socitey on their account would certainly have been mentioned. It would be reasonable to suppose that it was only after the Society had received from the Government the monthly grant of sicca ruppes 500 from May 1, 1823 that first the Arpooly English School and then the Pataldanga English School were established in quick succession in course of the same year — 1823, as Hare's nature brooked no delay. Hence both the English Schools were established in 1823 and they were amalgamated into one school in 1834.

This conclusion is further reinforced by Babu Pearychand Mitra who, strictly on the basis of the Calcutta School Society's Report, has mentioned 1823 as the year of the foundation of the Arpooly English School. Raisaheb Ishanchandra Ghosh has on this point simply repeated Perarychand. It is curious to note that Pearychand omitted to mention the year of foundation of the Pataldanga English School just as Mr. Willam Adam mentioned, on the basis of the same School Society's Report, 1823 as the year of the foundation of the Pataldanga English School but omitted to mention the year of foundation of the Arpooly English School. That omission on the part of Pearychand drove Ishanchandra to presume and he dated 1822 the year of foundation of the Pataldanga School .

The forgoing evidences lead to but one conclusion — that the Hare School was established in the year 1823 and not in the year 1818.

ADDENDA

1. After David Hare's death, his School came under the management of the Committee of Managers of the Hindu College from June 13, 1842.
2. The mural tablet to the memory of David Hare was set up by the teachers and students of Hare School in June, 1847.
3. The statue of David Hare, executed by sculptor Baily in England, was installed in Calcutta in 1847.

দ্বিতীয় পর্ব

‘কলিকাতা’ নামের ব্যুৎপত্তি

বিতর্ক   চিঠিপত্র

১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সন ১৩৪৫ সালে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধের ভ্রমপ্রদর্শনাত্মক প্রতিবাদ, সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর পরে, 'এক্ষণ'-পত্রিকায় (সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) প্রকাশিত করিয়া শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র মহাশয় আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। মিত্র-মহাশয়ের প্রতিবাদ-প্রবন্ধটি নাতিক্ষুদ্র (৩৬ পৃষ্ঠাময়)।[১] এই প্রবন্ধটি কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে মিত্র মহাশয়ের অধ্যয়ন ও অন্বেষণের পরিচায়ক হইলেও, এবং ইহাতে নির্বৈয়ক্তিক বিচারের স্থলে বহুশঃ উকিলের-জেরায় এবং বিদ্রূপ-বক্রোক্তি-প্রয়োগে লেখকের শক্তির অনাবশ্যক প্রকাশ থাকিলেও, এই প্রবন্ধের অনেকগুলি কথা মূল বা প্রধান আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অবান্তর। মিত্র-মহাশয়ের এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার পরে, কতকগুলি সুধী সুহৃদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ও তাঁহাদের দ্বারা আহৃত আমার পক্ষে অজ্ঞাতপূর্ব বহু নূতন তথ্য জানিতে পারিয়া (এই তথ্যগুলি শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা ও অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের লিখিত মিত্র-মহাশয়ের প্রতিবাদের দুইটি বিভিন্ন প্রতিবাদ-প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে), আমার মূল প্রবন্ধের মুখ্য বক্তব্যগুলি সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের কোনও কারণ দেখিতেছি না।

প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি যে, কোনও মত প্রকাশ-কালে আমার মত-ই যে অভ্রান্ত এবং তাহার সংশোধন অসম্ভব, এরূপ ধৃষ্টতা আমি পোষণ করি না। উপলব্ধ তথ্যের আধারে স্থাপিত কোনও মত গ্রহণ করিলে, নূতন তথ্য অথবা নবীনতর ব্যাখ্যার সাহায্যে যতদিন না সেই মত সংশোধন-যোগ্য বা পরিত্যাগের যোগ্য মনে হয়, ততদিন সেই মত-ই স্বীকার করি — নূতন মত যুক্তিযুক্ত মনে হইলে, পুরাতন মত বর্জন করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করি না। মিত্র-মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদে এমন কিছু নূতন তথ্য বা ব্যাখ্যা বা যুক্তি দেন নাই, যাহাতে আমার মত আমি পরিত্যাগ করিতে পারি। মূল প্রবন্ধে আমার প্রধান বক্তব্য যে, 'কলি-চূন' বা 'চূন' প্রস্তুতের জন্য 'কাতা' অর্থাৎ শামুক বা গুগলির খোলার আগুনে-পোড়ানো স্তূপ বা সমষ্টি — 'কলি+কাতা' এই দুইটি সার্থক এবং এক সময়ে বহু-প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ যোগে গঠিত সমস্ত-পদ মাত্র— এই দুইটি সার্থক বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক, এখানে শামুক বা গুগলি পোড়াইয়া চূন তৈয়ারী করা হইত বলিয়াই এই স্থানের নাম 'কলি-কাতা' (পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় 'কইল্-কাতা', কলিকাতার কথ্য ভাষায় 'কল্-কাতা, ক'ল্কেতা')। পৃথিবীর নানাদেশে ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় প্রাপ্ত আর সমস্ত স্থান-বাচক বা ব্যক্তি-বাচক নামের-ই মতো, এই 'কলিকাতা' নামটি-ও নিরর্থক নহে। অবশ্য এমনটি হইয়া থাকে যে ভাষার পরিবর্তন-হেতু, মূল শব্দের ধ্বনি-বিকারের ফলে সেই শব্দের আদিম রূপে এরূপ পরিবর্তন আসিয়া যায় যে, তাহাতে তাহার সার্থক মূল রূপটি বাহির করা গবেষণা-সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, এবং অনেক সময়ে তাহা দুঃসাধ্য, ক্বচিৎ বা নানা কারণে অসাধ্য হয়। শামুক-পোড়া চূন অর্থে 'কাতা-চূন' বাঙ্গালাদেশের বহুস্থলে এখনও প্রচলিত।

'কাতা' শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহা মিত্র-মহাশয় দিয়াছেন, তাহা প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা অভিধানেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার সংশয় আছে তবে যতদিন না সমীচীনতর ব্যুৎপত্তি দিতে পারিতেছি, ততদিন পর্যন্ত প্রশ্নটিকে 'খোলা' বা অমীমাংসিত-ই রাখিতে হয়। আমার মনে হয় — 'কলি' ও 'কাতা' দুইটি-ই অনার্য্য ভাষার শব্দ। এই অনুমান অবশ্য প্রমাণিত কথা নহে।

কলিকাতা-নগরের মধ্যে ও কলিকাতার আশে-পাশে, বাঙ্গালা দেশের অন্যত্রও, যে কাতা-চূন অর্থাৎ শামুক-পোড়া চূনের কারবার ছিল না, মিত্র-মহাশয়ের প্রবন্ধে 'চূন'-বিষয়ক সংকলন-অংশটি পাঠ করিয়া এরূপ সংশয়, সাধারণ অনভিজ্ঞ পাঠকের মনে জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ সংশয়ের পূর্ণ নিরসন প্রিয়বর শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরার লেখা মিত্র-মহাশয়ের প্রতিবাদের প্রতিবাদে পাওয়া যাইবে। রসপুর-কলিকাতা—মিত্র-মহাশয়ের সংশোধিত 'রাসপুর' নহে এবং তাঁহার কল্পিত 'ছোট-কলিকাতা' সম্বন্ধে, কতকগুলি মারাত্মক ভ্রান্তিরও সংশোধন শ্রীযুক্ত সাঁতরার প্রতিবাদে মিলিবে। শ্রীযুক্ত সাঁতরার এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধে, রসপুর-কলিকাতার থানার দারোগা মহাশয় সদ্ভাব-প্রণোদিত হইয়া ১৩৪৫ সালে আমায় যে-তথ্য জানাইয়াছিলেন, তিনিও অযথা এবং অনুচিত শ্লেষের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। আশা করি বাঙ্গালাদেশে গৃহ-নির্মাণে এবং গৃহের পলস্তারা প্রভৃতি কাজে কাতা-চূন বা শামুক-পোড়া চূনের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা, মিত্র-মহাশয় শ্রীযুক্ত সাঁতরার প্রবন্ধ হইতে পাইবেন। আমি নিজে এই প্রবন্ধটি হইতে অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি, এই হেতু শ্রীযুক্ত তারাপদবাবুর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। অধিকন্তু, এই প্রবন্ধটি লিখিয়া প্রকাশিত করায়, মিত্র-মহাশয়ের সব কথার জবাব দিবার দায়িত্ব হইতে উদ্ধার পাইয়াছি -- আমার হইয়া কতকগুলি মূল কথার বিচার তিনি-ই করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে অনাবশ্যক বিস্তর পরিশ্রম হইতে আমি মুক্তি পাইয়াছি।

'কলিকাতা' মহল বা গ্রাম বা নগরের প্রাচীন উল্লেখ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরার প্রবন্ধদ্বয় আশা করি মিত্র-মহাশয়ের সমস্ত সংশয় অপনয়ন করিবে।

ইংরেজী অক্ষরে লেখা Chunarytollah নামটি আমি অনবধানতা এবং ভ্রান্তিবশত বাঙ্গালায় 'চুনারীতলা' রূপে লিখিয়াছিলাম। ইহা 'চুনারীটোলা'ই হওয়া উচিত — আমি আমার এই ভ্রম স্বীকার করিতেছি। তবে 'টোলা' এবং 'তালাও' হইতে বাঙ্গালায় 'তলা' — মিত্র-মহাশয়ের প্রস্তাবিত এই 'গবেষণা'র কোনও মূল্য নাই — শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে তাহা সুস্পষ্ট। 'চুনারী' শব্দের যে-ব্যাখ্যা মিত্র-মহাশয় করিয়াছেন, ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব উভয় দিক হইতেই তাহা একেবারেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি না।

অন্য যে-সব কথা মিত্র-মহাশয়ের প্রতিবাদে আছে, আমার মুখ্য বক্তব্যের পক্ষে সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক — কেবল 'কচ্চায়ন' মাত্র। ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহার করিয়া ব্যাপারটিকে উকীলের সওয়াল-জবাবের ধরনে জটিল করিয়াই তুলিয়াছেন এবং স্বকপোল-কল্পনারও আশ্রয় লইয়াছেন।

একটি বিচার্য্য বিষয় — কলিকাতায় আর্মানীদের আগমন ও বসবাস। মিত্র-মহাশয় ইংরেজ লেখক C. R. Wilson-এর একটি সাগ্রহ অনুমানের সমর্থন করিতে চাহেন বলিয়া মনে হয় যে Rezabeebeh রেজাবীবের প্রস্তরময় সমাধি ফলকটি বাহির হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল।[১] এ বিষয়ে Wilson সাহেব-ও কোনও প্রমাণ দাখিল করিতে পারেন নাই। রেজাবীবের সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ কথা কয়টি, ১৬৩০ সালের পূর্বে আর্মানীদের কলিকাতায় আগমন ও অবস্থানের একটি প্রধান প্রমাণ। ইহাকে নস্যাৎ করিতে হইলে, কল্পনা করিতে হয় যে 'কে বা কাহারা' বিদেশ হইতে পাথরখানা কলিকাতায় আর্মানীদের গোরস্থানে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছিল — কেন, কবে, কী উদ্দেশ্যে, তাহা কেহই জানে না। এ যেন তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিচার-জাত অনুমান — ঘানিতে বাঁধা ঘানি-টানা বলদ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়াইতেছে — তাহাতে ঘণ্টার আওয়াজে ঘানির মালিক তৈলিক দূর হইতে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে যে গোরু ঠিকই ঘুরিতেছে; তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আপত্তি তৈলিক এই বলিয়াই খণ্ডন করিয়াছিল যে, তাহার গোরু ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নাই। মিত্র-মহাশয়ের ন্যায় অতি সাবধানী লেখকের মানসপটে ভবিষ্যতে যে সন্দেহ উঠিতে পারে, সে-কথা ঘানির বলদরূপী আর্মানী ঐতিহাসিক মেসরভ্ সেথ্ মহাশয়ের মনে উদিতই হয় নাই।

১৬৯০ সালে Job Charnock যোব্ চার্নক ও তাহার সঙ্গী ইংরেজদের আগমন বা বসবাসের পূর্ব হইতেই কলিকাতায় ও তাহার আশে-পাশে আর্মানীদের ব্যবসায়-ঘটিত ও রাজনীতিক প্রাধান্যের প্রমাণ আছে। নূতন করিয়া কোনও ব্যবসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ একটি আগন্তুক সমাজের পক্ষে এতটা প্রাধান্য অনুমান করা কঠিন। আর্মানী বণিক খোজা ইস্রায়েল সরহাদের কথা সুবিদিত — ইনি সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে ১৬৯৭-১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, নবাগত ইংরেজদের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন, দিল্লীর মোগল রাজকুমার ও ভবিষ্যৎ সম্রাট্ ফর্রোখ-সিয়ারের নিকট হইতে ১৬,০০০ টাকার নজরানার বিনিময়ে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর, এই তিনখানি গ্রাম ক্রয়ের হুকুমনামা পাওয়াইয়া দেন। ১৬৯০ সালের আশে-পাশে কলিকাতাতেই আর্মানীদের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, সম্প্রতি আবিষ্কৃত আর্মানী বণিক্ Hovhannes Joughayetsi হোভ্হান্নেস্ জুঘায়েৎসির ledger বা দৈনন্দিন লেন-দেনের হিসাবের পাকা খাতা হইতে। (দ্রষ্টব্য—'The Ledger of the Merchant Hovhannes Joughayetsi' by Dr. Khachikian. *Journal of the Asiatic Society,* vol. VIII, no. 3, Calcutta 1966, issued May 1968, pp. 153-186, বিশেষ করিয়া দ্রষ্টব্য pp. 162-163)। ইনি ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন, পরে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে সমগ্র উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেন, নেপালে যান, নেপাল হইতে তিব্বতে — লাসায় — সেখানে পূর্ব হইতেই আর্মানী ব্যবসায়ীরা একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে জুঘায়েৎসি তিব্বত হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন, পাটনা হইয়া হুগলীতে আসেন, এবং হুগলী হইতে ১৬৯৩ সালে, যোব্ চার্নকের কলিকাতায় আসিবার তিন বৎসর পরে, কলিকাতায় আসেন, এবং সেখানে এক ইংরেজের কাছে ২১৩ টাকায় ২৫সের সৌঁফ বা মৌরী বিক্রয় করেন। ইহার পরের বিবরণ আর কিছুই পাওয়া যায় না, কারণ খাতার এইখানেই শেষ।
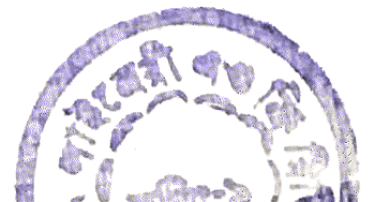
১৯৫৮ সালে কলিকাতা হইতে স্থানীয় আর্মানী গির্জার পুরোহিত Ter Aramais Mirzaian তের্ আরমাইস্ মীর্জাইআন্ একখানি সচিত্র বই বাহির করেন — *A Short Record of Armenian Churches in India and the Far East*। ইহাতে ১৬৩০ সালের রেজাবীবের সমাধি-ফলকের প্রামাণিকতা বিনা-প্রশ্নে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এই বইয়ের ৩৮-এর পৃষ্ঠায় একটি আর্মানী মহিলার ছবি দেওয়া হইয়াছে। ছবিটির তলায় ছাপা আছে — Begum Sarkiesian, said to be the First Armenian Lady who came in Calcutta in 1620। অর্থাৎ, কলিকাতায় রেজাবীবের মৃত্যুর ১০ বৎসর পূর্বে এবং যোব্ চার্নকের কলিকাতায় আগমনের ৭০ বৎসর পূর্বে, এই আর্মানী মহিলাটি কলিকাতায় আসিয়া (অনুমান করা যায়, স্বজাতীয় পুরুষ আত্মীয়দেরই সঙ্গে তিনি আসেন) অবস্থিতি করেন। এই ছবিখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাই — উত্তরে পুরোহিত শ্রীযুক্ত মীর্জাইআন (ইনি আমার পরিচিত মিত্র, বহুদিন কলিকাতায় ছিলেন, এখন অস্ট্রেলিয়ায় গিয়া Sidney সিড্‌নিতে আর্মানী গির্জার পুরোহিত হইয়া আছেন) এই কথা লেখেন (ইহাঁর এই পত্রখানি আমার কাছেই আছে) :

> While I was parish priest in Calcutta, one evening I visited Mrs. Avdal, the mother of Mrs. Amy Sarkis. In her drawing room I saw a portrait of an Armenian lady dressed in the fashion of the early seventeenth century. On my enquiring about this painting and its subject, my hostess went into the adjoining room and brought from there a small picture in gilt-metal frame, a miniature of that very same portrait, the picture itself an oval of perhaps three inches height. On the back of this, into the gilt-metal frame, were engraved the words 'Begum Sarkiesian, Calcutta 1620'.
>
> Mrs. Avdal has now been dead many years, and unfortunately I heard, when I visited Bangalore, South India, last year, and enquired, among other things, also about the present whereabouts of this miniature, that it had been lost trace of. Mrs. Amy Sarkis told me that on the death of her mother many of her belongings were auctioned and thus scattered. A letter from you published in an Armenian periodical might bring it to light again, who knows?

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত বইখানিতে এই ছবিখানি শ্রীযুক্ত মীর্জাইআন কর্তৃক ছাপানো হইয়াছিল, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য মনে করিয়া। এবং এই বই বাহির হয় মিত্র-মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইবার ১২ বৎসর পূর্বে। এই ছবির প্রকাশে ঐতিহাসিক সততা বিদ্যমান, ইহা আশা করা যায়। বিপক্ষে অন্য প্রমাণের অভাবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা এই ছবিখানিকে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরেজদের আগমনের ৭০ বৎসর পূর্বে, কলিকাতায় আর্মানীদের বসবাসের একটি প্রমাণ রূপে লইতে পারি।

প্রত্যুত্তর

তাঁর প্রতিবাদের প্রথম অংশে সুনীতিবাবু কতকগুলি ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন। শেষের অংশে কলিকাতায় আর্মানিদের আগমন ও বসবাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। নিজস্ব মতপ্রকাশে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সুতরাং সে-বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমি এখানে শুধু আর্মানিদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের বিচার করছি।

আর্মানি সমাধিক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৬৩০ সালের রেজাবিবির কবর সম্বন্ধে C. R. Wilson-এর মতের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যে, C. R. Wilson-এর অনুমান 'সমাধি-ফলকটি বাহির হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। এবিষয়ে Wilson সাহেব-ও কোনও প্রমাণ দাখিল করিতে পারেন নাই'। সুনীতিবাবু যদি উইলসন সাহেবের মন্তব্যটি ফের ভাল করে পড়ে দেখেন তো দেখবেন তিনি পাথরটি বাইরে থেকে আনা হয়েছিল একথা বলেননি। বলেছেন, আনা 'হয়ে থাকতে পারে'। উইলসন সাহেবের কথা উদ্ধৃত করছি : 'It *may* well have been brought to Calcutta from elsewhere' ; এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে ও কলিকাতায় ঘটেছে পরের বাক্যেই উইলসন সাহেব সেকথা বলেছেন: 'An inscribed stone had recently been found in St. John's churchyard which must somehow have come form China' — আমার যতদূর মনে পড়ে পাথরটি পিকিং শহর থেকে এসেছিল। কিন্তু এইটিই উইলসন সাহেবের শেষ বক্তব্য নয়। তারপরেই তিনি বলেছেন: 'Even if the stone is *in situ*, it does not prove the existence of an Armenian colony. In India a person must be buried where he dies. If an Armenian voyager died in a ship near Calcutta, it would be necessary to bury the body there' ; এরকম ঘটনা যে ঘটে তারও নজির আছে। Emily Warren নামে এক ইংরেজ মহিলা ১৭৮২ সালের মে-জুন মাসে বিলেত থেকে কলকাতায় আসবার পথে ডায়মন্ড হারবারের দক্ষিণে কুলপী নামক গ্রামের কাছে নৌকাতেই মারা যান। তাঁর সহযাত্রী Robert Pott তাঁকে কুলপীর গঙ্গাতীরে কবর দিয়ে তার উপর একটি সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে দেন। সেটি এখনও আছে। স্থানীয় লোকে বলে মানাবিবির গোর বা কুলপীর মঠ। উইলসন সাহেবের এই শেষ মন্তব্য সম্বন্ধে সুনীতিবাবু তো উচ্চবাচ্য করেননি!

তারপরেই তিনি তর্কচূড়ামণির বিচারসংক্রান্ত অনুমানের কথা তুলে লিখেছেন : 'মিত্র-মহাশয়ের ন্যায় অতি সাবধানী লেখকের মানসপটে ভবিষ্যতে যে সন্দেহ উঠিতে পারে, সে-কথা ঘানির বলদরূপী আরমানী ঐতিহাসিক মেসরভ্ সেথ্ মহাশয়ের মনে উদিতই হয় নাই।' সুনীতিবাবুর এটি ভুল ধারণা। মেস্‌রোভ্ সেথ্ সাহেব ১৮৯৪ সালের অগস্ট মাসে আর্মানি সমাধিক্ষেত্রে রেজাবিবির কবরটি আবিষ্কার করেন। ঠিক পরের বছর কিংবা তার পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৫ কি ১৮৯৬ সালে উইলসন সাহেব পূর্বোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। মেস্‌রোভ্ সাহেব এর জবাব দিতে পারেননি। তিনি নীরব রইলেন। তার প্রমাণ মেস্‌রোভ্ সাহেবের বই থেকেই পাওয়া যায়। তিনি *History of the Armenians in India* পুস্তকটি প্রকাশ করেন ১৯৩৭ সালে। তাতে পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে। এতে রেজাবিবির কবরের কথা ও ১৬৩০ সাল বরাবর কলিকাতায় আর্মানি উপনিবেশের কথা তিনি বলেছেন বটে, কিন্তু বিশেষ জোর দিয়ে নয়, তালগাছে বুড়ি ছুঁইয়ে রাখার মতন করে বলেছেন। অন্যদিকে সেই

বইতেই লিখেছেন : 'Armenians formed their first settlement in Bengal in the year 1665 by virtue of a farman issued by Moghul Emperor Aurangzeb granting them a piece of land at Saidabad with full permission to form a settlement there' — এই উক্তির দ্বারা সেথ্‌সাহেব ১৬৩০ সালে কলকাতায় আর্মানি উপনিবেশের কথা কি খণ্ডন করলেন না? তাঁর কোন কথাটা আমরা সত্য বলে ধরব? এই রকম দুটি একান্ত পরস্পরবিরোধী উক্তি রেজাবিবির কবর আবিষ্কারের ৪৩ বছর পরেও তাঁর গ্রন্থে স্থান পেতে পারল কী করে?

এরপর সুনীতিবাবু নিজেই মেস্‌রোভ্ সেথ্-এর থিওরির সম্বন্ধে দুটি তথাকথিত প্রমাণের উল্লেখ করেছেন! একটি হচ্ছে হোভ্‌হান্‌নেস জুঘায়েৎসির হিসাবের খাতা, দ্বিতীয়টি বেগম সারকিসিয়ান নাম্নী এক আর্মানি মহিলার ১৬২০ সালে কলিকাতায় আগমনের কথা। আর্মানি বণিকটির হিসাবের খাতা থেকে জানা যায় যে তিনি ১৬৯৩ সালে অর্থাৎ যোব্ চার্নকের মৃত্যুর পর কলিকাতায় এসেছিলেন বাণিজ্য ব্যাপদেশে। এই বণিকের প্রসঙ্গ সুনীতিবাবু কেন তুললেন আমি বুঝতে পারলাম না। এ থেকে কি প্রমাণিত হয় যে ইংরেজদের আগমনের ৬০ বছর আগে কলিকাতায় আর্মানিদের উপনিবেশ ছিল? বণিকটি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সঙ্গে আনেননি, একা এসেছিলেন, এখানে বসবাসের উদ্দেশ্যে নয়, পণ্য কেনাবেচার উদ্দেশ্যে, তাও ইংরেজদের আসার তিন বছর পরে। কেনাবেচা হয়ে যাবার পর নিশ্চয়ই স্বস্থানে ফিরে গিয়েছিলেন। আর্মানি মহিলাটির প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু লিখেছেন: 'কলিকাতায় রেজাবীবের মৃত্যুর ১০ বৎসর পূর্বে, এবং যোব্ চার্নকের কলিকাতায় আগমনের ৭০ বৎসর পূর্বে, এই আর্মানী মহিলাটি কলিকাতায় আসিয়া (অনুমান করা যায়, স্বজাতীয় পুরুষ আত্মীয়দেরই সঙ্গে তিনি আসেন) অবস্থিতি করেন।' তারপর আর্মানি পুরোহিতের লেখা একটি চিঠি তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে জানা যাচ্ছে যে এই মহিলাটির একটি গিল্‌টি-করা ফ্রেমে আঁটা ছোট ছবির পিছন দিকে লেখা ছিল: 'Begum Sarkiesian, Calcutta 1620.' ; সুনীতিবাবু এই থেকে ধরে নিয়েছেন যে এই মহিলার সঙ্গে তাঁর পুরুষ-আত্মীয়েরাও এসেছিলেন এবং সবে মিলে তাঁরা কলিকাতায় বসতি করেছিলেন। এই দুটি অনুমানের কোনোটিই ঐ ছবি থেকে প্রমাণিত হয় না। ছবিটি মাত্র একক মহিলার, তার মধ্যে তাঁর পুরুষ-আত্মীয়দের ছবি নেই। যদি তাঁরা এসে থাকতেন সকলেরই ছবি একসঙ্গে উঠত। দ্বিতীয়ত, কোনোই প্রমাণ নেই যে মহিলাটি কলিকাতায় বসবাস করেন। কলিকাতায় কিছুদিন থেকে তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে ফিরে গিয়েও তো থাকতে পারেন। যদি এখানেই অবস্থিতি করে থাকেন তাঁর কবরও থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তা নেই।

যদি ঐ মহিলার নাম, ধাম ও তারিখ সমসাময়িক কালে লেখা হয়ে থাকে মাত্র তাহলেই ঐ লেখার প্রামাণিকতা স্বীকার করা যায়। কিন্তু ঐগুলি যে সমসাময়িক কালে লেখা হয়নি, তার প্রমাণ হচ্ছে :

১. ১৬২০ সালে 'কলিকাতা' নামে কোনো গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না।

২. ১৬২০ সালে সমস্ত ভারতবর্ষে মাত্র একটি জায়গায়, সুরাটে, ইংরেজদের কুঠি হয়েছে। সুতরাং ঐ সময়ে বাংলা দেশে বসবাসকারী, কি স্বদেশি কি বিদেশি, কারো পক্ষেই ইংরেজি জানা সম্ভব ছিল না। তাহলে উপরোক্ত মহিলার নাম, ধাম ইংরেজিতে লেখা হল কী করে? মহিলাটি কি ইংল্যান্ডে গিয়ে ইংরেজি শিখে নিজের নাম ছবির পিছনে স্বাক্ষর করেছিলেন?

এ দাবি কিন্তু পাদ্রি সাহেব করেন না। তাহলেই বুঝতে হবে যে অনেক পরবর্তী কালে যখন কলকাতা একটি বিখ্যাত শহর হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন কোনো ইংরেজি-জানা আর্মানি স্বজাতির গৌরববৃদ্ধির জন্য ঐগুলি ইংরেজিতে লিখেছিলেন।

৩. যাঁদের বাড়িতে ঐ নাম-লেখা ছবিটি পাওয়া গেছে তাঁরা কি মহিলাটির সঙ্গে বা পূর্বে কলিকাতায় এসেছিলেন। যদি এসে থাকতেন তাহলে তাঁদেরও নামের উল্লেখ থাকত। কিন্তু তাঁরা এসেছিলেন বলে কোনো আর্মানিই দাবি করেননি। তবে তাঁরা ছবিটি পেলেন কী ক'রে?

৪. যে মেস্‌রোভ সেথ্ কলিকাতার প্রত্যেক আর্মানি পরিবারের হাঁড়ির খবর রাখতেন, তিনি তাঁর গ্রন্থে এই 'প্রাচীন' ছবিটির কথা উল্লেখ করেননি।

সুনীতিবাবু আর্মানি বণিক খোজা ইসরায়েল সরহদের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন : 'ইনি দিল্লির মোগল রাজকুমার ও ভবিষ্যৎ সম্রাট্ ফর্‌রোখ-সিয়ারের নিকট হইতে সুতানুটী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর, এই তিনখানি গ্রাম ক্রয়ের হুকুমনামা পাওয়াইয়া দেন।' এটি ভুল — ফর্‌রোখ্ শিয়ারের কাছ থেকে নয়, ফর্‌রোখ্ শিয়ারের পিতা আজিম-উশ্‌-শানের কাছ থেকে হুকুমনামা পাইয়ে দেন। খোজা সরহদ কলকাতার অধিবাসী ছিলেন না — ছিলেন হুগলির।

'চুনারীতলা' লেখা যে তাঁর ভুল হয়েছে, 'চুনারীটোলা' লেখাই উচিত ছিল সেকথা সুনীতিবাবু স্বীকার করেছেন।

'টোলা', 'তালাও' ও 'তলা' এই তিনটি সম্বন্ধে আমার মত তিনি মূল্যহীন মনে করেন। করুন, তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। ওটি আমার মত, অন্য কারুর উপর চাপাবার অভিপ্রায় আমার আদৌ নেই। তাছাড়া কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তির সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এই মত যে আমি একাই পোষণ করি না, 'বাঙ্গালা-ভাষার-অভিধান'-প্রণেতা ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসও পোষণ করেন, সেকথা আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি। ঐ অভিধানে তিনি 'তলা' শব্দের এইরূপ অর্থ লিখেছেন :

'তলা [তল দ্রঃ] বি, নিম্নভাগ। ২ পাদদেশ; মূলদেশ। প্র — গাছতলা। ৩ [টোলা দ্র.] পল্লী ; প্রদেশ ; স্থল ; স্থান। প্র — কালীতলা। শিবতলা ; গাজন তলা।'

'চুনারি' শব্দের যে-ব্যাখ্যা আমি করেছি, ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব উভয় দিক থেকেই তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে সুনীতিবাবু মনে করেন। আমি ধ্বনিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব কোনোটাই জানি না। তবুও আমার মনে হয় না (শব্দটির চল্‌তি রূপ 'চুনারি' নয়, 'চুনুরি) 'চুন্‌রি' ও 'চুনুরি'র মধ্যে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে।

এই 'কৈফিয়ৎ'-পত্রে সুনীতিবাবু 'কাতা' শব্দের একটি নতুন অর্থ দিয়েছেন, যা তাঁর মূল প্রবন্ধে ছিল না। সেটি হচ্ছে —'শামুক বা গুগলির খোলার আগুনে পোড়ানো স্তূপ বা সমষ্টি।' তিনি এই নতুন অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন : 'কাতা শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহা অনুমান করিতেছি তাহার পুরা সমর্থন-সূচক প্রমাণ এখনও পাই নাই।' আমার বক্তব্য, শামুক বা গুগ্‌লির খোলাকে আগুনে পোড়ালে আর খোলার স্তূপ থাকে না, চুনের স্তূপ হয়।

২ সুকুমার সেন

'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রান্তি-অপনোদনকল্পে শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র যে-প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ সুনীতিবাবুই

করিবেন। সুনীতিবাবু কালিদাসের পিতা নহেন, তিনি পিতামহ ভীষ্ম। সুতরাং "পুরো রে বাপারে" ব্যাপার নয়।

রাধারমণবাবুর 'মনে হয়' যে শুধু কলিকাতার ব্যুৎপত্তিতেই নয়, সুনীতিবাবুর 'ইতিহাসাদি আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়েই ভুল'। তাহার পরেই তিনি সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছেন, 'আমার লেখায় ভুল থাকলে যদি কোনো সহৃদয় পাঠক তা দেখিয়ে দেন বিশেষ উপকৃত হব'। সর্বজনবরেণ্য শব্দবিদ্যাবিদের ভুল দেখাইতেছেন রাধারমণবাবু, আবার তাঁহার ভুল — যদি থাকে — দেখাইবেন 'সহৃদয়' পাঠক!! তাহা হইলে রাধারমণবাবুর সুপ্রিম কোর্ট জ্ঞানবুদ্ধি নয়, হৃদয়!!!

রাধারমণবাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ পৃষ্ঠপোষণপূর্বক (—'সুকুমারবাবুর কলমও থেমে থাকেনি।'—) ঈষৎ কর্ণমর্দন করিয়া দিয়াছেন (—'অন্তত আরও একটি জায়গা শ্রীযুক্ত সেন-এর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে — সেটি নিমাইতীর্থ। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে নিমাই-এর বয়স ছিল ১০ বছর।') আমি রাধারমণবাবুর 'সহৃদয় পাঠক' বলিয়া দাবি করিতেছি না, তবুও দুঃখের সহিত তাঁহার নিদারুণ ভুল দেখাইতে বাধ্য হইতেছি। নিমাইতীর্থের সঙ্গে নিমাই-চৈতন্যের কোনই সম্পর্ক ছিল না। রাধারমণবাবু যদি কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' বইখানির পাতা উলটাইতেন তাহা হইলে প্রাসঙ্গিক স্থানে এই কয় ছত্র তাঁহার চোখে অবশ্যই পড়িত (এবং নিদারুণ ভুলটি তিনি করিতেন না):

> বামে বাঁকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে
> জমিন বাহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে।
> পূজিল নিমাইতীর্থ করিয়া উত্তম
> নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপাম।

অন্য গ্রন্থেও পাইয়াছি এই কথা — 'নিম্বের বৃক্ষেতে যথা ওড় ফুল ফুটে'। নিম গাছে জবা (বা জবার মতো) ফুল! অর্কিড হইতে পারে।

কলিকাতার প্রতি রাধারমণবাবুর এতই বিমুখতা যে তিনি আইন-ই-আকবরীর 'মহল' বা 'পরগণা' তালিকা হইতে এ-নামটি নিষ্কাশিত করিতে চাহিয়াছেন। বলিতে দুঃখ হইতেছে, কলিকাতা পরগণার উল্লেখ সপ্তদশ শতাব্দীর রচনায় মিলিয়াছে। সায়েস্তা খানের সুবেদারি আমলে নিমতে গ্রামের কৃষ্ণরাম দত্ত 'রায়মঙ্গল' (ও অন্যান্য গ্রন্থ) রচনা করিয়াছিলেন। রায়মঙ্গলের আত্মপরিচয় অংশে এই কথা আছে : অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম কলিকাতা পরগণা তায় ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্বকূল নিমিতা নামেতে গ্রাম যায়।

রাধারমণবাবুর প্রবন্ধে প্রচুর চমকপ্রদ উক্তি আছে। সে-বিষয়ে বলিবার অনেক কথা আছে কিন্তু লিখিবার সময় নাই। শুধু একটির সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজী লিপ্যন্তরে 'তলা' আর 'টোলা' ছিল অভিন্ন— 'tollah'। সে দিকে কোন খেয়াল না রাখিয়া রাধারমণবাবু অযথা নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'Dharrumtollah'-র উচ্চারণ হওয়া উচিত 'ধর্মটোলা'! রাধারমণবাবু কি পশ্চিমবঙ্গের কোন পুরানো গ্রামে কখনো যান নাই এবং গ্রামে ও সহরে কোথাও কি 'শিবতলা', 'কালীতলা', 'মনসাতলা', 'ধর্মতলা', 'ঠাকুরতলা' ইত্যাদি দেখেন অথবা শোনেন নাই? কলিকাতায় কি এখনও 'কালীতলা', 'ষষ্ঠীতলা', 'মদনমোহনতলা', 'মানিকতলা' নাই? এ নামগুলিও কি

রাধারমণবাবুর মতে 'কালীটোলা', 'যষ্ঠীটোলা', 'মদনমোহনটোলা', 'মানিকটোলা' হওয়া উচিত? হায় রামমাণিক্য!

উ ত্ত রে

সুকুমারবাবু বলেছেন নিমাইতীর্থের সঙ্গে নিমাই-চৈতন্যের কোনোই সম্পর্ক নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' থেকে চারটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শেষের দুটি পঙ্ক্তি এই:

পূজিল নিমাইতীর্থ করিয়া উত্তম
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপাম।

নিমগাছের নাম যে নিমাইগাছ হতে পারে, এবং তীরে নিমগাছ থাকার দরুণ নদীর ঘাট তীর্থে পরিণত হয় এ-কথা সত্যই আমার অজ্ঞাত ছিল। আমার ধারণা ছিল বাংলার সর্বজনবিদিত শচীনন্দনের নামই নিমাই এবং তাঁরই পূজ্য পাদস্পর্শে বৈদ্যবাটির গঙ্গার ঘাট তীর্থের গৌরব লাভ করেছে। যদি বলা হয় নিমগাছে জবাফুল ফোটা রূপ অলৌকিক ঘটনার জন্যই ঘাটটি তীর্থ হয়েছিল তাহলে ঘাটের যথার্থ নাম হওয়া উচিত ছিল শুধু নিমাইতীর্থ নয়, 'নিমাই-জবাই তীর্থ'! কিন্তু তা হয়নি। যা হোক এখানে আমি দুটি বই থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিলাম। আশা করি সুকুমারবাবু উদ্ধৃতি দুটি বিবেচনা করে দেখবেন।

প্রথমটি ৺অমিয়কুমার বসু কর্তৃক সংকলিত ও ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ', দ্বিতীয় খণ্ড থেকে। স্বাধীনতার পর অমিয়বাবু মিলিত Eastern ও South-Eastern রেলের জেনারেল ম্যানেজার হয়েছিলেন। বৈদ্যবাটি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: 'ইহাও একটি প্রাচীন পল্লী। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাস লিখিয়াছেন যে এই স্থানে গঙ্গাতীরে চাঁদসদাগর একটি নিমগাছে পদ্মফুল ফুটিতে দেখিয়াছিলেন। উহা নিমতীর্থের ঘাট নাম পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে পুরীগমন কালে শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে গঙ্গার ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে ঘাটের নিকট একটি নিমগাছ রোপিত হইয়াছিল; তদবধি এই স্থান নিমাইতীর্থের ঘাট নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ লোকে এই শেষোক্তনামই ব্যবহার করেন।' (পৃ ৭১)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীহরিবোল কুটিরবাসী শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক ৪৬৫ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ বা শ্রীপাট-বিবরণী' থেকে: ' নিমাইতীর্থের ঘাট—হুগলী জেলায় বৈদ্যবাটী ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদিকে গঙ্গার ঘাট। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-পরে এই গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই ঘাট নিমাইতীর্থ ঘাট নামে খ্যাত। পুরীধাম হইতে শ্রীজগন্নাথদেব এই ঘাটে বালা বন্ধক দিয়াছিলেন। কোনোও ব্রাহ্মণ বালক উপনয়নের পরে এই ঘাটে দণ্ডি ভাসাইয়া স্নান করে না। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস তাহা হইলে সেই বালক মহাপ্রভুর ন্যায় গৃহত্যাগ করিবে।'

সুকুমারবাবু বলেছেন যে কলকাতার প্রতি আমার এতই বিমুখতা যে আমি নাকি 'আইন-ই-আকবরি'র 'মহল' বা 'পরগনা' তালিকা থেকে এই নামটি 'নিষ্কাশিত' করতে চেয়েছি।
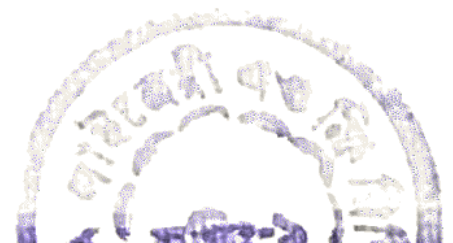
এই প্রসঙ্গে তিনি শায়েস্তা খাঁ-এর সুবাদারির আমলে নিম্‌তে গ্রামের কৃষ্ণরাম দত্ত কর্তৃক রচিত 'রায়মঙ্গলকাব্য' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যে কলিকাতা পরগনার উল্লেখ আছে।

সুকুমারবাবু আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। 'আইন-ই-আকবরি'র 'মহল' বা 'পরগণা' তালিকা থেকে কলিকাতা নামটি আমি আদৌ 'নিষ্কাশিত' করতে চাইনি। 'মহল' কলিকাতা ও 'পরগনা' কলিকাতা — দুইয়েরই উল্লেখ আমি আমার প্রবন্ধে করেছি। তিনি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে ৮ম পৃষ্ঠাটি উল্টে দেখতেন তাহলে দুটি নামই দেখতে পেতেন। তর্ক 'মহল' বা 'পরগনা' কলিকাতা নিয়ে নয়, 'গ্রাম' কলিকাতা নিয়ে। আমার বক্তব্য হচ্ছে 'গ্রাম' কলিকাতার উল্লেখ 'আইন-ই-আকবরি'তে নেই। আমার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ করেছেন ৺স্যার যদুনাথ সরকার। তিনি 'কলিকাতা' নামটি 'আইন-ই-আকবরি' থেকে বাদ দিয়েছেন, বলেছেন ফার্সি নামটি 'কলিকাতা' নয়, 'কালনা'।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক সুকুমারবাবু ছোট্ট দুটি ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'মহল' বা 'পরগণা'। এটা ঠিক নয়। 'আইন-ই-আকবরিতে 'মহল' আছে, 'পরগনা' নেই। দ্বিতীয় ভুলটি হল, 'রায়মঙ্গলের' রচয়িতা কৃষ্ণরাম 'দত্ত' নয়, কৃষ্ণরাম 'দাস'। কৃষ্ণরাম 'দত্ত' অন্য কাব্য রচনা করেন।

উপসংহারে সুকুমারবাবু 'টোলা' ও 'তলা'র কথা তুলেছেন। সুনীতিবাবুর প্রতিবাদের জবাবে যা বলেছি তার বেশি আমার আর কিছু বলার নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন আমি কি পশ্চিমবঙ্গের কোনও পুরনো গ্রামে যাইনি এবং গ্রামে ও শহরে কোথাও কি 'শিবতলা', 'কালীতলা', 'মনসাতলা', 'ধর্মতলা', 'ঠাকুরতলা' ইত্যাদি দেখিনি ও শুনিনি? আমার উত্তর হচ্ছে গত ৫৫ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরছি, আর ওসব 'তলা'র নাম অসংখ্যবার শুনেছি ও সেগুলি দেখেছি এবং 'কালীতলা', 'মদনমোহনতলা', 'ষষ্ঠীতলা', 'শীতলাতলা' 'ধর্মতলা' ইত্যাদি নাম আমি নিজের প্রবন্ধেই লিখেছি (পৃ ২৫ দ্র.)। এসব নাম জানি, কিন্তু যেটা জানি না সেটা হচ্ছে এইসব নামের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। এইখানেই ব্যাপারটা 'উল্টা বুঝিলি রাম' হয়ে গেছে।

৩ তারাপদ সাঁতরা

ক.

'এক্ষণ'-এর বিগত সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬), শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধারমণ মিত্র মহোদয়ের লেখা 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার মনে যেসব প্রশ্ন ও সংশয় উপস্থিত হয়েছে তা 'এক্ষণ'-এর পাঠকসমাজের সমক্ষে তুলে ধরতে চাই। একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে রাধারমণবাবুর বক্তব্যকে যে অভ্রান্ত সত্য হিসাবে মেনে নিতে পারছি না — তাই এই প্রতিবাদের প্রতিবাদ। তার আগে, 'কলিকাতা'র নামকরণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে সুনীতিবাবুর প্রায় বত্রিশ বছর আগে লেখা প্রবন্ধটির এতদিন পরেও বাদ-প্রতিবাদে রত হওয়ায় আমি লেখক শ্রীমিত্র মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি আরও পুলকিত হয়েছি এই জন্যে যে, 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে তাঁর মনে একদা যে-প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, দীর্ঘদিন পরে এই পরিণত বয়সে তারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি আমাদের কাছে নিষ্ঠাবান গবেষকের আদর্শ হয়ে রইলেন— যা আজকের সমাজে একান্তই দুর্লভ। সুনীতিবাবুর 'কলিকাতা' নামের সপক্ষে সমস্ত তথ্য

রাধারমণবাবু যেভাবে ক্ষুরধার যুক্তিসহ খণ্ডন করেছেন, অতঃপর তাঁর বিপক্ষে কোনো কিছু বলার মতো কোনো সুযোগের অবকাশ নেই — একথা স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে।

আদালতে একবার দু পক্ষের আইনজীবীর সওয়াল-জবাব শুনেছিলাম। বাদী পক্ষের সওয়াল যুক্তির বহর শুনে মনে হয়েছিল, বিবাদী পক্ষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অপর দিকে বিবাদী পক্ষের জবাবের সময় বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর বাদী পক্ষের তথ্যের ভূরিভূরি গরমিলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত শ্লেষাত্মক বাচনভঙ্গি শুনে বারবারই মনে হয়েছিল বিবাদী পক্ষ নিতান্তই নির্দোষ। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। এতদিন ধরে সুনীতিবাবুর প্রবন্ধটিই আমাদের কাছে যথার্থ বলে মনে হয়েছে এবং অন্যান্য গবেষকরাও যে এ-বিষয়ে সুনীতিবাবুকে সমর্থন জানিয়েছেন, তার প্রমাণ হল, বিনয় ঘোষ রচিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে আলোচিত 'ছোট কলিকাতা' প্রবন্ধটি। বহুদিন পরে আজ রাধারমণবাবুর এই প্রবন্ধটি পড়ে সংশয় দেখা দিয়েছে, 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তাহলে কী হতে পারে?

সুনীতিবাবু 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি নিয়ে যেসব তথ্য দিয়েছেন তার যথার্থতা নিয়ে কিছু বলার আগে রাধারমণবাবুর প্রতিবাদের যুক্তি তথ্য নিয়ে অবশ্যই কিছু বলার আছে। আলোচ্য প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রাধারমণবাবু যুক্তির দোহাই দিয়ে যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন তার মধ্যে যেসব ভুলত্রুটিগুলি নজরে পড়েছে সেগুলি আলোচনা করলে, রাধারমণবাবুর যুক্তির কিছু কিছু অসারতা সম্পর্কে বেশ অবহিত হওয়া যায়। গবেষণার কাজে সংগৃহীত তথ্যাদি অপেক্ষা কাগজপত্রে লিখিত প্রমাণের মূল্য যে অধিক তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই কাগুজে প্রমাণগুলি যদি একদা বিলেতি সাহেবদের রচিত রিপোর্ট হয় তাহলে তার মূল্যবিচারে সংশয় থেকে যায়। রাধারমণবাবুর এই প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ঘটনা ঘটেছে; অর্থাৎ তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং সমসাময়িক অবস্থার তথ্য সংগ্রহে বেশি মনোযোগী হননি, যতটা নির্ভর করেছেন এইসব তথাকথিত বিদেশীদের লেখা রিপোর্ট ও তথ্যের উপরে। তাই অপরের ভুলের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি নিজেই অনেক ভুল করে ফেলেছেন।

এবার রাধারমণবাবুর আলোচিত যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণে আসা যাক। সুনীতিবাবু চুন তৈরি সম্পর্কে লিখেছেন : 'পাথরিয়া চুন দক্ষিণ-বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়।' সুনীতিবাবুর ১৯৩৮ সালে 'কলিকাতা'র নাম নিয়ে লেখা প্রবন্ধটি নিয়ে প্রশ্ন করে রাধারমণবাবু লিখেছেন যে

১. সুনীতিবাবুর উপরি-উক্ত কথায় ১৯৩৮ সালেও যেন দক্ষিণবঙ্গে শামুক ও ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি হতো।
২. রসপুর-কলিকাতা ছাড়া আর কোথায় কোথায় হতো?
৩. এখন কি হয় না?
৪. যদি না হয় কলি ফেরানো হয় কোন চুনে?
৫. যদি দক্ষিণবঙ্গে পাথুরে চুন হতো তাহলেও কি শামুক ও ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি করবার দরকার হতো?
৬. যেখানে পাথুরে চুন হয় সেখানেও কি কলি ফেরাবার জন্য শামুকপোড়া চুন দরকার হয়?

[দর্পণ : ১ : ১৫]

রাধারমণবাবুর উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে বলা যেতে পারে :

১. হ্যাঁ, ১৯৩৮ সালেও দক্ষিণবঙ্গে শামুক ও ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি হতো। রাধারমণবাবু তাঁর প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'কলকাতার পাশে ধাপা বা লবণহ্রদে ও সুন্দরবনে বড় বড় শামুক ও ঝিনুক প্রচুর হয়। শুনেছি একসময়ে এই দুই জায়গার শামুক ও ঝিনুক পোড়া চুন কলকাতায় আমদানি হতো। পূর্ব দিক থেকে আসত বলে এই চুনের প্রবেশদ্বার ছিল বেলেঘাটা। তাই বেলেঘাটা বহুকাল থেকে চুনের আড়তের জন্য বিখ্যাত' [দর্পণ : ১ : ১৯]। রাধারমণবাবু বেলেঘাটার কথা তুলেছেন বলেই অন্যান্য স্থানের উদাহরণ না দিয়ে কেবলমাত্র বেলেঘাটার উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চাই, সেখানেও এই সেদিন, ১৯৫৬ সাল নাগাদ, শামুক পোড়া চুন তৈরি হতো। ঐ সময়ে আমার একবার বেলেঘাটায় Calcutta Improvement Trust নির্মিত বাসভবনগুলির কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে-সময় এই ভবনগুলির কাছেই রাশীকৃত শামুক ও ঝিনুকের খোলা যেমন নজরে পড়েছিল, তেমনি চুন তৈরির জন্য দেশীর প্রথায় যেমন শুক্‌নো কাঠের জ্বালানি ব্যবহার করা হতো, বেলেঘাটায় কাঠের বদলে কয়লার ব্যবহার হওয়ায় তার ধোঁয়া ও তৎসহ গন্ধ এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের যে কষ্টের কারণ হয়েছিল, তাও ঐ সময় বাসিন্দাদের অনেকেই জানিয়েছিলেন। এখনও ঐ C.I.T ভবনের কাছে সেই চুন তৈরির স্থানটি আছে কিনা জানি না, তবে শামুক থেকে তৈরি চুনের ব্যবহার আজও যে লুপ্ত হয়ে যায়নি এ-উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন আলোচনার সময় দেবার চেষ্টা করেছি।

২. রসপুর-কলিকাতা ছাড়া অন্য কোথাও হতো কিনা সে-প্রশ্নের জবাবে আমি আজ থেকে তেরো বছর আগে প্রকাশিত শ্রীবিনয় ঘোষ রচিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' পুস্তকের ৬০২ ও ৬০৩ পৃষ্ঠা থেকে কিছু বিবরণ তুলে দিচ্ছি। সেখানে চুন তৈরির কারিগর চুনারিদের রসপুর-কলিকাতা ছাড়াও অন্যত্র বসবাস সম্পর্কে লেখা হয়েছে : 'হাওড়া জেলার আরও কোন কোন জায়গায় চুনারিদের বাস আছে। যেমন বসন্তপুরে (৬-৭ ঘর), মাজুতে (মুন্সীর হাট ৫-৬ ঘর), থলিয়ায় (২-১ ঘর), উলুবেড়িয়ার কাছে গঙ্গারামপুরে (৯-৭ ঘর), বাগনানের কাছে পিপুলান-ঘোড়াঘাটে (৫-৬ ঘর), ডোমজুড়ের কাছে বলুটিতে (২-৩ ঘর), সিংটি-শিবপুরে (২-৩ ঘর), গড় ভবানীপুরে (২-১ ঘর)। এ ছাড়া হুগলি জেলার কয়েক স্থানে এবং চব্বিশ পরগণার দক্ষিণেও চুনারিদের কিছু কিছু অস্তিত্ব আছে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণেও আছে।'

রাধারমণবাবুর জ্ঞাতার্থে, বিনয়বাবুর তালিকাটিকে সম্পূর্ণ করে হাওড়া জেলার আরও দু-এক জায়গায় বসবাসকারী চুনারিদের উল্লেখ করছি। তা হল, আমতায় (৬-৭ ঘর), ডোমজুড়ের কাছে ভাস্কুর (৬-৭ ঘর), বাগনানের কড়ে-বাইনান (২-৩ ঘর), মানকুর-দেউলগ্রাম (২-৩ ঘর)। হুগলি, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার উদাহরণ এর মধ্যে উল্লেখ করা থেকে বিরত হচ্ছি।

৩. এখন কি হয় না? — এ প্রশ্নের উত্তর হল, হ্যাঁ, এখনও হয়। খাস রসপুর-কলকাতাতেই হয়। বিগত ১৯৬৯ সালের এপ্রিলে হাওড়ার জেলা গেজেটিয়ার রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজে তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. মহোদয়ের সঙ্গে আমতা, রসপুর ও কলিকাতা গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করছি।

এখন কলিকাতা গ্রামে ৬-৭ ঘর চুনারিদের বাস। এদের পরিবারের প্রধানরা হলেন, খাঁদু রাণা, ভদ্রেশ্বর রাণা, মানিক রাণা, নকড়ি রাণা, খোদন দাস ও সুপাটি দাস। এদের জাতিগত পদবি হল, মিত্র, রাণা, বসু, দাস ও দত্ত। এই কলিকাতা গ্রামে চুন তৈরির জন্য সংগৃহীত শামুকের খোলা স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। এখনও দু-তিনটি চুন পোড়াবার ভাঁটি রয়েছে। একটি শামুকখোলা পরিপূর্ণ ভাঁটিতে আগুন দেবার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ ছাড়াও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলতে পারি, যারা কোলাঘাট-উলুবেড়িয়ার বাসে করে গঙ্গারামপুর গ্রামের উপর দিয়ে গিয়েছেন তাঁরা ঐ গ্রামে রাস্তার ধারে রাশীকৃত শামুকের খোলা ও চুন পোড়াবার ভাঁটি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন।

প্রসঙ্গত আরও জানাই, আজ থেকে বারো বছর আগে হাওড়া জেলার বাগনান থানার কুটির শিল্প প্রসঙ্গে স্থানীয় একটি সাপ্তাহিক 'দেশসেবক' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি এই শামুকের খোলা থেকে চুন তৈরির বিষয়টি উল্লেখ করি এবং জেলা গেজেটিয়ারে এই শিল্পটির উল্লেখ না থাকায় সেই প্রবন্ধটিতে দুঃখ প্রকাশ করি। এ ছাড়াও হাওড়া জেলার এইসব অঞ্চলে এই শিল্পটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিগত ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'গ্রামসেবকের চিঠি' পত্রিকাতেও 'বাগনানের কৃষি ও শিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধেও এক বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

বর্তমানকালে পাথুরে-চুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়েও এই কুটির শিল্পটির এখনও টিকে থাকার মধ্যে এ-কথা অনুমান করে নিতে কোনো কষ্ট হয় না যে একদা এই শিল্পটির কী ব্যাপক প্রসার ছিল। আমাদের দেশে যাতায়াত ব্যবস্থার বিশেষ করে রেললাইন বসার পরে বাইরে থেকে পাথুরে-চুনের আমদানি হওয়ায় এই শিল্পটির উপর আঘাত পড়েছে। তবু কেন এখনও এই শিল্পটি টিকে আছে তার প্রধান কারণ হল পাথুরে-চুনের অপেক্ষা জোঙ্গড়া-চুনের স্থায়িত্ব সমধিক হওয়ার জন্য। তাই এখনও কলি-ফেরানোর জন্য, ঘর গাঁথনির জন্য এবং চুন বালি পলেস্তারার কাজের জন্য লোকে বেশি দাম দিয়ে সংগ্রহ করা এই চুন ব্যবহার করে। তবে এর জন্য বেশি দাম পড়ে বলে এর চাহিদা কমে যাওয়ায় এই অঞ্চলের চুনারিদের এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। ফলে অনেকেই অন্যান্য কুটির শিল্পের পরিণামের মতো চুন তৈরির ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ক্ষেতমজুরি ও ভাগচাষের উপজীবিকা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আড়াইশো বছরের কারবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন — এর কারণ সুনীতিবাবু দেননি বলে রাধারমণবাবু যে অভিযোগ করেছেন [দর্পণ : ১ : ২৫] তার উত্তর এই প্রসঙ্গেই মোটামুটি উল্লেখ করলাম।

৪. রাধারমণবাবুর এ-প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি। আবার বলছি যে, সিলেট, বিসরা ও কাটনি থেকে আনীত সস্তা পাথুরে-চুনের ব্যবহার ব্যাপক হওয়ায় জোঙ্গড়া-চুনের চাহিদা কমে গেছে। তবে এখনও বেশ কিছু কলি-ফেরানো ও অন্যান্য কাজ জোঙ্গড়া-বাখারি চুনে হয়ে থাকে। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত শাসপুর গ্রামে এখনও শামুক পোড়ানো এবং শঙ্খ পোড়ানো চুন তৈরি যে হয় তা কিছুদিন আগে আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি এবং এই চুন তৈরির উপর ঐ অঞ্চলের চুনারি পরিবাররা একান্তই নির্ভরশীল।

৫. দক্ষিণবঙ্গে পাথুরে চুনের ব্যবহার খুব কমই হয়েছে। তাও যেটুকু পাথুরে চুনে ব্যবহার তাও বাইরে থেকে আমদানি করা পাথুরে চুন নয়। বাংলা দেশের কঙ্করময় ভূমি সন্নিহিত

অঞ্চলে মাটির তলায় একধরনের শক্ত কাদার ডেলা পাওয়া যায় — যাকে স্থানীয়ভাবে নামকরণ করা হয়েছে 'ঘুটিং'। আর তাই পুড়িয়েও চুন পাওয়া গেছে। কিন্তু এর ব্যবহারও সীমাবদ্ধ ছিল। দ্রুত লোনা লেগে যাওয়ার জন্য এই ঘুটিং-এর চুন শুধুমাত্র গৃহনির্মাণের গাঁথনির কাজে লাগানো হয়েছে এবং বাদবাকি কাজ করা হয়েছে শামুক পোড়ানো চুনে। অনেক সময়ে দেখা গেছে অনেক প্রাচীন অট্টালিকা ও দেবালয় নির্মাণে গাঁথনির কাজে শুধুমাত্র নরম কাদা ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাদবাকি কাজ জোঙ্গড়া-চুনের মালমশলা দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের মন্দির-মসজিদ ও অট্টালিকা নির্মাণে যে-মালমশলা ব্যবহার করা হয়েছিল তার নমুনা পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারা যাবে এর সত্যাসত্য। এই ধরনের ভেঙে পড়া মন্দির ও দেবালয় গৃহের ফাটল থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে দেখেছি তার মধ্যে শামুকের খোলার অস্তিত্ব রয়েছে। আমি হাওড়া জেলার বাগনান অঞ্চলের মিউজিয়ম 'আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা'র পক্ষ থেকে বাংলা দেশের প্রাচীন মন্দিরগুলির একটি তালিকা ও সেইসঙ্গে আলোকচিত্র সহ 'ডকুমেন্টেশন' করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছি। যেখানেই গেছি ভগ্ন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ থেকে মন্দির তৈরিতে যে-সব মালমশলা ব্যবহার করা হয়েছে তাও খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেছি। এমনও দেখেছি, কোনো কোনো মন্দির বা মসজিদে ব্যবহৃত মশলায় লোনা জলের শামুকের holotype shell-এর অংশবিশেষ কিছু কিছু রয়ে গেছে ;হয়ত ভালভাবে পোড়ান হয় নি বা পোড়ান অংশকে চালুনিতে ভাল করে চেলে নেওয়া হয় নি। এমন উদাহরণ বাংলা দেশে ভূরিভূরি আছে। এ-সম্পর্কে আমি একটি সবচেয়ে প্রাচীন দেবালয়ের উল্লেখ করব। গুপ্ত যুগের অর্থাৎ আনুমানিক দেড় হাজার বছর পূর্বের একটি মন্দির নির্মাণে যে শামুক চুনের ব্যবহার করা হয়েছিল — তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে খনিত বেড়াচাঁপা গ্রামের একটি ইষ্টকনির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বাংলা দেশে শামুক চুনের ব্যবহারের এক প্রাচীনতম নিদর্শন এইখানেই প্রত্যক্ষ করেছি। আশুতোষ মিউজিয়মের সহকারী কিউরেটর শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়চৌধুরীর পরিচালনায় যখন বেড়াচাঁপার প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ভাঙা ইট অপসারণ করা হচ্ছিল, তখন এই মন্দির চত্বরের খুব কাছেই শামুক পোড়াবার ইট দিয়ে ঘেরা দুটি গোলাকার স্তূপ আবিষ্কৃত হয়। স্তূপদুটির ভেতর দেখা যায় শামুকের খোলা এবং সেইসঙ্গে পোড়ানো চুন। সুতরাং অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, একদা এই গুপ্ত যুগের মন্দির তৈরিতে মালমশলার জন্য শামুকের খোলা পুড়িয়ে চুন ব্যবহার করা হয়েছিল। আমাদের দেশে প্রাচীন ইমারত তৈরির মালমশলা ইত্যাদি নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নি। ফলে এ-বিষয়ে বহু অজানিত তথ্য অগোচরে রয়েই গেছে। এ-সম্পর্কে একটি মাত্র উদাহারণ দিতে পারি। মেদিনীপুর জেলার কোনো একটি গ্রামে অবস্থিত একটি মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে লাগানো চুন-বালির প্রলেপের মধ্যে পাটের কুচিও দেখা গেছে। দেওয়ালের চুন-বালির পলেস্তারার স্থায়িত্বের জন্যই পাট মেশানো হতো। কিন্তু আমাদের দেশের গবেষকরা কি এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছেন? এ বিষয়ে বাংলার মন্দির নিয়ে যাঁরা একান্ত গবেষণায় রত আছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস., শ্রীডেভিড ম্যাকক্যাচিয়ন ও শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যালকেও রাধারমণবাবু প্রয়োজনবোধে সত্যাসত্যের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। কারণ এ-তথ্যগুলি তো বিলেতি সাহেবদের লেখা বইয়ের পাতায় নেই যা যদৃচ্ছা উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যেতে পারে।

৬. যেখানে পাথুরে চুন হয় সেখানে কলি-ফেরাবার জন্য পাথুরে-চুন অপেক্ষা শামুক-পোড়া চুনকেই বেশি পছন্দ করা হয়। এর উদাহারণ হল, মেদিনীপুর জেলার যেসব অঞ্চলে 'ঘুটিং' পাওয়া যায় সেসব অঞ্চলেও শামুক-পোড়া চুনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা গেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে শামুক-পোড়া চুনের গুণগত উচ্চমানের ও অধিকদিন স্থায়িত্বের জন্য শামুক-পোড়া চুনের ব্যবহার পাথুরে-চুনের অপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

রাধারমণবাবুর প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়া গেল এবং আশা করা যায় যে তিনি এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হবেন। এ ছাড়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাদের শামুক পোড়ানো চুনে পান খাওয়া সম্পর্কে রাধারমণবাবু যা লিখেছেন (পৃ ১৭) তার উত্তরে আমার নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই এবং গ্রামাঞ্চলে শামুক পোড়ানো চুন কি কি কাজে লাগে তাও এতে পরিষ্কার হবে বলে আশা করা যায়। বাড়ি তৈরির মালমশলা ও কলি-ফেরানোর জন্য চুনের প্রয়োজন ছাড়া গ্রামাঞ্চলে আরও দুটি কারণে চুনের প্রয়োজন হয়। পানের সঙ্গে খাবার জন্য এবং তাল ও খেজুর গাছ থেকে রস বের করার সময় সেই রস যাতে খারাপ না হয় সেজন্য কলসির ভিতরে তরল চুনের প্রলেপ দেওয়া হয়। সুতরাং এই চুনের চাহিদা মেটাবার জন্য বিক্রয়ের স্থান ছিল দৈনিক বাজার বা সাপ্তাহিক হাট। আজ থেকে কুড়ি-বাইশ বছর আগে মেলাতেও চুনের দোকান বসতে দেখেছি। দু রকমের চুনই তখন দেখেছি বিক্রয়ের জন্য আনা হয়েছে। গেঁড়ি ও শামুকের খোলা থেকে তৈরি হওয়ার জন্য সে-সময়ে দেখেছি গ্রামের অর্থবান বা সংরক্ষণশীল পরিবারের লোকেরা এই চুন পছন্দ করতেন না। কিন্তু তপশিল শ্রেণীভুক্ত নিম্নবর্ণের সম্প্রদায় এই চুন বেশি ব্যবহার করতেন। গুড় প্রস্তুতকারীরা অল্প চুনে বেশি কাজ হতো বলে এ চুন বেশি পছন্দ করতেন। স্থানীয় কবিরাজরাও এই চুন থেকে পরিশ্রুত জল ঔষধ হিসাবে পান করার জন্য পরামর্শ দিতেন।

সুতরাং রাধারমণবাবুর কথায়, নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবারা না হয় পান খেতেন না, সে ব্রহ্মচর্যের জন্যই হোক বা শামুক চুনের জন্যই হোক, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, পান খাওয়ার ট্র্যাডিশন তো বহুদিনের ; অতএব সে ক্ষেত্রে কোন্ চুন ব্যবহার করা হতো? পান খাওয়ার চিরাচরিত প্রথার একটা উদাহরণ দিই। স্থানীয় ভূস্বামীরা সেকালে প্রজাদের নানান কারণে কতকগুলি জমি খাজনার হাত থেকে রেহাই দিয়েছিলেন, যথা, পাইকান, চাকরান ইত্যাদি। তেমনি জানা গেছে, মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড়ের রাজারা এই জেলায় মল্লিক পদবিধারী তাম্বুলী পরিবারের জমির খাজনা ছাড় দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, জমিদারবাবুদের অনুষ্ঠানের সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ পান যোগান দিতে হবে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সে-সময় পাথুরে চুন আমদানির কোনো ব্যবস্থাই ছিল না — আবার দেশি শামুকের খোলা থেকে তৈরি চুনও পছন্দ করা হতো না এবং যা প্রয়োজন মেটাত তা হল বিভিন্ন স্থান থেকে আমদানি করা সামুদ্রিক শঙ্খ থেকে প্রস্তুত চুন। সামুদ্রিক শঙ্খও আবার নানানভাবে পাওয়া যেত। বাংলা দেশে শঙ্খ শিল্পের ট্র্যাডিশন বহুদিনের। শঙ্খবণিকরা শাঁখা তৈরির পর অব্যবহৃত শঙ্খের অংশ যা বাদ দিত তাই চুনারিরা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে শঙ্খচুন তৈরি করত। রাধারমণবাবুও তো তাই স্বীকার করে বলেছেন, বাখারি চুনের প্রধান ব্যবহার ছিল পানের চুন হিসেবে [দর্পণ : ১ : ২০]। সুতরাং দেশি শামুকের খোলা অপেক্ষা শঙ্খ পোড়ানো চুন দিয়ে পান খেতে আর কারও আপত্তি থাকতে পারে না ; তাই অধিকাংশ

বিধবাদের মধ্যে পান খাওয়ার এত বাধানিষেধ ছিল না। বাধানিষেধ যেটুকু তা হল শামুকের খোলা থেকে তৈরি চুন ব্যবহারের। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে বিধবারা পান-দোক্তার বিলাসের মধ্যেই তো নিজেদের আধিপত্যকে টিকিয়ে রেখেছিলেন, এ সত্য গ্রামের অধিবাসীমাত্রই স্বীকার করবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে পানের জন্য চুন — সেই শামুক বা শঙ্খ থেকেই — পাথুরে চুনের কোনো প্রশ্নই আসছে না।

বিলেতি সাহেবদের বইয়ে এবং তাঁদের যাবতীয় লিখিত রিপোর্টে কলি ফেরাবার জন্য বাখারি চুন ব্যবহারের উল্লেখ নেই বলে রাধারমণবাবু ধরে নিয়েছেন, 'বাখারি চুন বাংলা দেশে এতই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল যে কলিচুন হিসাবে ক্বচিৎ এ চুন ব্যবহার হতো। আবহমান কাল থেকে বাংলা দেশে বিশুদ্ধ ও প্রচুর সস্তা সিলেট চুন বরাবর ব্যবহার হয়ে এসেছে' (পৃ ২১)। অন্যত্র রাধারমণবাবু লিখেছেন যে শুধুমাত্র পঙ্খের কাজে ও পানের চুন হিসাবে এই বাখারি চুনের ব্যবহার হতো (পৃ ১৯)। আর এই সঙ্গে তিনি সাহেবদের লেখা বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই বাখারি চুনের সবটাই আসত মাদ্রাজ থেকে। তাহলে রাধারমণবাবুর মূল কথা দাঁড়াচ্ছে, আসাম থেকে আসত সিলেটের চুন কলি-ফেরাবার জন্য, আর মাদ্রাজ থেকে আসত বাখারি চুন পঙ্খের কাজের ও পানের চুনের জন্য। আর বাংলা দেশে চুন তৈরির কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা যে ছিল না — একথা রাধারমণবাবু এই বলেই বোঝাতে চাইলেন।

আগেই বলেছি, রাধারমণবাবুর এই ধারণা যে একেবারেই ভ্রান্তিজনক তা আমাদের দেশের প্রাচীন মন্দির-মসজিদ তৈরির কাজে শামুক চুন ব্যবহারের নজির দিয়ে দেখিয়েছি। এখন রাধারমণবাবুর কলি-ফেরানোর জন্য চুন ব্যবহারের এক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করতে চাই। রাধারমণবাবু আলোচনায় বলেছেন, কলি-ফেরানোর জন্য ব্যবহার হতো পাথুরে চুন আর পঙ্খের কাজে ব্যবহার হতো বাখারি চুন। এই পঙ্খের কাজের সঙ্গে কলি-ফেরানোর কাজটার কি সম্পর্ক তা বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই। কিছুদিন আগে বিগত ৩০শে আষাঢ়ের (১৩৭৫) আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের লেখা 'বাংলার বাস্তু অলংকরণ শিল্পের লুপ্তধারা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি আমাদের দেশে জোঙ্গড়া-বাখারি চুন তৈরির পদ্ধতি ও এই চুন ব্যবহারের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি যা লিখেছেন, তার অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কথায়, 'পঙ্খের কাজ হল — বাড়ির দেওয়ালের বালি কাজের উপর একটা বিশেষ ধরনের আবরণ বা একপ্রকার চুনের প্রলেপ লাগানো, অনেকটা কলাই করার মত। . . . পঙ্খের কাজের জন্য যে বিশেষ রকমের চুন একান্ত প্রয়োজন তা পাওয়া যায় জোঙ্গড়া নামক এক প্রকার শামুক জাতীয় জলজ জীবের আবরণ বা খোলা পুড়িয়ে। সেকারণ এর নাম জোঙ্গড়ার চুন। ... প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন, পঙ্খের কাজ করা স্থানের উপর চুনকাম করলে তার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। পঙ্খের কাজ শুধু ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না — লোনা ও আর্দ্রতা প্রতিরোধ করে, অবশ্য সেটা জোঙ্গড়া চুনের গুণে। সে কারণে অনেকে বর্তমানে বাড়িতে জোঙ্গড়ার চুন লাগায়...।'

এক্ষেত্রে গোপেনবাবুর উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পঙ্খের কাজ মানেই কলি-ফেরাবার কাজটা সবসুদ্ধ নিয়েই — অর্থাৎ এখানে পঙ্খের কাজের মধ্য দিয়েই কলি-ফেরানোর কাজটা সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে — আলাদাভাবে কলি-ফেরানো হচ্ছে

না। সুতরাং কলি-ফেরানোর জন্য সিলেট চুনের প্রয়োজন হচ্ছে না। সব কাজটাই জোঙ্গড়া চুনের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। আর যেখানে পঙ্খের কাজ নিতান্তই হচ্ছে না — সেখানে শুধুমাত্র যে কলি-ফেরানো হচ্ছে জোঙ্গড়ার চুন দিয়ে — তাও দেখা গেল। দেখা গেল জোঙ্গড়ার চুন এখানে দীর্ঘস্থায়ী — পাথুরে চুন লোনার ভাব আনে ; তাই এই শামুকের খোলা থেকে তৈরি চুনের এত কদর। আশা করি এরপর রাধারমণবাবু তাঁর বহুদিনের চিন্তা ভাবনার ভুল সংশোধন করে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে বাংলা দেশে শুধুমাত্র শামুক চুনে বা জোঙ্গড়া-চুনের ব্যবহার বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল এবং এখনও শামুকের খোলা পুড়িয়ে তৈরি চুনের এই ধারবাহিকতা শেষ হয় নি।

খ.

এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধে 'Chunarytollah'কে চুন সংক্রান্ত বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে রঙ ছোপানো লোকদের পাড়ায় দাঁড় করাবার জন্য রাধারমণবাবু গবেষণা করেছেন 'তলা' আর 'টোলা'কে নিয়ে। 'টোলা'র মানে করেছেন পাড়া আর টুলির মানে ছোটপাড়া, যেমন কুমারটুলি (পৃ ২৫)। 'গাছের তলা' যুক্ত নামগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে নেবুতলার উদাহরণে এসে বলেছেন: 'ঐ গাছ বা গাছের সারিকে কেন্দ্র ক'রে তার কাছে যে লোকের পাড়া বা টোলা গড়ে উঠেছে সেই টোলাকে বোঝায়। গাছের যদিও বা 'তলা' থাকে, দেবদেবী যথা ধর্ম বা মনসা ইত্যাদির 'তলা' কল্পনা করা হাস্যকর।' অর্থাৎ এখানে রাধারমণবাবুর থিয়োরি হল, দেবতার তলা অর্থে ঠাকুরের মন্দির নয় — মন্দিরকে কেন্দ্র করে পাড়াকে বোঝায় (পৃ ২৫)। রাধারমণবাবু অপরের যুক্তিকে যা হাস্যকর বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব যুক্তির আলোচনায় এলে তা নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে হবে। বাংলা দেশের গ্রামের মানুষের কাছে এটা সুস্পষ্ট যে কোনো স্থানের নামকরণে সেখানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোনো গাছের তলাকেই ব্যবহার করা হয়, যেমন বটতলা, শিমুলতলা, আমতলা প্রভৃতি। পরে সেই জায়গায় লোকবসতি গড়ে উঠলেও পূর্বের নামটিও সেই হিসেবে বহাল হয়। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। কয়েক বৎসর পূর্বে মেদিনীপুর জেলায় নবনির্মিত একটি রাস্তায় যখন বাস চলাচল হল, তখন বাস থামার নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করার জন্য তত্রস্থ স্থানের নাম সেই গাছ তলাটিকে কেন্দ্র ক'রে বহাল করা হল শিমুলতলা। বর্তমানে সেই বাস-স্টপটির আশে-পাশে চায়ের দোকান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, কিন্তু নাম সেই বহাল রয়ে গেছে শিমুলতলা নামকরণে। সুতরাং এইভাবেই নেবুতলা— নেবুগাছের তলা, বাতাবি লেবুর বড় বড় গাছ তো থাকতে পারে — অহেতুকভাবে রাধারমণবাবু কাগ্‌জি বা পাতি লেবুর গাছের কথা ভাবছেন কেন?

ঠিক এই রকমই ঠাকুরের নামে শীতলাতলা, মনসাতলা, ধর্মতলা, রথতলা অর্থে এখানে বুঝিয়েছে তলদেশ অর্থাৎ পায়ের তলা। ধর্মতলা, কালীতলা, মদনমোহনতলা, ষষ্ঠীতলা, শীতলাতলা — এগুলি মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে পাড়া বা তার থেকে টোলা-টুলি নয়। টোলা-টুলি নিয়ে রাধারমণবাবু এত মাথা ঘামিয়েছেন শুধু এই জন্য যে, চুনারিটালাকে চুনারিদের পরিবর্তে রাংরেজদের পাড়া হিসেবে থিয়োরি খাড়া করার জন্যই। এটি রাধারমণবাবুর হাস্যকর প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই চল্‌তি কথায় চুনারিদের পরিবর্তে 'চুনিয়া' কথা হবে বলে রাধারমণবাবু সুনীতিবাবুর

ভুল দেখিয়ে বলেছেন যে, নুন তৈরি করত বলে নুনিয়া এবং চুন তৈরি করলে হবে চুনিয়া আর চুনারিটোলা হল, যে-পাড়ায় রঙ দেবার রাংরেজরা বাস করে। [দর্পণ : ১ : ৩১]। রাধারমণবাবুর এই থিয়োরি যদি সত্য বলে ধরা হয়, তাহলে আমরা সূত্রধরদের যখন চল্‌তি কথায় বলি ছুতোর তেমনি কর্মকাররাই-বা কুমোর হবেন নাই-বা কেন? রাধারমণবাবু আমার এই থিয়োরি যদি মেনে নেন, তাহলে আমরাও চুনারিদের পরিবর্তে চুনিয়া কথাটি মেনে নিতে রাজি আছি।

রাধারমণবাবু অন্যত্র চুনাপুকুরের অর্থ সম্পর্কে সুনীতিবাবুর বক্তব্যকে খণ্ডন করে যে-যুক্তি খাড়া করেছেন, তা একান্তই ভ্রমাত্মক ও অবাস্তব। সুনীতিবাবু চুনাপুকুর লেন সম্পর্কে যদি লিখে থাকেন, 'এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে,' তাহলে তাতে মহাভারত কি অশুদ্ধ হতে পারে বোঝা গেল না। বরং রাধারমণবাবু চুন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনার জন্য অর্থ করেছেন, চুনো মাছের তুলনা দিয়ে, যার অর্থ হল ক্ষুদে বা ছোট। তাই তিনি বলতে পারলেন যে, চুনাগলি চুনাপুকুর ও চুনারিটোলা কোনো নামেরই চুনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই [দর্পণ : ১ : ৩০-৩১]। অর্থাৎ সম্পর্ক শুধু ছোট বা ক্ষুদে কথার সঙ্গে মাত্র। যদি সম্পর্ক থাকে বলে কেউ বলেন তো তাকে রাধারমণবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ; এক্ষেত্রে আমি রাধারমণবাবুর প্রশ্নের উত্তর দেবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি।

প্রথম প্রশ্নটি হল : কলকাতায় যখন একটি মাত্র চুনাপুকুরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তখন ঐ একটিমাত্র চুনাপুকুরের শামুক-ঝিনুক পুড়িয়েই কি সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামের চুনের প্রয়োজন মিটত?

রাধারমণবাবুর-এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে 'চুনাপুকুর'-এর নামের অর্থ কি হতে পারে তার আলোচনা করা দরকার। রাধারমণবাবু কাশপুকুর, নলপুকুর, কৈপুকুর, শামুকপুকুর, ঝিনুকপুকুর-এর অর্থ করেছেন, যে-পুকুরে যে-প্রাণী বা উদ্ভিদ জন্মে সেই প্রাণী বা উদ্ভিদের নাম থেকেই পুকুরের নাম হয় এবং পুকুরের পাড়ে তালগাছ জন্মালে তালপুকুর হয় [দর্পণ : ১ : ৩১]। খুবই গ্রহণযোগ্য কথা। কিন্তু তাঁতপুকুরের বেলায় কী হবে? এও তো সেই চুনাপুকুরের মতো সমস্যা। আমি যে-গ্রামে বাস করি সেই গ্রামের পাশের একটি গ্রামে তাঁতপুকুর আছে। অনুসন্ধানে জেনেছি, এই তাঁতপুকুরের ধারে সোলাঙ্কির তন্তুবায় গোষ্ঠীর একদা বসবাস থাকায় এবং পুকুরটি ঐ তন্তুবায় গোষ্ঠীদের দখলে থাকায় তাঁতিপুকুর অপভ্রংশ হয়ে তাঁতপুকুর নামকরণ হয়। সুতরাং চুনাপুকুরের বেলায় এই সামাজিক সত্যটিও ঘটেছে — এটি চুন তৈরির পুকুর নয়, — এটি চুনারিদের পুকুর — অপভ্রংশ হয়ে চুনাপুকুরে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং রাধারমণবাবুর এই ব্যঙ্গোক্তি—যে-পুকুরে চুন জন্মায় তা চুনাপুকুর—এইখানে যথার্থ হয় নি ; বরং ঐ মন্তব্যে তাঁর ষোল আনা অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আরও সোজা হয়ে এল। আগের উত্তরের মতোই সামান্য কথাতেই বলা যেতে পারে, একটা পুকুরের পাড়ে চুনারিদের বসবাস থাকায় নাম চুনাপুকুর মাত্র ; ঐ পুকুরের শামুক ইত্যাদি পুড়িয়ে চুন তৈরির জন্যে চুনাপুকুর মোটেই নয়। সুতরাং এতে রাধারমণ-বাবুর আশ্চর্য হবার কোনো কারণ ঘটে নি ; বরং রাধারমণবাবু এই সামান্য সত্যটি অনুধাবন করতে পারলেন না দেখে আমরাও খুব আশ্চর্য হচ্ছি।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর উপরের প্রথম ও দ্বিতীয় জবাবে ব্যক্ত করেছি।

চতুর্থ প্রশ্ন : বাংলা দেশে চুনাপুকুর আরও আছে কিনা। এটির খোঁজ করা সময়সাপেক্ষ। চুনারিদের বসবাস নিয়েই যখন স্থানের নাম হয়েছে চুনাপুকুর এবং সেইসঙ্গে চুনারিদের উপজীবিকাও যখন চুন তৈরি, তখন এইসব গ্রামে চুন তৈরি হবে না কেন?

আর যদি চুন তৈরি হয়, তাহলে গ্রামের নাম কলিকাতা হল না কেন — এ প্রশ্নের তর্কাতীত মীমাংসার পথে যেতে চাই না। শুধু প্রসঙ্গত বলতে পারি চুন তৈরি হলেই যে গ্রামের নাম কলিকাতা হবে সে-কথা সুনীতিবাবু তো কোথাও উল্লেখ করেন নি ; তিনি আরও দুটি কলিকাতা গ্রামের উদাহরণ উপস্থাপিত করে আলোচনা করেছেন মাত্র।

পঞ্চম প্রশ্ন : রাধারমণবাবু শুধু বাড়ি তৈরিতে চুনের কথাই উল্লেখ করেছেন ; মন্দির-দেবালয় তৈরি এবং নিত্য প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন নি। যদি রাধারমণবাবু কটা মন্দির তৈরি হয়েছিল বলে কোনো প্রশ্ন তোলেন তাহলে এ-প্রশ্ন করার আগে তাঁকে আমাদের মিউজিয়ামে রক্ষিত card catalogue দেখে যাবার জন্য অনুরোধ করি। সেইসঙ্গে রাধারমণবাবুকে প্রশ্ন করি, ইংরেজরা আসার অনেক আগেই সুলতানি আমল থেকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে যেসব বাড়ি-ঘর ও মন্দির-মসজিদ নির্মিত হয়েছিল — তার সবটারই চুন কি রাধারমণবাবুর কথায় সিলেট-মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি হয়েছিল? এক্ষেত্রে রাধারমণবাবু কী জবাব দেবেন জানি না — তবে তিনি সুনীতিবাবুর বক্তব্যের প্রতিবাদে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জোঙ্গড়া চুনের উদাহরণ না দেওয়ায় তাঁর উপস্থাপিত যুক্তিতর্ক এখানে নেহাতই ভীষণ একপেশে হয়ে গেছে।

গ.

রাধারমণবাবু হাওড়ায় অবস্থিত গ্রাম সম্পর্কে সুনীতিবাবুর বক্তব্যকে ভুল প্রতিপন্ন করতে গিয়ে গোটা ইতিহাসটাই পাল্টে দিতে চেয়েছেন। ইংরেজ সাহেবদের উদ্যোগে সৃষ্ট জেলা গেজেটিয়ারের পাতা থেকে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে নিজের মনগড়া তথ্য মিশিয়ে দিয়ে তিনি এক অপূর্ব থিয়োরি রচনা করেছেন। এই থিয়োরি রচনার আগে সত্যমিথ্যার অনুপাত দেখিয়ে তিনি লিখেছেন : 'আপাতত যদি ধরেও নিই যে এই শেষের "কলিকাতা" সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে সত্যমিথ্যার অনুপাত দাঁড়ায় ১ : ২। সুতরাং তাঁর তত্ত্ব গ্রাহ্য হতে পারে না।' [দর্পণ : ১ : ৩৪]। রাধারমণবাবুর থিয়োরি এ ক্ষেত্রে কতটা গ্রাহ্য হতে পারে তা সত্যমিথ্যার তুলাদণ্ডে যাচাই করার জন্য পাঠকদের সমক্ষে তুলে ধরলাম।

আমতা থানার দারোগা সুনীতিবাবুকে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন, 'রসপুর কলিকাতা'। তাতে রাধারমণবাবু বলেছেন, 'গোড়ায় গলদ! এ দুটি কখনই এক গ্রাম হতে পারে না, তারা আলাদা অথচ পাশাপাশি গ্রাম।' এতে গোড়ায় গলদের কী আছে তা বোঝা গেল না। অনেকগুলি একই নামের গ্রাম থাকলে তাকে আলাদাভাবে বোঝাবার জন্য পরিচিত জায়গাটির সঙ্গে নামটি জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন কৃষ্ণনগর কথাটি ধরা যাক। কৃষ্ণনগর বললে, কোন্ কৃষ্ণনগর বোঝাবে — তাই কৃষ্ণনগরের আগে বহু পরিচিত স্থানের নামটি যোগ করে দিয়ে বলতে হয়, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, বগড়ি-কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর অথবা নদীয়া-কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। রসপুর-কলিকাতার ক্ষেত্রেও তাই। কলিকাতা বললে কোন্ কলিকাতা? তাই হাওড়ার কলিকাতাকে আলাদা করে দেখাবার জন্য রসপুর-কলিকাতা বলা হয়েছে। আমার এ-বক্তব্যের সমর্থনও আছে রাধারমণবাবুর লেখায়। তিনিও লিখেছেন : 'রসপুর ও কলিকাতা দুটি আলাদা গ্রাম।

এখানে কলিকাতা গ্রামকে সনাক্ত করবার জন্য তার নামের আগে "রসপুর" নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে।' সুতরাং দারোগাবাবু যদি 'this village' বলে থাকেন, তাহলে আলোচ্য কলিকাতা গ্রামকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন — এর সঙ্গে রসপুর গ্রামের কোনো সম্পর্কই নেই। কলিকাতা গ্রামে শামুক পোড়ানো চুন তৈরি হতো এবং চুনারিদের বসবাস থাকার জন্যই দারোগাবাবু যে-তথ্য সুনীতিবাবুকে দিয়েছিলেন তার মধ্যে কোনো ভুল আছে বলে মনে করি না। তার প্রমাণ আমি ইতিপূর্বে হাওড়া জেলায় চুনারিদের বসবাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে রাধারমণবাবু জোর করে দারোগার রিপোর্ট মতো কলিকাতা গ্রামকে রসপুরের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইছেন। এ-সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য যুক্তি হচ্ছে : 'এই গ্রামের (রসপুর) খ্যাতি এত বেশি যে কলিকাতা গ্রামের নাম এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই জানে না। তারা কলিকাতাকে রসপুর গ্রামের অহিন্দু এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু পাড়া হিসাবেই জানে। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা আগে তাই ছিল, পরে স্বতন্ত্র মৌজা হয়।' একেই বলে কল্পনায় পক্ষবিস্তার। খাস কলিকাতার লোকেরা হয়ত না জানতে পারে, কিন্তু আমতা থানার বাসিন্দারা রসপুর-কলিকাতার নাম জানেন না — এটি একটি হাস্যকর যুক্তি। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রামে তিন-চারটি দেবালয় আছে ; এর মধ্যে আজ থেকে ১৭২ বছর আগে নির্মিত একটি ধর্মঠাকুরের মন্দির উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা গ্রামের শ্যামাকালীর মূর্তিটিও কাঠের। কাঠের নির্মিত মূর্তি ক'টি বর্ধিষ্ণু গ্রামে আছে সে-খবর রাধারমণবাবু দিতে পারেন কি? এছাড়াও এ-গ্রামে একটি গ্রন্থাগার (পাকা দালান বাড়িতে গ্রন্থাগার অবস্থিত), গ্রাম্য সঙ্ঘ, দোকানপাট ও অনেকগুলি পাকাবাড়িও আছে।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা ও রসপুর গ্রামের লোকসংখ্যার ও অন্যান্য বিবরণ সেন্সাস রিপোর্ট থেকে তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত করলে দেখা যাবে যে, কলিকাতা গ্রাম রসপুরের চেয়ে কোনো অংশে ছোট নয়। তাছাড়া রাধারমণবাবু শুধু 'রসপুরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি বহু ভদ্র গৃহস্থের বাস' এবং কলিকাতায় 'অহিন্দু ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু পাড়া' উল্লেখ করে যে-তথ্য দিয়েছেন তাও সঠিক কিনা তা এই সেন্সাস রিপোর্ট থেকেও পরিষ্কার হবে। ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট নিম্নরূপ :

	Kalikata	*Raspur*
No. of Houses	214	374
Scheduled Castes	114	392
Literate and Educated persons	520	699

এখন বোঝা যেতে পারে, আলোচ্য কলিকাতা রসপুর গ্রামের সংলগ্ন একটা ছোট পাড়া হিসেবে ছিল, পরে স্বতন্ত্র গ্রাম হয় এবং কলিকাতাতে নিম্নশ্রেণীর বসবাস যে বেশি, রাধারমণ-বাবুর এই চিন্তা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও কল্পিত। কলিকাতা ও রসপুর দুইই পাশাপাশি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল বা এখনও আছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, রাধারমণবাবুর যুক্তির মালমশলা সংগৃহীত হয়েছে বিদেশি সাহেবের লেখা গ্রন্থ থেকে। এ-বিষয়ে তিনি জেলা গেজেটিয়ারকে সারবস্তু ধরে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, গ্রামের নাম তো 'রাসপুর'—'রসপুর' নয়, কেননা জেলা গেজেটিয়ারে তো একথা লেখা আছে। পক্ষান্তরে 'অমরা জুড়ী' গ্রাম যদি জেলা গেজেটিয়ারে লেখা থাকে থাকুক—আমরা ঐ নাম জানি না ; হাওড়া জেলাবাসী হিসেবে আমরা জানি 'অমরাগোড়ী'। সুতরাং জেলা গেজেটিয়ারে

যদি রসপুরকে 'রাসপুর' এবং আমরাগোড়ীকে 'অমরাজুড়ী' লেখা হয় তা যে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রসঙ্গক্রমে L.S.S. O'Malley, I. C. S-এর কৃত *Howrah District Gazetteer* থেকে আরও দু-একটি উদাহরণ দিলে এ- বিষয়ে সকলেই অবগত হবেন যে এই জাতীয় পুস্তকের উপর নির্ভর করা কোনো গবেষকের উচিত নয়। জেলা গেজেটিয়ারে দেব-দেবী প্রসঙ্গে 'Hu' নামে একটি দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। আমার রচিত 'হাওড়া জেলার লোক উৎসব' পুস্তকটি রচনাকালে আমি হাওড়া জেলার বহু স্থানে পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু 'হু' দেবতার কোনো সন্ধান পাই নি। অথচ জেলা গেজেটিয়ার থেকে এই 'হু' অবতার উদ্ধৃতি দিয়ে অনেক উৎসাহী গবেষকও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পরবর্তী কালে শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র-সম্পাদিত 'ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক—হাওড়া' এবং তারও পরে বি. রায়-সম্পাদিত ১৯৬১ সালের ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুকেও 'যদ্দৃষ্টং তৎ লিখিতং' করে এই 'হু' দেবতার বর্ণনা উল্লিখিত হয়ে আসছে। অথচ এই দেবতাটির নাম হওয়া উচিত ছিল 'ইতু' (Itu)। আগ্রহশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন যে আজ থেকে ৬১ বছর আগে প্রকাশিত ইংরেজদের রচিত এই জেলা গেজেটিয়ারের উপর নির্ভর করা কোনোমতেই যুক্তিযুক্ত কিনা।

অন্যত্র রাধারমণবাবু জেলা গেজেটিয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হাওড়ার কলিকাতা গ্রামে চুন তৈরি এত নগণ্য ছিল যে, গেজেটিয়ার-প্রণেতাদের তা নজরেই আসে নি ; আর তাই জেলা গেজেটিয়ারে এই শিল্পটির কোনো উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে জেলা গেজেটিয়ারে যদি এই চুন শিল্পটির কথা উল্লেখ না থেকে থাকে তাহলে দায়ী জেলা গেজেটিয়ার কর্তৃপক্ষের সঠিক তথ্যসংগ্রহের অক্ষমতা। জেলা গেজেটিয়ারে হাওড়া জেলার প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'No old remains have yet been found in this district, probably because the rivers have changed their courses so much that ancient sites, if any, have been washed away.' (p. 27).

জেলা গেজেটিয়ারে এই বিষয় লেখার পর এখন যদি হাওড়া জেলার কোনো স্থানে কোনো প্রাচীন প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়, তাহলে তাকে ধরে নিতে হবে যে ওগুলো মিথ্যে—ও'ম্যালি-র জেলা গেজেটিয়ারে যেহেতু কোনো উল্লেখ নেই ; শুধু উল্লেখ আছে প্রাচীন প্রত্নবস্তু ধুয়ে মুছে যাবার। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সত্যিই কি হাওড়া জেলার প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ বলতে আর কিছুই নেই ? এ-প্রশ্নের উত্তরে আমি ১৯৬১ সালের *District Census Handbook* থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যেখানে এই জেলাটির প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে লেখা হয়েছে : 'Two sites of Archaeological importance in this district, Bachri and Harinarayanpur have already been mentioned. ... So far as Bachri is concerned, many terracotta seals and figurines of the Pala and Sena period have been discovered here. ... At Harinarayanpur, the most important discovery is a neolith celt of triangular shape. Other antiquities discovered here consist of terracotta seals, figurines, bangles and grey pottery wares of the pre-Pala period. At Jagatvallavpur, a village under the Sadar subdivision a few terracotta figurines and pottery wares have heen discovered.' (p. 13-4)। ও'ম্যালি-র জেলা গেজেটিয়ারে প্রকাশিত প্রাচীন মন্দির প্রসঙ্গেও এমন বহু ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে — যার ভুল ধরা পড়েছে ১৯৬১
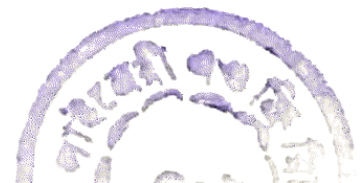
সালের *District Census Handbook*-এ মন্দির সম্পর্কে David McCutchion-এর লিখিত প্রবন্ধটির সঠিক আলোচনার ক্ষেত্রে। সুতরাং ৬১ বছর আগের লেখা এই জাতীয় জেলা গেজেটিয়ারের উপর নির্ভর করা রাধারমণবাবুর যে উচিত হয় নি তা বলা বাহুল্য।

কলিকাতা গ্রামের প্রাচীনত্ব ও নামকরণ নিয়ে রাধারমণবাবু লিখেছেন [দর্পণ : ১ : ৩৭-৮] : ক. কলিকাতা নাম থেকে ছোট-কলিকাতা নামের উৎপত্তি হয়েছে। আজ থেকে অনেক বছর আগে — অষ্টাদশ শতকের শেষ কিংবা উনবিংশ শতকের গোড়ায় জনা কয়েক ইংরেজ কলকাতা শহর থেকে এসে এই গ্রামে দামোদর তীরে কুঠি তৈরি করে। তখন এই গ্রাম রসপুর গ্রামেরই একটি পাড়া ছিল। খ. মুসলমান ও তফশিলি হিন্দুরা এই পাড়ায় বাস করত। গ. সেই কুঠি নির্মাণের সূত্রেই তারা রাজমিস্ত্রি, ছুতারমিস্ত্রি প্রভৃতির সঙ্গে কয়েকঘর চুনিয়াকেও এই পাড়ায় আনে। ঘ. যখন ব্যবসা জেঁকে ওঠে তখন তারা এর নাম রাখে 'ছোট-কলিকাতা'। ঙ. তখনই এই সাহেবপাড়া রাসপুর গ্রাম থেকে আলাদা হয়ে এক স্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত হয়। চ. সুতরাং চুন তৈরির সঙ্গে ছোট-কলিকাতা নামের কোনো সম্বন্ধ নেই ... চুনিয়াদের বংশধর আর কেউ নেই। চুন তৈরি বন্ধ। ছ. ইংরেজরা ঘর ছেড়ে বিদেশে গিয়ে যেখানেই বসবাস করেছে সেই জায়গার নাম রেখেছে তারা যে-গ্রাম, শহর, জেলা বা দেশ থেকে এসেছে সেই সেই গ্রাম শহর ইত্যাদির নামে। শুধু সেইসব নামের আগে একটা New (নতুন) শব্দ বসিয়ে দিয়েছে, যেমন — New Britain, New Caledonia ইত্যাদি। এদেশে কলকাতা থেকে ইংরেজরা গিয়ে বাংলার পল্লীতে বাস করলে সে পল্লীর 'নূতন কলিকাতা' নাম রাখত না, রাখত ছোট-কলিকাতা।

এখন বোঝা যাচ্ছে, রাধারমণবাবু যেনতেন প্রকারেণ যদি 'ছোট-কলিকাতা' নামটি সাহেবদের সখ ক'রে রাখা নাম — এই থিয়োরিতে দাঁড় করাতে পারেন, তাহলে তাঁর কিস্তি মাত। তাই তিনি উপরে বর্ণিত যুক্তিগুলি খাড়া করেছেন। তাঁর মনগড়া থিয়োরি : ক-বক্তব্যের উত্তর হল, 'ছোট-কলিকাতা' নামটা কলিকাতা থেকে কিছুতেই উৎপত্তি হয় নি বা হতে পারে না। আসলে এটি 'কলিকাতা'। আর 'কলিকাতা' বরাবরই আলাদা গ্রাম। রসপুরের সঙ্গে তার কোনো পাড়া হিসেবে সম্পর্ক নেই। শুধু হাওড়ার কলিকাতাকে চিহ্নিত করার জন্য বলা হয়ে থাকে 'রসপুর-কলিকাতা'। আমার এটি নিছক বক্তব্য নয় — এটি সপ্রমাণের জন্য আমি তিনটি দলিল উপস্থিত করছি। ১ম দলিলটি হল বিগত বাংলা ১০৯১ সালের অর্থাৎ ইংরাজি ১৬৮৪ সালের (রাধারমণবাবুর কথিত নীলকুঠি সাহেবদের আসার অনেক আগের) 'শিবায়ন' কাব্যের রচয়িতা কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ-এর দেবোত্তর সম্পত্তির দলিলের হুবহু নকল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'শিবায়ন' কাব্যের ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে। মূল দলিলটি কবির বংশধর রসপুর নিবাসী শ্রীপাঁচুগোপাল রায় মহাশয়ের কাছে আছে।

আলোচ্য এই দলিলের তালিকায় কোন্ মৌজায় কত দেবোত্তর জমি দেওয়া হয়েছিল তার অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হল :

রষপুর — ২০
হাবধাড়া — ১০
তালসহর — ১০
দুর্ব্বচট — ৩২

কলিকাতা — ১০
কুমারিয়া — ৩

---

৮৫ পঁচাষি

আজ থেকে ২৮৬ বছর আগের দলিলে রসপুর ও কলিকাতা দুটো আলাদা গ্রামের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। এখানে 'ছোট-কলিকাতা' বলে কোনো উল্লেখ নেই এবং সাহেবদের দেওয়া নামকরণ যে কোনোমতেই নয় — তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

এছাড়া রসপুর গ্রামের শ্রীপাঁচুগোপাল রায় মহাশয় আমাকে ২০৭ বছরের পুরাতন তাঁর কাছে রক্ষিত আরও একটি প্রাচীন দলিলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করান। সেই দলিলটির অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

'এতদার্থে লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১১৬৯। উনশত্তর শাল ব তারিখ ১১ আশাঢ়
ইসাদি
শ্রীরুদ্রেশ্বর দাষ মিত্র
সাং—রষপুর
শ্রীপরমেশ্বর ঘোষ
সাং—পাইকপাড়া
পঃ বালি
শ্রীনিলাম্বর দাষ মিত্র
সাং—রমেপুরা
হাবিধাড়া
শ্রীপ্রভুরাম দাস বষু
সাং—বজারপুর
শ্রীখুদিরাম দেয়াশী
সাং—কলিকাতা

আলোচ্য এ-দলিলটিতেও রসপুর গ্রাম আলাদা করে দেখানো হয়েছে। এ-দলিলে ২০৮ বছর আগে 'কলিকাতা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং 'ছোট-কলিকাতা'র কথা চিন্তা করা এক্ষেত্রে একান্তই ভ্রমাত্মক বলে বিবেচিত হবে।

রাধারমণবাবুর বক্তব্য, গ্রামটিতে নিম্নবর্ণের তফশিলি হিন্দু ও মুসলমান বাস করতেন বলেই নীলকুঠির সাহেবরা এখানে একদিন আস্তানা গাড়তে উদ্যোগী হয়েছিলেন ; তাই রাধারমণবাবু অনেকবার এই কলিকাতা গ্রামে গিয়েছেন বটে, কিন্তু তফশিলি পরিবারদের এই ঐতিহ্যহীন গ্রামের ভেতরে কী আছে তা দেখার জন্য তিনি অতটা আগ্রহী হন নি। কিন্তু গবেষক হিসেবে আমাদের আগ্রহ আছে এই তফশিলি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয় জানার। আর এই আগ্রহ আছে বলেই কলিকাতা গ্রামের ধর্মমন্দিরের গায়ে খোদিত ১৭২ বৎসরের প্রাচীন লিপি-ফলক রাধারমণবাবুর অবগতির জন্য তুলে দিচ্ছি। লিপি-ফলকে লেখা আছে :

শ্রীশ্রী ৺ধর্ম্মদেবতা মন্দির তৈয়ার হইল সন ১২০৪ সালে শ্রীগয়ারাম
দেয়াসি মন্দির দেন সাং কলিকাতা শ্রীয়ভয়চরণ মিস্ত্রি সাং-থলে।

রাধারমণবাবুর মনগড়া থিয়োরিতে সৃষ্ট 'ছোট-কলিকাতা' নাম একেবারেই পাওয়া গেল না। ইংরেজ আসার অনেক আগেই কলিকাতার নাম পাওয়া যাচ্ছে এবং একটু আগে সেন্সাস রিপোর্ট থেকেও দেখিয়েছি এটি কোনোকালেই ছোট গ্রাম ছিল না, বরং রসপুর গ্রামের সমকক্ষ বললেই চলে।

আলোচ্য দলিল ও লিপি-ফলকের প্রমাণের পরে রাধারমণবাবুর ক-বক্তব্য ভ্রান্ত হয়ে গেল। কলিকাতা গ্রাম নিজেদের মনগড়া যুক্তি হিসেবে রসপুর গ্রামের পাড়া কখনোই হতে পারে না। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে রাধারমণবাবুর উদ্ধৃতির আকর জেলা গেজেটিয়ারে আবার সাহেবদের এই নীলকুঠির কোনো উল্লেখ নেই। যারা কলিকাতা নাম দিয়ে এমন একটা কলোনি করলেন, অথচ তার উল্লেখ হল না জেলা গেজেটিয়ারে!

খ. বক্তব্যের উত্তর আগেই দিয়েছি ; তফশিলি জাতিভুক্ত পরিবাররা শুধু কলিকাতা গ্রামে থাকবে কেন রসপুর গ্রামেও ছিল। ১৯৬১ সালের সেন্সাসেও দেখানো হয়েছে তফশিলি সম্প্রদায় কলিকাতা অপেক্ষা রসপুর গ্রামেই বেশি বাস করে।

গ. বক্তব্যের উত্তরে বলা যেতে পারে কুঠি নির্মাণের সূত্রে বিলেতি সাহেবরা রাজমিস্ত্রি, ছুতোরমিস্ত্রি প্রভৃতির সঙ্গে চুনিয়াকে আনবেন কেন — রসপুর গ্রামের অনতিদূরে থলিয়া, বিনোলা, কৃষ্ণবাটি, নিশ্চিন্তপুর, রাউতাড়া ও ঝিখিরা প্রভৃতি গ্রামে সূত্রধর শিল্পীদের বসবাস বহুদিনের। এখানের সূত্রধর শিল্পীরা হাওড়া, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বহু মন্দির নির্মাণ করেছেন এবং কাঠের বড় বড় মূর্তি ও অন্যান্য অংলকরণের কাজে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এই অঞ্চলের সূত্রধর শিল্পীদের নামযশ সম্পর্কে বন্ধুবর শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল-রচিত Art in Industry পত্রিকায় প্রকাশিত *A Group of Traditional Sutradhara Artists of Bengal* প্রবন্ধটির দিকে রাধারমণ-বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এতেই প্রতীয়মান হবে যে এই অঞ্চলে সূত্রধর শিল্পীদের ইংরেজরা আনে নি — এদের বাস এই অঞ্চলে বহুদিনের। অট্টালিকা ও স্নানের ঘাট নির্মাণ ও বিভিন্ন ধরনের কাঠের কাজের জন্য যেমন এই অঞ্চলের সূত্রধরদের ডাক পড়ত, তেমনি এগুলি নির্মাণের জন্য যেসব মালমশলার প্রয়োজন হতো, তার মধ্যে চুনের প্রয়োজন মেটাত এই অঞ্চলের চুনারি সম্প্রদায় (রাধারমণবাবুর কল্পিত চুনিয়া সম্প্রদায় নয়)। সেকালের গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে রাধারমণবাবু গভীরে প্রবেশ করেন নি বলেই এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন।

ঘ. বক্তব্যের জবাব আমি ক-বক্তব্যের জবাবের সময় সমস্ত বিষয়টি উল্লেখ করেছি। এখানে 'ছোট-কলিকাতা' নামের গ্রাম একান্তই কাল্পনিক ; যেহেতু সাহেবদের দেওয়া 'ছোট-কলিকাতা' নামটির কোনো লিখিত প্রমাণ নেই।

ঙ. বক্তব্যের জবাব দেবার আগে রাধারমণবাবুর কাছে আমার প্রশ্ন যে, গেজেটিয়ারের পাতায় 'রাসপুর' বলে উল্লেখ আছে তাই তিনি রাসপুর করলেন, কিন্তু তিনি তো অনেকবার রসপুর গিয়েছিলেন, সে-সময় স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে তিনি গ্রামের নাম কী পেয়েছিলেন তা জানান নি। যদি জানা যেত যে, গেজেটিয়ারে রাসপুর এবং সাধারণ লোকের মুখ ও তাদের ভূমিসংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজে রাসপুর উল্লেখ হয়েছে — তাহলে রাধারমণবাবুর যুক্তি একান্তই মেনে নেওয়া যেতে পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সরেজমিন অনুসন্ধানের ফলাফল জানান নি।

এ ছাড়াও আরও একটি চিরাচরিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের দেশে প্রায় বছর চল্লিশ আগে ভূমিসংক্রান্ত জরিপ হয় এবং সেই জরিপের সময় মৌজার নক্সা তৈরি এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন স্বত্বের জমির মালিকদের তালিকা তৈরি করা হয়। সেই সময় কোনো ছোট গ্রাম বা পাড়াকে আলাদা মৌজায় ভাগ করা হয় নি। বরং ছোট ছোট গ্রাম বা পাড়াকে নিয়ে একটি বৃহৎ মৌজার মধ্যে যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এমন ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুটি ছোট গ্রাম নিয়ে যে মৌজা হয় তাতে দুটো গ্রামেরই নাম থাকে যা রাধারমণবাবুও স্বীকার করেছেন। [দর্পণ : ১ : ৩৫] এ ক্ষেত্রে কলিকাতা রসপুর গ্রামের মধ্যে একটা ছোট পাড়া হয়ে থাকলে তো রসপুর মৌজার অন্তর্ভুক্ত হতো — আলাদা মৌজা হিসাবে তাকে দেখানো হতো না। কিন্তু এখানে কলিকাতা আলাদা বড় গ্রাম ছিল বলেই সেটেলমেন্ট রেকর্ডের সময় তা স্বতন্ত্র মৌজা হিসেবেই রূপ পেয়েছে। রাধারমণবাবুর সাহেবপাড়া 'ছোট-কলিকাতা' যদি ঐভাবেই পরে রসপুর গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা স্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত হয়ে থাকে তবে সেটেলমেন্ট জরিপে সেই মৌজার নামকরণ হতো সাহেবদের দেওয়া নামের 'ছোট-কলিকাতা'। কিন্তু তা না হয়ে ইংরেজ রাজত্বের জরিপের সময় রাধারমণবাবুর কথিত ইংরেজ সাহেবদের নামকে অবহেলা করে বরং করা হয়েছে 'কলিকাতা'। আসলে 'কলিকাতা' বরাবরই একটা গ্রাম — তাই সেটেলমেন্ট রেকর্ডেও একটা স্বতন্ত্র মৌজা। সাহেবদের তৈরি সখ করে নাম রাখা গ্রাম 'ছোট-কলিকাতা' কোনোকালেই নয় বা ছিল না।

চ. বক্তব্যের উত্তরে যদি ধরেই নিই যে চুন তৈরির সঙ্গে কলিকাতার কোনো সম্বন্ধ নেই, তাহলে রাধারমণবাবুর কথিত চুনিয়াদের কথা আসছে কেন? চুনারিদের বংশধর আছে কিনা এবং চুন তৈরি হয় কিনা সে-জবাব আমি আগেই দিয়েছি এবং উল্লেখ করেছি যে, কলিকাতা গ্রামে এখনও ৬-৭ ঘর চুনারি আছে এবং এখনও শামুক পোড়ানো চুন তৈরি হয়।

ছ. বক্তব্যটি একান্তই হাস্যকর। উপরের নজিরগুলি উপস্থিত করার পর এই ধরনের কাল্পনিক তথ্যের কোনো ভিত্তি নেই। 'ছোট-কলিকাতা' নামটি বড় কলিকাতা থেকে আলাদা ক'রে দেখাবার জন্য স্থানীয় লোকেরা কেউ কেউ বলে থাকেন 'ছোট-কলিকাতা' কিন্তু স্থানীয়ভাবে 'রসপুর-কলিকাতা' নামই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং এখন যা দাঁড়াচ্ছে তার সারমর্ম হল, পুরাতন দলিলে ও লিপি-ফলকে শুধুমাত্র কলিকাতার নাম উল্লিখিত হয়েছে ; সাহেবদের দেওয়া 'ছোট-কলিকাতা' নামের কোনো ভিত্তি নেই। রসপুরের সঙ্গে লাগোয়া কোনো পাড়া থেকে পরে কলিকাতা গ্রাম হয় নি। চুন তৈরি হতো কলিকাতা গ্রামে — এবং এখনও চুনারিদের বাস আছে ও শামুক পুড়িয়ে চুন তৈরি করে। কলিকাতা ছাড়াও অন্যান্য স্থানে চুনারিদের বাস আছে ; চুন তৈরি হয়। জেলা গেজেটিয়ারে যে-'রাসপুর' গ্রামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে — তা ভুল এবং প্রকৃতপক্ষে হবে 'রসপুর'।

'অধিক কহিব কত পুঁথি বেড়ে যায়।' 'কলিকাতা'র নামকরণ সমস্যা নিয়ে আমাব বাদ-প্রতিবাদ নয় ; আমার প্রতিবাদ এক্ষেত্রে রাধারমণবাবুর কতকগুলি ভ্রান্ত ও কাল্পনিক তথ্যের বিরুদ্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই সুতরাং রাধারমণবাবুর প্রতিবাদ-প্রবন্ধের মধ্যে যেসব ভুল ও অবাস্তব তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলি যেন তিনি সংশোধনপূর্বক পুনরায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুনীতিবাবুর বক্তব্যকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, সত্যনিষ্ঠাই

গবেষকের ধর্ম — এই কর্তব্যের টানেই আমাকে এই বাদ-প্রতিবাদে রত হতে হয়েছে শুধু এইজন্যই যে, ভবিষ্যতের গবেষকরা যেন এই বিভ্রান্তির পথে পা না বাড়ায়। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার এই প্রতিবাদ-পত্রের মধ্যে কোনো কথা যদি রাধারমণবাবুর অসম্মানের কারণ হয় — তাহলে আমার একান্তই শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে আমাকে তিনি যেন ক্ষমা করেন।

উত্তর

শ্রীতারাপদ সাঁতরার দীর্ঘ প্রতিবাদ-লিপির মধ্যে আমি মাত্র দুটি তথ্য নতুন পেলাম : ১. পূর্বে শামুকপোড়া চুন দিয়ে ইমারত গাঁথা হতো এবং ২. ইং ১৬৪৮ সালে রসপুরের পাশে 'কলিকাতা' গ্রামের অস্তিত্ব। এই দুটি বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করব। এ দুটি ছাড়া তিনি আর যা কিছু বলেছেন সবই আমার জানা কথা।

দীর্ঘ প্রতিবাদের প্রত্যেক কথার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, তার দরকারও করে না। আমি মাত্র তাঁর প্রধান কথাগুলির ও কতকগুলি আনুষঙ্গিক কথার উত্তর দেব, মূল তর্কের বিষয়— মহানগরী 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ রেখে।

মুখবন্ধেই তারাপদবাবু দারুণ এক অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে করেছেন। তিনি বলেছেন : 'গবেষণার কাজে সংগৃহীত তথ্যাদি অপেক্ষা কাগজপত্রে লিখিত প্রমাণের মূল্য যে অধিক তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই কাগুজে প্রমাণগুলি যদি একদা বিলেতি সাহেবদের রচিত রিপোর্ট হয় তাহলে তার মূল্যবিচারে সংশয় থেকে যায়। রাধারমণবাবু এই প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ তিনি নির্ভর করেছেন এইসব তথাকথিত বিদেশীদের লেখা রিপোর্ট ও তথ্যের উপরে।' তিনি প্রবন্ধের বাকি অংশে নানাস্থানে নানাভাবে এই একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন। সেসব উদ্ধৃত করে আমার প্রত্যুত্তরের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। উপরে উদ্ধৃত অংশে 'একদা বিলেতি সাহেবদের রচিত রিপোর্ট' ও 'তথাকথিত বিদেশীদের লেখা রিপোর্ট'-এর মধ্যে যে একদা ও তথাকথিত শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের অর্থ আমার বোধগম্য হল না।

বিলেতি সাহেবদের বা বিদেশীয়দের রিপোর্টে কেন সংশয় থেকে যায় তা তারাপদবাবু কোথাও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর ইঙ্গিতের তো একটাই অর্থ হয়। সেটা এই যে বিদেশিরা তাঁদের রিপোর্টে সত্যকে গোপন অথবা বিকৃত করে থাকেন। এত বড় একটা অপবাদ তিনি বিদেশি সাহেবদের বিরুদ্ধে দিলেন, অথচ মাত্র O'Malley সাহেবের সম্পাদিত হাওড়া-জেলা গেজেটিয়ার ছাড়া আমার প্রবন্ধে আমি যেসব সাহেবদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি তাদের একটার মধ্য থেকে ভুল বার করে দেখাতে পারেন নি। আমি Mesrovb Seth থেকে, *Hobson-Jobson* থেকে, Pearson থেকে, *Thomason Civil Engineering College Manual* (এটি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ Civil Engineering College-এর ছাত্রদের ফলিত বিজ্ঞানের বই) থেকে, Firminger ও Sir Willam Hunter-এর *Imperial Gazetteer* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। তারাপদবাবু তার একটিকেও ভুল প্রমাণিত করতে পেরেছেন কি? সুনীতিবাবুও তো নিজ বক্তব্য প্রমাণের জন্য *Hobson-Jobson* ও Mesrovb Seth-এর উপর নির্ভর করেছেন।

আমি তারাপদবাবুর চোখে যে-অপরাধে অপরাধী সুনীতিবাবুও তো সেই অপরাধে সমান অপরাধী। কিন্তু আক্রমণ করা হল আমাকে, সুনীতিবাবুকে নয়। অথচ প্রবন্ধের শেষে তারাপদ বাবুই বলেছেন : 'সত্যনিষ্ঠাই গবেষকের ধর্ম।' চমৎকার সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তিনি! সত্যনিষ্ঠাই যদি তাঁর ধর্ম হতো তিনি স্বদেশি-বিদেশি বাছতেন না। যেখানেই সত্য পেতেন সেখান থেকেই আহরণ করবার চেষ্টা করতেন। সত্যের দেশ নেই, জাত নেই। সুনীতিবাবুর ও আমার সত্যনিষ্ঠা আছে বলেই আমরা বিদেশিদের শরণাপন্ন হয়েছি। কারণ তাঁদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিষয়ই জানাবার উপায় নেই। তাঁরা ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, আইন, ভাষা, মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, চারু ও কারু শিল্প, হস্তশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, প্রাচীনলিপি, মুদ্রা, পুরাতত্ত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে কঠিন পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে জেনেছেন ও আমাদের জানিয়েছেন। সবই যে তাঁরা জেনে ফেলেছিলেন তা বলি না। অনেক জানবার বাকি ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তাঁরা যে বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার শরণাপন্ন হতেই হবে ভারতের অতীত সম্বন্ধে জানতে হলে।

সুতরাং অতীতের কলিকাতা — চার-পাঁচশো বছর পূর্বের কলিকাতার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে যদি আমি বিদেশিদের লেখার সাহায্য নিয়ে থাকি তাতে আমি অন্যায় করেছি মনে করি না। তাও আমায় করতে হতো না, যদি জানতাম ঐ বিষয়ে বা ঐ সময়কার ভারতীয়দের লেখা কোনো বই আছে। কিন্তু আমার ধারণা সে-রকম বই নেই, অন্তত আমার জানা নেই। যদি থেকে থাকে তাহলে স্বদেশপ্রেমী তারাপদবাবু সেইসব বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্যকে খণ্ডন করতে পারতেন। কিন্ত তিনি না বিদেশি না স্বদেশি কোনো বইয়েরই ধার ধারেন নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁর একমাত্র সম্বল এবং সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই অভ্রান্ত ধরে নিয়ে ফলাও করে আমাকে শুনিয়েছেন। আমি বাংলা দেশের অসংখ্য মন্দির, মসজিদ ও প্রাচীন অট্টালিকাদি দেখেছি। মন্দির সম্বন্ধে পুস্তকাদিও কিছু-কিছু পড়েছি। কিন্তু কি উপাদানে সেই মন্দির ও মসজিদগুলি নির্মিত তা কখনও অনুসন্ধান করিনি। কেননা আমি বাস্তুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ (Civil Engineer) নই। আবার চুনের ব্যবসায়ীও নই। পাথুরে বা শামুকপোড়ানো কোনোরকম চুনেরই জ্ঞান আমার ছিল না। আমার প্রবন্ধ লেখবার আগে চুন ও বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে আমাকে অনেকগুলি বই পড়ে জ্ঞান লাভ করতে হয়েছে। তার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার, বিল্ডিং কনট্রাক্টর, চুনের কারবারি, অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রি, প্রাচীন ভদ্রগৃহস্থ যাঁদের গৃহনির্মাণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে — এরকম বহু ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। নানা লোকের কাছ থেকে নানা উত্তর পেয়েছি। রসপুর কলিকাতায় চার বার গিয়ে নিজে অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু সেই অনুসন্ধানের ফল যখন আমি প্রবন্ধে লিখলাম তারাপদবাবু নিজেই তাকে কল্পনা অর্থাৎ অসত্য বলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের এই তো ফল! তাই এসব বিষয়ে নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে বিশেষজ্ঞের — তা তিনি স্বদেশিই হোন বা বিদেশিই হোন — লেখা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সুতরাং আমার কাজে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নি। তারাপদবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন : 'গবেষণার কাজে সংগৃহীত তথ্যাদি অপেক্ষা কাগজপত্রে লিখিত প্রমাণের মূল্য যে অধিক তা অনস্বীকার্য।' এই সত্যটি

তিনি প্রয়োগ করলেন রসপুর কলিকাতার প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য এপ্রিল ১৬৮৪ সালে লিখিত দলিলের উল্লেখ করে। কিন্তু শামুকপোড়া চুন দিয়ে ইমারত গাঁথা হতো একথা যখন বললেন তখন নিজের বা নিজেদের অভিজ্ঞতার দোহাই দিলেন, এবিষয়ে ভারতীয়ের লেখা একটা বইয়েরও নাম করতে পারলেন না। উল্টে স্বীকার করলেন : 'আমাদের দেশে প্রাচীন ইমারত তৈরির মালমশলা ইত্যাদি নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নি।' স্বাধীনতার ২২ বছর পরেও এ-বিষয়ে একখানা বইও বের করতে পারলেন না যাঁরা তাঁদের 'এ তথ্যগুলি তো বিলেতি সাহেবদের লেখা বইয়ের পাতায় নেই যা যদৃচ্ছা উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যেতে পারে'— একথা বলতে লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। বিদেশিরা যদি এতদিন এ-বিষয়ে চর্চা করত তাহলে একটা কেন, অনেকগুলি বই লিখে বের করতে পারত। যে-McCutchion সাহেবের নাম তারাপদবাবু উল্লেখ করেছেন-তিনি স্বদেশি না বিদেশি? ১৯৬১ সালে আদমসুমারির সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যে-সকল Handbook প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে Notes on Temples in the District নামে একটি অধ্যায় আছে। এই নোটগুলির লেখক কোনো বাঙালি ভাই বা ভাইয়েরা, না একা একজন বিলেতি সাহেব — David McCutchion ?

এবার আমি তারাপদবাবুর প্রবন্ধের প্রথম অংশে বিস্তৃতভাবে আলোচিত শামুক চুনের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। তিনি শামুকপোড়া চুনের প্রধান পাঁচ প্রকার ব্যবহারের কথা বলেছেন, যথা, ইমারতের গাঁথনির কাজে, পলস্তরার কাজে, পঙ্খের কাজে, কলি-ফেরাবার কাজে ও পানের সঙ্গে খাবার কাজে। আমি এই চুনের তিন রকম ব্যবহারের কথা বলেছি — যথা, পানের সঙ্গে খাবার জন্য, ইমারতে পঙ্খের কাজের জন্য, ও দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য। তারাপদবাবু পলস্তরার কথা বলেছেন। পঙ্খের কাজও পলস্তরার কাজ— সাধারণ পলস্তরা নয়, খুব উৎকৃষ্ট ধরনের পলস্তরা। যে-চুনে উৎকৃষ্ট পঙ্খের কাজ হয় সে-চুনে যে নিকৃষ্ট অর্থাৎ সাধারণ পলস্তরায় কাজও হতে পারে সেকথা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। সেইজন্য আর আলাদা করে পলস্তরার কথা বলি নি। তাহলে আমি শামুকপোড়া চুনের চার রকম ব্যবহারের কথা বলেছি। বলিনি শুধু তার ইমারতের গাঁথুনির কাজে ব্যবহারের কথা। এটি আমার কাছে নতুন খবর। কিন্তু এ-খবর তো কোনো বিলেতি কেন, দেশি লোকের লেখা ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়েও নেই। আমি এখানে দুজন বাঙালি প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ারের মত উদ্ধৃত করছি। প্রথম গ্রন্থটি ভারতের বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে একটি অতি প্রামাণিক (standard) বই, দুই খণ্ডে প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নাম — *Materials of Construction as used in India : Their Nature, Production and Use*—লেখক Nagendra Nath Mitra, A. M. I. E. Ind. Licentiate in Engineering of the Calcutta University. Formerly Graduate Scholar of the Bengal Engineering College, Sibpur, and Student of the Institute of Civil Engineers, London. Engineer in the Indian Public Works Department. District Engineer of Calcutta, 1924।

"নগেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ বইতে কয়েক রকম পাথুরে চুন এবং বাখারি চুনকে fat lime বলে উল্লেখ করে লিখেছেন : '*Fat limes make very weak mortar* (মশলা). *It is unsuitable except for unimportant structures, owing to its solubility and want of setting power.*।'

দ্বিতীয় পুস্তকের নাম হচ্ছে 'স্থপতি-বিজ্ঞান বা Engineering in Bengali'—লেখক রায়সাহেব ৺দুর্গাচরণ চক্রবর্তী, L.C.E। এই পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে, তৃতীয় ও শেষ সংস্করণ ১৯২৮ সালে। এই বইয়ে (১৯২৮ সং) বাখারি চুন সম্বন্ধে এই রকম লেখা আছে: 'বাখারী চুন : ঝিনুক চুন, জোঙ্গড়া চুন ও শামুকের চুন। ইহাদিগকে Shell lime বলে। ইহা পুরাতন পুষ্করিণী, পুরাতন খাল বা সমুদ্র কিনারাস্থিত ঝিনুক, গুগলি, শামুক, জোঙ্গড়া বা বড় শামুক প্রভৃতি জলজ প্রাণীর খোলা পোড়াইয়া প্রস্তুত হয়। ইহাই বিশুদ্ধ চুন। কিন্তু ইহা ইমারতের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত হয় না। কেবল কলি বা হোয়াইট ওয়াসিং ও কালার ওয়াসিং প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ চুন, সুরকি প্রভৃতিতে মিলাইয়া মর্টার (মশলা) তৈয়ার করিলে তাহা জলের ভিতরকার গাঁথুনিতে দৃঢ় বা শক্ত হয় না। এই কারণেই ইমারতের বনিয়াদ বা ভিত্তি প্রভৃতি গাঁথুনির জন্য ঐ-রূপ চুন ব্যবহার করা উচিত নহে।'

বিলেতি ইঞ্জিনিয়ার নয়, দুজন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে কেউই বলছেন না যে শামুক চুন ইমারতের গাঁথুনির পক্ষে উপযুক্ত। এঁরা তো আর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার নন যে মিথ্যা বললেন! যে দেশি লেখকদের উপর তারাপদবাবুর আস্থা ছিল তাঁরাও শেষপর্যন্ত তাঁকে ডোবালেন। এই সাক্ষ্যপ্রমাণ অগ্রাহ্য করে শুধু তারাপদবাবুর অন্য দু-একজনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না যে পূর্বকালে মন্দির, মসজিদ বা অট্টালিকা শামুক চুনে তৈরি হতো কিংবা এই ইমারতগুলি পাথুরে চুনে গাঁথা ইমারতের চেয়ে বেশি দীর্ঘস্থায়ী হতো, তা তিনি যতই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করুন না কেন।

আমি বেলেঘাটার দুটি একশো বছরের উপর প্রাচীন চুনের গদিতে গিয়ে যখন তাদের মালিকদের জিজ্ঞাসা করি যে তাঁরা তো বহুদিন যাবৎ চুনের কারবার করছেন, কখনও শুনেছেন কি যে শামুকপোড়া চুন দিয়ে বাড়ি গাঁথা যায়, তখন তাঁরা একবাক্যে বলেন, শোনেন নি। আরো বলেন যে গাঁথা তো যায়ই না, গাঁথলে সে বাড়ি দুদিনে ভেঙে পড়বে। তাছাড়া ঐ চুন দিয়ে বাড়ি গাঁথতে হলে যে টন টন চুন লাগবে অত চুন পাওয়া যাবে কোথা থেকে, আর তার খরচ পড়বে কত! তাঁরা এটা পাগলের উক্তি ভেবে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিলেন। সুতরাং দেশি ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়ে লিখছে না, চুনের গোলদাররা জানেন না — এমন একটা ব্যাপার তারাপদবাবুর মুখে শুনে মেনে নিতে পারি না। তবে এটা হওয়া অসম্ভব নয় যে অল্প কয়েকটা ক্ষেত্রে নেহাত বিশেষ কারণে অর্থাৎ অন্য চুন একান্তই পাওয়া না গেলে ব্যতিক্রম হিসাবে বাখারি চুন দিয়ে বাড়ি বা মন্দিরাদি গাঁথা হয়েছে। যেমন ৺নগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বইয়েতে লিখেছেন দেওয়ালে চুনকাম করবার কাজে '... Where stone lime is not available, shell lime alone is used and vice versa'— এ তো হল 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' গোছের ব্যাপার — নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম।

এই প্রসঙ্গে তারাপদবাবু তিনজন শ্রদ্ধেয় পুরাতাত্ত্বিক গবেষকের নাম উল্লেখ করে আমাকে প্রয়োজনবোধে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে উপদেশ দিয়েছেন। উল্লিখিত তিনজন আমার শ্রদ্ধার পাত্র। বহুকাল যাবৎ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সম্বন্ধে গবেষণায় রত আছেন। এঁদের মতামতের নিশ্চয়ই মূল্য আছে। তবুও আমি সবিনয়ে বলব এ তিনজনের সকলেই শিল্পবোদ্ধা বা শিল্পরসিক, বাস্তুবিদ বা ইঞ্জিনিয়ার এঁদের কেউই নন। এ বিষয়ে ঠিক

মতামত দিতে পারেন তিনি যিনি একাধারে প্রথম শ্রেণীর স্থপতি এবং প্রাচীন স্থাপত্য বিষয়ে যাঁরা জ্ঞান গভীর। সে-রকম কাউকেই তো দেখতে পাই না। এই বিষয়টি জানবার জন্য আমি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দেখেছি :

১. Fergusson, *History of the Indian and Eastern Architecture,* ২ খণ্ড।
২. Havell, *Architecture of India.*
৩. Havell, *Ancient and Medieval Architecture of India.*
৪. গুরুদাস সরকার, 'মন্দিরের কথা'।
৫. অপূর্বরতন ভাদুড়ী, 'মন্দিরময় ভারত'।
৬. জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, 'বাংলার দেব-দেউল'।
৭. কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, 'বাংলার ভাস্কর্য্য'।
৮. অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঁকুড়ার মন্দির'।

প্রত্যেক বইয়েই লেখক বিভিন্ন মন্দিরের গঠনশৈলী — শিখর দেউল, রেখ দেউল, এক বাংলা, জোড় বাংলা, আটচালা ইত্যাদি — নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কেউই মন্দির নির্মাণের মালমশলা নিয়ে একটি লাইনও লেখেন নি।

McCutchion সাহেবের লেখা বাংলার মন্দির সম্বন্ধে কোনো বই এ-পর্যন্ত আমার নজরে পড়ে নি। কিন্তু ১৯৬১ সালে Census-এর বিভিন্ন District Handbook-এ তিনি *Notes on Temples in the District* যা লিখেছেন পড়েছি। তিনিও মন্দিরের মালমশলা নিয়ে মোটেই আলোচনা করেন নি। শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল এখনও বই লিখছেন। এ-অবস্থায় অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের কথার উপর নির্ভর করা ছাড়া আমার উপায় নেই। একজন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, যাঁর বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্তি সম্বন্ধে জ্ঞান গভীর ও ব্যাপক, তিনি আমায় জানিয়েছেন : 'বাংলা দেশে অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরই ঘুটিং চুন দিয়ে তৈরি হয়েছে।' কার কথা বিশ্বাস করব?

এবার তারাপদবাবু আমার বক্তব্যকে কতখানি বিকৃত করেছেন তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন : 'বিলেতি সাহেবদের বইয়ে এবং তাঁদের যাবতীয় লিখিত রিপোর্টে কলি-ফেরাবার জন্য বাখারি চুন ব্যবহারের উল্লেখ নেই বলে রাধারমণবাবু ধরে নিয়েছেন, বাখারি চুন বাংলা দেশে এতই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল যে কলিচুন হিসাবে ক্বচিৎ এ চুন ব্যবহার হতো। আবহমান কাল থেকে বাংলা দেশে বিশুদ্ধ ও প্রচুর সস্তা সিলেট চুন বরাবর ব্যবহার হয়ে এসেছে (পৃ ২১)। অন্যত্র রাধারমণবাবু লিখেছেন শুধুমাত্র পঙ্খের কাজে ও পানের চুন হিসেবে এই বাখারি চুনের ব্যবহার হতো (পৃ ১৯)। আর সেই সঙ্গে তিনি সাহেবদের লেখা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই বাখারি চুনের সবটাই আসত মাদ্রাজ থেকে। তাহলে রাধারমণবাবুর মূলকথা দাঁড়াচ্ছে, আসাম থেকে আসত সিলেট চুন কলি-ফেরাবার জন্য, আর মাদ্রাজ থেকে আসত বাখারি চুন পঙ্খের কাজের ও পানের চুনের জন্য। আর বাংলা দেশে চুন তৈরির কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা যে ছিল না — একথা রাধারমণবাবু এই বলেই বোঝাতে চাইলেন।'

আমি কখনও একথা বলি নি যে বাংলা দেশের কোথাও কস্মিনকালে বাখারি চুন তৈরি হতো না বা এই চুন দিয়ে কখনও কলি ফেরানো হয় নি। আমি যা বলেছি তা এই : 'বাংলা

দেশে প্রবাল পাওয়া যায় না। এখানে শামুক, ঝিনুক, জোংড়ার শক্ত খোলা পুড়িয়ে এই চুন তৈরি হতো। ('হয়' না বলে 'হতো' কেন বলেছি পরে বোঝা যাবে)। ... ধাপা বা সুন্দরবনের চেয়ে ঢের বড় শামুক ও ঝিনুক হয় সমুদ্রের নোনা জলে। তাই মাদ্রাজের করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের বাখারি চুন বহুদিন যাবৎ কলকাতার বাজার (সমস্ত বাংলা দেশের বাজার নয়) একচেটিয়াভাবে দখল করেছিল। ('করে আছে' বলি নি)। এই (বাখারি) চুনের ব্যবহার তিন রকম — ক. পানের সঙ্গে খাবার জন্য, খ. ইমারতে পঙ্খের কাজ (stucco)-এর জন্য, গ. দেওয়ালে চুনকাম করবার জন্য। বাখারি চুনের দাম পাথুরে চুনের দামের চেয়ে ৪-৫ গুণ বেশি। সেই জন্য এই চুন দেওয়ালে কলি ফেরাবার কাজে বিশুদ্ধ পাথুরে চুনের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে না। ... বিশুদ্ধ পাথুরে চুন কলি ফেরাবার কাজে অনায়াসেই বাখারি চুনের বিকল্পে বা পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। এই চুনের দামও বাখারি চুনের দামের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ কম। সুতরাং খাঁটি পাথুরে চুন পেলে লোক অত দাম দিয়ে বাখারি চুন ব্যবহার করতে যাবে কেন?' (পৃ ১৮ ও ২০)।

এর মধ্যে না-বলা কোন্ কথাটা আছে বুঝতে পারলাম না। বাংলা দেশে বাখারি চুন তৈরি হতো স্বীকার করেছি, বাখারি চুন দিয়ে দেওয়ালে কলি ফেরানো হতো তাও স্বীকার করেছি। মাদ্রাজের শামুক চুন পঙ্খের কাজের জন্য বা পলস্তরার জন্য গ্রামবাংলায় ব্যবহার হতো সে কথা বলিনি। হান্টার সাহেব একথা বলেননি যে সমস্ত বাংলা দেশে আবহমান কাল থেকে সিলেট চুন ছাড়া অন্য কোনো চুন পাওয়া যেত না। তিনি বলেছেন : 'From time immemorial *a large part* of the supply of Bengal has been derived from this source।' 'from time immemorial' — এই কথায় যদি আপত্তি থাকে তো তারাপদবাবু হান্টার সাহেবের ভুল ধরে দিন — দেখান কবে থেকে সিলেট চুন বাংলা দেশে আসতে আরম্ভ করেছে। শুধু বাখারি চুন নয়, পাথুরে চুনও যে পান খাবার জন্য ব্যবহার করা হয় তাও বলেছি। পাথুরে চুনের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে বাখারি চুন বাঁচতে পারে না, আমার একথা কি সত্য নয়? তারাপদবাবুকেও কি তা স্বীকার করতে হয় নি?

বাংলা দেশে আমি ঘুটিং চুনের উৎপাদন ও ব্যবহারের কথাও বলেছি, যথা, 'কঙ্কর বা খোয়া যা পুড়িয়ে ঘুটিং চুন হয় তা অবিশুদ্ধ পাথর। ... এই চুন ইমারতের গাঁথনিতে ব্যবহার করা হয়।' (পৃ ২০) তারাপদবাবুও তো ঘুটিং চুন সম্বন্ধে তাই বলেছেন। তবে তিনি বলেছেন : 'এই চুনের ব্যবহারও সীমাবদ্ধ ছিল দ্রুত লোনা লেগে যাওয়ায়'। কঙ্কর চুন সম্বন্ধে রায়সাহেব ৺দুর্গাচরণ চক্রবর্তী তাঁর 'স্থপতি-বিজ্ঞান'-এ বলেছেন : 'ইহা বনিয়াদের ভিত্তি বা জলের ভিতরকার গাঁথুনিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইহাতে ছাদ তৈয়ার করিলে ফাটিয়া যায় এবং ইহা প্লাস্টার করিবার উপযুক্ত নহে।' ইনি নোনা লাগার কথা কিছু বলেন নি। বরং ১৯৩১ সালের বাংলা দেশের সেন্সাস রিপোর্টে উল্টোকথা আছে, যথা : 'It (ঘুটিং চুন — রা. মি.) is said to have had the advantage of preventing of saline action in buildings where it was used.' *(Notes on Processes of Decaying Industries)*। এখানে বলা হয়েছে ঘুটিং চুন ব্যবহার করলে ইমারতে নোনা লাগা বন্ধ হয়।

মাদ্রাজ প্রদেশের সামুদ্রিক বাখারি চুন অর্থাৎ Madras Chunam-এর কথা শুধু সাহেবরাই লিখে যান নি। ভারতীয়েরাও লিখেছেন। Madras Chunam মানে যে মাদ্রাজের বাখারি চুন

তা ইঞ্জিনিয়ার ৺নগেন্দ্রনাথ মিত্রও বলেছেন। তিনি লিখেছেন : 'The Madras Chunam plastering is done in four coats over brick work. The first coat of plaster will be half-an-inch thick and will be made of one part of *Madras shell-lime* and $1^1/_2$ part of fine white river sand।'

আর একজন ভারতীয় K. K. Roy — মাত্র ১৯৬৮ সালে *Marketing of Lime* এই নাম দিয়ে একখানি বই প্রকাশ করেন কলকাতা থেকে। তাতে তিনি লিখেছেন : '*Marine shells from the beds of Ramesharam and from Pulicut Lake,* and coral reefs in the Gulf of Mannar are utilized for lime producing. Shell deposit in the coastal tracts of Hosdrug and Kasargode Taluks (Mysore State) are also expliɔted for lime production. Seasonal collection of shells is carried out in Gandapur, Mangalore and Udipi taluks. Madras has large deposits of coral limestones but these are not being exploited on an organised basis. Large deposits are found in the sea-bed along the Ramnathpuram and Tirunelveli coast, and in some 20 islands located within a distance of 4-5 miles in Jhabua and Dhar districts. In Gujerat state the Tata Chemicals Ltd. obtain coraline limestone from the sea-bed near Okha mandal।'

কলকাতা থেকে বইটি প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও ও লেখক এ দেশীয় লোক হওয়া সত্ত্বেও বাংলা দেশে ১৯৬৮ সালে বাখারি চুন উৎপন্ন হওয়ার কথা মাত্র নেই। ইনিও কি সাহেবদের মতো মিথ্যেকথা বলেছেন? না, দেশি-বিদেশি সকল লেখকই সুনীতিবাবু ও তারাপদবাবুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বাংলা দেশ, বিশেষ করে হাওড়া জেলা, সম্বন্ধে নীরব হয়ে আছেন? একথা তারাপদ- বাবুকে আমি তর্কের স্পৃহা ছেড়ে দিয়ে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করতে অনুরোধ করি।

যদিই-বা স্মরণাতীত কাল থেকে সিলেট চুন বাংলা দেশে আমদানি হয়ে থাকে ও মাদ্রাজ উপকূলের বাখারি চুন কলকাতার বাজার দখল করে থাকে তাতে বিস্মিত হবার কি আছে? কেননা সেইরকম একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা বাংলা দেশে আবহমান কাল থেকে ঘটে আসছে। অথচ আমাদের মধ্যে কয়জনই-বা সে-কথা জানে? ১৯১৭ সালে James Hornell, F. L. S., মাদ্রাজ গভর্নমেন্টের Marine Biologist, লিখেছিলেন : 'The common or sacred chunk (শঙ্খ) are fished in hundreds and thousands in the Madras Presidency for sale to the shell-bangles workers of Bengal।' সাহেবের মুখে এই কথা শুনে তারাপদবাবু নিশ্চয়ই তাঁকে মিথ্যাবাদী ভাববেন। কিন্তু সত্যিই কি সাহেব মিথ্যাবাদী? দেখা যাক এ বিষয়ে দেশীয়রা কিছু বলেছেন কিনা। ১৯৬১ সালের ভারতের সেন্সাস দপ্তর *Handicrafts Survey Monograph* নাম দিয়ে এযাবৎ চারটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে একটি সমীক্ষা হচ্ছে বাংলার শঙ্খশিল্পের উপর। তাতে লেখা হয়েছে : 'Conch ornaments have a glorious tradition of their own in India, where especially the Chunk Bangles and Bracelets which were once regarded as their proud possession by Indian married women have an extensive use in this country from the earliest times ... with reference to all types of finished products of the craft ... conch-shell is the basic raw-mareria1 of all such products. It is a shell fish and inhabits in the sea water only. In fact conchshells are procured form the different coasts of the Gulf of Manner (between Ceylon and South India) ... Conch-shell used in this village (Rai Baghini, Mouza Mirzapur, Dt.

Bankura–R. M) by different artisans are of two kinds — (1) Tikutti and (2) Patti. Tikuttis are large-sized conch-shells of superior quality ... *it is found in plenty in the coast of Tuticorin in the district of Tinnevelly in the state of Madras.* Patti is an inferior type of shell, smaller in size and poorer in quality .... *It is found in the district of Ramnad in the state of Madras*।' স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলা দেশের এয়োস্ত্রীরা শাঁখা পরে আসছেন এবং পুরনারীরা শাঁখ বাজিয়ে আসছেন। কিন্তু শাঁখ আসছে সেই স্মরণাতীত কাল থেকেই মাদ্রাজ প্রদেশ থেকে। যদি এইরকম একটা ব্যাপক হস্তশিল্পের কাঁচামালের জন্য বাংলা দেশ আবহমান কাল থেকে মাদ্রাজের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে, তাহলে পাথুরে চুনের জন্য সিলেটের উপর ও বাখারি চুনের জন্য মাদ্রাজের উপর নির্ভর করে থাকাটা কি অসম্ভব?

আমি তো তবু বাখারি চুনের চার রকম ব্যবহারের কথা বলেছি। কিন্তু সুনীতিবাবু তো মাত্র একরকম ব্যবহারই জানেন — সেটা দেওয়ালে কলি ফেরানো। আমি তার পানের সঙ্গে ব্যবহারের কথাও বলেছি। সুনীতিবাবু এই ব্যবহারকে অত্যন্ত সীমিত করেছেন, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাদের পক্ষে পান খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, বাখারি চুন জৈব পদার্থের বিকার বলে। অবশ্য তাতে করে তাঁর থিয়োরির কোনো হানি হয় নি। কলি ফেরাবার জন্য বাখারি চুন পাওয়া গেলেই হল, অন্য কী কাজে লাগে তার জন্য তাঁর মাথাব্যথার দরকার নেই। কেননা কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তির পক্ষে একমাত্র কলিচুনেরই প্রয়োজন। কিন্তু যে তারাপদবাবু বাংলা দেশের সর্বত্র শামুকচুনের ব্যাপক ও বহুবিধ ব্যবহারের কথা বলেছেন তিনি কী করে সুনীতিবাবুর বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না? বললেন তো নাই-ই, বরং তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন এই বলে যে নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবারা পান খেতেন শাঁখ-পোড়ানো চুন দিয়ে। শামুকপোড়া চুন খেতে যাঁদের আপত্তি তাঁরা শাঁখ-পোড়া চুন কী করে খেতেন? শাঁখও তো শামুকের মতো জৈব পদার্থ। ছোট জীবটির চুন খেতে আপত্তি হল আর বড়টির খেতে আপত্তি হল না? আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি যে পূর্ববঙ্গে ঢাকা, সিলেট, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় ব্রাহ্মণেরা পাথুরে-চুন দিয়ে পান খেতেন না, শামুকচুন দিয়েই খেতেন। জানি না একথা কতদূর সত্য।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আমার মনে উঠেছে — যে শামুকপোড়া চুন দিয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবারা পান খেতে আপত্তি করতেন, সেই শামুকপোড়া চুন দিয়ে হিন্দু দেবতার মন্দির তৈরি করতে কোনো আপত্তি হতো না কেন? হওয়া তো উচিত ছিল।

আর একটি মিথ্যা অভিযোগ তারাপদবাবু আমার বিরুদ্ধে এনেছেন — আমি নাকি পঙ্খের কাজ ও কলি-ফেরানোর মধ্যে পার্থক্য বুঝি না। তাই তিনি শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর লেখা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে সে পার্থক্য আমায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি কোথাও দেওয়ালে পঙ্খের কাজের আগে বা পরে কলি ফেরাবার কথা বলি নি।

এখনও দক্ষিণবঙ্গে কলিচুন তৈরি হয় কিনা, হলে কোথায় কোথায় হয়, এর উত্তরে তারাপদ বাবু ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত শ্রীবিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন হুগলি জেলার কয়েকস্থানে, চব্বিশ পরগনার দক্ষিণে এবং মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণেও চুনারিদের কিছু কিছু অস্তিত্ব আছে। আর হাওড়া জেলার কয়েকটি গ্রামের
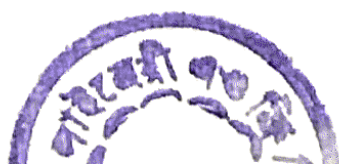
নাম উল্লেখ করে প্রত্যেকটিতে যে অল্প কয়েকঘর চুনারি ১৯৫৬ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ১৪ বছর আগে, ছিল তাদের সংখ্যা দিয়েছেন। এইসব গ্রামের নাম ও চুনারিদের সংখ্যা আমার জানা ছিল, কারণ শ্রীবিনয় ঘোষের বইটি আমার নিজের কাছেই আছে। তারাপদবাবু নিজেও দু-একটি গ্রামের নাম ও চুনারিদের সংখ্যা শ্রীবিনয় ঘোষের তালিকার সঙ্গে যোগ করেছেন।

আমি হুগলি, চব্বিশ পরগনা মেদিনীপুরের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কারণ ঐ তিন জেলায় চুনারিদের সংখ্যা দেওয়া হয় নি। তাছাড়া শ্রীবিনয় ঘোষের কথা — এই তিন জেলায় চুনারিদের কিছু কিছু অস্তিত্ব আছে — থেকেই বোঝা যায় যে অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। যা আছে তা উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং শুধু হাওড়া জেলার হিসেবই নেওয়া যাক। শ্রীবিনয় ঘোষ ৯টি গ্রামে ৩৪ থেকে ৪২ ঘর চুনারি, ও তারাপদবাবু আরো ৪টি গ্রামে ১৬ থেকে ২০ ঘর চুনারির বাসের কথা বলেছেন। এই দুই তালিকা যোগ দিলে দেখা যায় মোট ১৩টি গ্রামে ৫০ থেকে ৬২ ঘর চুনারির অস্তিত্ব ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯৭০ সালের কোনো সংখ্যা দেওয়া হয় নি। ১৯৫৬ সালের পর ১৯৬১ সালেই পরবর্তী লোকগণনা (Census) হয়। ১৯৬১ সালের সেন্সাস থেকে আমরা হাওড়া জেলার মোট লোকসংখ্যা পাই ২,০৩৮, ৪৭৭। তার মধ্যে প্রতি ঘরে শিশু, বৃদ্ধ, নারী নিয়ে গড়পড়তা ৫ জন লোক ধরলে হাওড়া জেলায় মোট চুনারির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০ থেকে ৩১০ জন। তাহলে হাওড়া জেলার মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ·০০১ শতাংশ, সমুদ্রে জলবিন্দু! এদের মধ্য থেকে শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের বাদ দিলে কার্যক্ষম, অর্থাৎ যারা চুন তৈরি করতে পারে এমন, চুনারির সংখ্যা হয় মাত্র ৬২ থেকে ৭৭ জন। কত চুন এই ক'জন মাত্র চুনারি একবছরে তৈরি করতে পারে, যদি ধরে নেওয়াই যায় এরা প্রতিদিনই কাজ করে? রসপুর-কলিকাতা গ্রামে বসু, মিত্র, উপাধিধারী যেসব চুনারির কথা তারাপদবাবু শ্রীবিনয় ঘোষকে অনুসরণ করে উল্লেখ করেছেন, তাঁরা চুনের মহাজনমাত্র, হাতে-কলমে চুনারি হতে পারেন না। তাঁরা দাদন দিয়ে চুনারিদের দ্বারা দরকার মতো চুন তৈরি করিয়ে নেন বা নিতেন।

গ্রামের সংখ্যা ধরলে দেখা যাচ্ছে মোট মাত্র ১৩টি গ্রামে চুন তৈরি হয় বা ১৯৫৬ সালে হতো। হাওড়া জেলার মোট গ্রামের সংখ্যা ১০১০। তার মধ্যে মাত্র ১৩টি গ্রামে চুনারির বাস। অর্থাৎ যে ১৩টি গ্রামে চুন তৈরি হয় বা হতো তাদের অনুপাত মাত্র ১.২ শতাংশ। এই দুটি পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় হাওড়া জেলায় শামুক চুনের উৎপাদনের পরিমাণ ও ব্যাপকতা কত নগণ্য ছিল। তারাপদবাবু তিলকে তাল করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন — সফল হন নি।

তারাপদবাবু চুনারিদের বর্তমান অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করেছেন : 'তবে এর (অর্থাৎ জোংড়া চুনের — রা. মি.) জন্যে বেশি দাম পড়ে বলে এর চাহিদা কমে যাওয়ায় এই অঞ্চলের চুনারিদের এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। ফলে অনেকেই অন্যান্য কুটিরশিল্পের পরিণামের মতো চুন তৈরির ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত-মজুরি ও ভাগচাষের উপজীবিকা গ্রহণ করেছেন।' আজ থেকে ১৭ বছর আগে ১৯৫৩ সালে ছোট-কলিকাতার চুনারিদের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীবিনয় ঘোষ লেখেন: 'প্রধান পেশা বা জীবিকা হিসাবে আজ তারা কলিচুনের উপর ভরসা করতে পারে না, কারণ কলিচুন তৈরির মেহনত অনেক, খরচ অনেক, ক্রেতারা কিনতে চান না। তবু দু'চারজন ক্রেতা যখন অর্ডার দেন তখন তারা কলিচুন তৈরি করে দেয়।' তারাপদ-

বাবু ও শ্রীবিনয় ঘোষ দুজনেরই স্বীকৃতির পর কি সত্যিই একথা বলা চলে যে এখন হাওড়া জেলার গ্রামে কলিচুন তৈরি হয়?

১৯০১, ১৯১১ ও ১৯২১ সালের বাংলা দেশের সেন্সাস রিপোর্টে Lime Burners and Cement Workersদের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৬, ৫০০, ৭, ৪৯৯ ও ৮, ৪৩৬। Cement Workers কত ও Lime Burners (চুনারি) কত আলাদা-আলাদাভাবে দেখানো হয় নি। Lime Burners-এর মধ্যে ঘুটিং চুন ও বাখারি চুন দুইরকম চুনেরই চুনারিদের ধরা হয়েছে। ঘুটিং চুন তৈরি করত কতজন আর বাখারি চুন কতজন তাও আলাদা-আলাদাভাবে দেওয়া নেই। তা না থাকলেও অনায়াসেই আন্দাজ করা যায় এখনকার পশ্চিমবঙ্গে নয়, তখনকার বৃহত্তর বঙ্গে Cement Workers ও ঘুটিং Burnersদের বাদ দিলে শুধুমাত্র বাখারি চুনের চুনারিদের সংখ্যা মোট বিপুল লোকসংখ্যার অনুপাতে কত নগণ্য ছিল। ১৯৩১ সালের Census রিপোর্টের অন্তর্গত : *Notes on the Processes of Decaying Industries*-এ বলা হয়েছে : 'Lime from shells are still prepared, however, and is *used for consumption with betel or Pan leaves* ... the industry is still carried on in parts of Chittagong by a class of Muslim।' এখানে পশ্চিমবাংলার নামগন্ধ নেই। ১৯৪১ সালের Census রিপোর্টে বাংলা দেশে চুনারিদের কোনো উল্লেখই নেই। ১৯৫১ সালে স্বাধীনতার পর যে প্রথম সেন্সাস হয় তার *Howarh District Handbook*-এ চুনারিদের সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু লেখা আছে : 'Some families around the village Kalikata are maintained by this industry।' এই সেন্সাস রিপোর্টেই আছে *Persons engaged in lime burning* (সমস্ত জেলায়, তার মধ্যে ঘুটিং পোড়ানীরাও আছে — রা. মি.) — মোট Establishment-এর সংখ্যা : ৭। এগুলিতে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সের কর্মীর সংখ্যা : ২, ১৮ বছর এবং তার বেশি বয়সের মোট কর্মীসংখ্যা : ৮। মোট চুনারির সংখ্যা : ১০, সকলেই পুরুষ। বলা প্রয়োজন এই সংখ্যা পাওয়া গেছে ২০ শতাংশ নমুনা সমীক্ষার ফলে। তাহলে এই সংখ্যাকে ৫ দিয়ে গুণ করলে সমস্ত হাওড়া জেলায় মোট চুনারির সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৫০ জন। তার মধ্যে শামুক চুনের চুনারি কজন? ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এমনকি টিকে ও ঘুঁটে তৈরি করে যারা তাদেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু সমগ্র হাওড়া জেলায়, চুনারি (lime burners)-দের উল্লেখ মাত্র নেই। এবারও ২০ শতাংশ নমুনা সমীক্ষা করা হয়।

তাই আমি আমার প্রবন্ধে রসপুর-কলিকাতা সম্বন্ধে যে-বিবরণ দিয়েছি তার শেষে লিখেছিলাম : 'চুনিয়াদের বংশধর আর কেউ নেই। চুন তৈরি বন্ধ।' চুনারিদের বংশধর আর কেউ নেই, এর অর্থ পেশাগত বংশধর কেউ নেই। চুন তৈরি যে বন্ধ তা ঠিক। অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি সে গ্রামে সোমবছরে এক ভাঁটি চুনও হয় কিনা সন্দেহ।' অথচ তারাপদবাবু বলেছেন : 'চুনারিরা আছে। এখনও চুন তৈরি হয়।' এককালে চুন তৈরি যাদের পেশা ছিল তারা থাকতে পারে, কিংবা তাদের বংশধর থাকতে পারে, কিন্তু তারা চুন তৈরি করে কি? শুধু তাই নয়, তারাপদবাবু হাওড়া জেলার যে বাখারি চুন শিল্পকে অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রাচীন বলে এত গুরুত্ব দিয়েছেন ১৯৬১ সালের বাংলা সেন্সাস বিভাগ কিন্তু সেই শিল্পকে মোটেই গুরুত্ব দেন নি। এ পর্যন্ত তাঁরা বাংলা দেশে চারটি প্রধান হস্তশিল্প সম্বন্ধে *Handicrafts*

Survey Monograph প্রকাশ করেছেন, যথা : ১. Conch-shell Products, ২. Lac Ornaments, ৩. Stonewares এবং ৪. Cutlery of Jhalda। তার মধ্যে পশ্চিমবাংলা বা হাওড়ার বাখারি চুন শিল্প নেই।

হাওড়া জেলার চুন তৈরির ব্যাপকতা সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এখন ঐ জেলার এই হস্তশিল্পের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক। তারাপদবাবু বলেছেন এ-শিল্প অতি প্রাচীন — মন্দির মসজিদ তৈরি হয়েছে এই চুন দিয়ে। ১৯৬১ সালের *Howrah District Handbook*-এ 'Notes on some Temples in Howarh District'-এ David McCutchion মোট ২৯টি (৩০টি-ও হতে পারে) মন্দিরের উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকে মন্দিরের একটা নির্মাণকাল দিয়েছেন। তা থেকে দেখা যায় মাত্র চারটি মন্দির সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে তৈরি হয়েছিল — একটি ১৬৫১ সালে, দ্বিতীয়টি ১৬৭৯ সালে, তৃতীয়টি ১৬৮৪ সালে ও চতুর্থটি ১৬৯১ সালে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে তৈরি হয়েছিল মোট পাঁচটি মন্দির ও ঐ শতকের শেষার্ধে হয়েছিল ১৮টি কি ১৯টি। একটি হয়েছিল ১৮০২ সালে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই সবচেয়ে বেশি মন্দির তৈরি হয়েছে। যদি ঐসব মন্দির ঘুটিং চুন বা অন্য চুন দিয়ে তৈরি না হয়ে বাখারি চুন দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, তবে পেশাদার বাখারি চুনের চুনারিদের আবির্ভাব এই সময়েই হয়েছিল, তার আগে নয়। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যে ৯টি মন্দির তৈরি হয়েছে তা সাময়িক প্রয়োজনে সেইখানেই চুন তৈরি করে করা হয়েছে। কখন কালেভদ্রে একটা মন্দির তৈরি হবে তার জন্য একটা পেশাদার চুনারি শ্রেণী জন্ম নিয়ে সোমবছর হা পিত্তেস ক'রে বসে থাকতে পারে না অর্ডারের অপেক্ষায়। তাছাড়া কতই বা চুনের চাহিদা থাকতে পারত তখন? দু-চারটে মন্দিরের জন্য চুন তৈরি করে চুনারিরা বাঁচতে পারে না। বাঁচতে হলে চাই ক্রমবর্ধমান চুনের চাহিদা। এবং সেই চাহিদা তখনই হতে এবং বাড়তে পারে যখন পল্লীগ্রামে একটার পর একটা পাকাবাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়েছে। প্রাচীনকালে গ্রাম বাংলায় পাকাবাড়ি ছিলই না বলা চলে। সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থরা পর্যন্ত মৃৎকুটিরে বাস করতেন। পল্লী অঞ্চলে এখনও প্রায় সেই অবস্থাই আছে। সুতরাং বাখারি চুন শিল্প বহু প্রাচীন একথা বলা কোনোক্রমেই চলে না। যদি গত ৪০০-৫০০ বছর ধরে চুনের চাহিদা বেড়েই চলত তাহলে এতদিন এই চুন তৈরি একটা কুটিরশিল্প মাত্র হয়ে থাকত না, যন্ত্রশিল্পে পরিণত হতো।

এখন দেখা যাক হাওড়া জেলার এই তথাকথিত প্রাচীন ও ব্যাপক শিল্প আজ মরণাপন্ন বা মৃত কেন? তারাপদবাবু বলেছেন : 'আমাদের দেশে যাতায়াত ব্যবস্থার, বিশেষ করে রেললাইন বসার পরে, বাইরে থেকে পাথুরে চুনের আমদানি হওয়ায় এই শিল্পটির উপর আঘাত পড়েছে। একটু পরেই লিখেছেন : 'সুতরাং আড়াইশো বছরের কারবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন (কলকাতায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে — রা. মি.) এর কারণ সুনীতিবাবু দেন নি বলে রাধারমণবাবু যে অভিযোগ করেছেন (পৃ ২৩) তার উত্তর এই প্রসঙ্গেই মোটামুটি উল্লেখ করলাম' অর্থাৎ তারাপদবাবুর মতে যাতায়াতের সুবিধা হবার পর, বিশেষ করে রেললাইন পাতার পর, বাইরে থেকে পাথুরে চুন এসে দুই কলিকাতায় বাখারি চুনের ব্যবসার সর্বনাশ করেছে। এ-কারণটি আমার মতে ঠিক নয়। আর একই কারণ দুই কলিকাতাতেই কার্য করে নি। নদীমাতৃক দেশে মানুষ ও মাল দুইয়েরই পরিবহনের সনাতন পথ হচ্ছে নদী। এখনিই

নয় রসপুর কলিকাতার পাশে দামোদর নদ মরে গেছে। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত তো এটি একটি প্রবল বহতা নদী ছিল। সেই নদীপথেই কি রসপুর-কলিকাতা অঞ্চলে পাথুরে চুন পৌঁছুতে পারত না? যদি পারত তাহলে এতদিন পাথুরে চুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার তো টিকে থাকতে অসুবিধে হয় নি তার স্বকীয় গুণের শ্রেষ্ঠত্বে। রেললাইন তো আমতা পর্যন্ত পাতা হয়েছে ১৮৯৮ সালে। তারপর থেকে রেলে করে প্রচুর পরিমাণে পাথুরে চুন ও-অঞ্চলে যাবার কথা এবং তার চাপে বাখারি চুন শিল্পের সরে যাবার কথা। কিন্তু রেললাইন হবার ৪০ বছর পরেও ১৯৩৮ সালে আমতা থানার দারোগা সুনীতিবাবুকে জানাচ্ছেন যে ছোট-কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে বাখারি চুন তৈরি হয়ে স্থানীয় চাহিদা মেটাচ্ছে। ৪০ বছর পরেও এই চুনের স্থানীয় চাহিদা এত বেশি ছিল যে তা মেটাতে প্রচুর পরিমাণে বাখারি চুন তৈরি করতে হতো। কিন্তু তার ১৫-২০ বছর পরেই অপমৃত্যু দেখছি কেন? আর নদীপথ থাকা সত্ত্বেও রেল-লাইন খোলাই যদি এই শিল্প লোপের কারণ হয় তাহলে মহানগরী কলিকাতায় বাখারি চুনের উৎপাদন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বন্ধ হয়ে না গিয়ে আরও ১০০ বছর টিকে থাকা উচিত ছিল। কারণ হাওড়ার রেলপথ হয়েছে ১৮৫৩-৫৪ সালে, শিয়ালদার রেলপথ খোলা হয়েছে ১৮৬২ সালে, ক্যানিং লাইন হয়েছে ১৮৬২-৬৩ সালে। যদি হান্টার সাহেবের কথা সত্য হয় তাহলে সিলেট চুন বাংলা দেশের যদি কোথাও এসে থাকে তো এসেছে সর্বপ্রথম কলিকাতায়, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নয়, তার বহু আগে। তাহলে তো কলকাতায় বাখারি চুন শিল্পের মরে যাওয়ার কথা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নয়, তার বহু আগে, জন্মলগ্নেই। তা না হয়ে মরল কখন? না, যখন প্রতিদিন কলকাতায় দালান, অট্টালিকা উঠছে। অর্থাৎ যখন চুনের চাহিদা বেড়েই চলেছে। আর বাখারি চুন যদি পাথুরে চুনের চেয়ে স্থায়িত্বের দিক থেকে এতই উৎকৃষ্ট হবে তাহলে ইংরেজ জাত কি এতই বোকা যে সেকথা তারা জানতে পারল না, কিংবা জানতে পেরেও তাকে বাঁচিয়ে রাখল না? তারাপদবাবুর ধারণা যেমন মহানগরী কলকাতা সম্বন্ধে তেমনি রসপুর-কলকাতা সম্বন্ধে অবাস্তব ও কাল্পনিক। সুতরাং তাঁর উচিত মনগড়া কারণের পেছনে না দৌড়ে বৈজ্ঞানিকের মতো স্থির মস্তিষ্কে বাস্তব কারণের অনুসন্ধান করা।

তারাপদবাবু বলেছেন যে তিনি জানেন যে ১৯৫৬ সাল নাগাদ বেলেঘাটায় শামুকপোড়া চুন তৈরি হতো। তাঁকে জানাই, এখনও সেখানে আড়তদারেরা অর্ডার দিলে চুন তৈরি হয়। কিন্তু এটা চুনারিদের সবসময়ের পেশা নয়। প্রধান উপজীবিকা অন্য। এখনও এইরকম কিছু-কিছু বাখারি চুন যে বেলেঘাটায় ও অন্যান্য জায়গায় তৈরি হয়, সে-চুনের একমাত্র কাজ হচ্ছে কলি ফেরাবার জন্য পাথুরে চুনের সঙ্গে মেশানো। মেশানো হয় সাদা রঙ-এর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য নয়, দেওয়ালে চুনের পোঁচকে আটকিয়ে রাখবার জন্য। কারণ শামুক প্রভৃতির খোলায় gilatine নামক আঠালো একরকম পদার্থ থাকে। পাথুরে চুনের সঙ্গে বাখারি চুন না মেশালে শিরীষ, গঁদ বা কাঞ্জি অর্থাৎ ভাতের মাড় মেশাবার দরকার হয়। বাখারি চুন মেশালে এসব হাঙ্গামা পোহাতে হয় না।

পূর্ব পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে সিলেট চুন পশ্চিমবঙ্গে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কাটনি, বিসরা, সাতনা ইত্যাদি চুন দিয়ে কাজ সারতে হয়। এইসব চুন সিলেট চুনের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট হওয়ায় এদের সঙ্গে বেশি করে বাখারি চুন মিশিয়ে দিতে হয়। ১ নম্বর কাটানি চুনের ১ ভাগের ½ ভাগ ও অন্যান্য চুনের ১ ভাগের সঙ্গে প্রায় ১ ভাগ মেশাতে হয়।

সিলেট চুনে হয় বাখারি চুন মেশাবার দরকারই হতো না, নয় খুব সামান্য পরিমাণে মেশালেই হতো। কেননা সিলেট চুনের পাথরই fossil shell অর্থাৎ শামুক ঝিনুকের মতো জলচর প্রাণীর প্রস্তরীভূত শক্ত খোলা দিয়ে তৈরি। এইজন্য সিলেট চুনের পাথরকে nummulitic stone বলে। Nummulite মানে মুদ্রাকৃতি fossil shell। তাই সিলেট চুনের আমদানি বন্ধ হওয়ার পর থেকে এদেশে বাখারি চুনের উৎপাদন কিছুটা বেড়েছিল। কিন্তু কৌটয়-ভরা কৃত্রিম সাদা রঙ বাজারে চল্‌তি হওয়ায়, পাথুরে বা বাখারি দুইরকম চুনেরই চাহিদা অনেক কমে গেছে।

তারাপদবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন আমাদের দেশের গবেষকরা কি জানেন যে দেওয়ালের গায়ে চুন-বালির প্লাস্টারের সঙ্গে পাটের কুচিও মেশান হতো? গবেষকরা জানেন কিনা জানি না, তবে আমি জানি। তাঁকে আমি একটা প্রশ্ন করি। তিনি কি জানেন যে বিলেতি প্লাস্টারের সঙ্গে পশু-লোম ব্যবহার করা হয়? যে-কারণে বিলেতে পশু-লোম ব্যবহার করা হয় ঠিক সেই কারণেই আমাদের দেশে প্লাস্টারের সঙ্গে পাটের ফেঁসো বা কুচি মেশানো হতো।

তারাপদবাবু শামুক-পোড়ানো চুনের কতরকম ব্যবহারের কথাই না বলেছেন। মন্দির, মসজিদ, অট্টালিকার গাঁথুনি থেকে আরম্ভ করে পলস্তরা, মায় কলি ফেরানো পর্যন্ত বাদ যায় নি। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের পাকাবাড়ি কোন চুন দিয়ে তৈরি হতো সে কথা বলেন নি। গোটাকতক মন্দির, মসজিদ ও রাজ অট্টালিকা নিয়ে দেশ হয় না, অগণিত সাধারণ গৃহস্থের বাড়িঘর নিয়েই দেশ। এইসব সাধারণ লোকের পাকা ঘরবাড়ি যদি বাখারি চুন দিয়ে তৈরি হতো তবেই শামুক-পোড়া চুন শিল্পকে ব্যাপক বলা যেতে পারত, এবং সে শিল্প স্থায়ীও হতো, এত সহজে এবং এত তাড়াতাড়ি মৃত বা মুমূর্ষু হতো না।

এ পর্যন্ত চুন নিয়ে যেসব বাদানুবাদ হল সেসব বাজে কচকচি (সুনীতিবাবুর ভাষায় 'কচ্চায়ন') মাত্র। মূল বিষয়ের সঙ্গে — অর্থাৎ কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তির সঙ্গে — এর কোনো সম্বন্ধ নেই। তারাপদবাবু তো স্বীকার করেছেন কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তবে তাঁর বাখারি চুন সম্বন্ধে এই দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য, আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, সুনীতিবাবুকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করা। সাহায্য করবার পদ্ধতিটা এইরকম। যদি দেখানো যায় দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপকভাবে অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে বহু প্রাচীনকাল থেকে শামুক-পোড়া চুন তৈরি হয়ে আসছে তাহলে কলকাতাতেও যে ১৫-১৬ শতক থেকে না হতো তা নয়। কিন্তু এ যুক্তির কোনো মূল্য নেই। কারণ যা হাওড়ায় ও অন্যত্র হতো তা যে কলকাতাতে হতেই হবে এমন কথা নেই। এক হাওড়া জেলাতেই আমরা দেখালাম ১০১০ গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৩টি গ্রামে বাখারি চুন তৈরি হতো, এই জেলারই বাকি ৯৯৭টি গ্রামে হতো না। শুধু তাই নয়, এই আলোচনার দ্বারা সুনীতিবাবুর থিয়োরি — তাঁর নিজের ভাষায়, 'এখানে শামুক বা গুগলী পোড়াইয়া চুন তৈয়ারী করা হইত বলিয়াই এই স্থানের নাম কলিকাতা' — প্রচণ্ড ঘা খেল! কারণ হাওড়া জেলায় যে ১৩টি গ্রামে কলিচুন হতো তার মধ্যে মাত্র একটির নাম 'কলিকাতা', বাকি বারোটির নয়। কেন নয়? এ গ্রামগুলিরও তো 'কলিকাতা' নাম হওয়া উচিত ছিল। আবার ভোগদিয়া কলিকাতার বেলায় দেখেছি যে সে গ্রামে কলিচুন তৈরি না হলেও তার নাম 'কলিকাতা' হয়েছে। কলিচুন না হলেও কলিকাতা নাম হতে পারে, আবার কলিচুন হলেও কলিকাতা নাম হয় না — এই তথ্য দুটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে কলিচুন তৈরির সঙ্গে 'কলিকাতা' নামের কোনো সম্বন্ধ নেই।

পরবর্তী অংশে উত্তর দেবার বেশি কিছু নেই। তারাপদবাবু আমার 'তলা ও 'টোলা'র উপর টিপ্পনি কেটেছেন। এ-সম্বন্ধে আমি সুনীতিবাবুকে ও শ্রীসুকুমার সেন-কে যে-উত্তর দিয়েছি তা তাঁকে দেখে নিতে বলি। শুধু তিনি যা বলেছেন তার উপর আমার মাত্র একটি কথা বলবার আছে। তিনি লিখেছেন : 'ঠাকুরের নামে শীতলাতলা, মনসাতলা, ধর্মতলা, রথতলা অর্থে এখানে বুঝিয়েছে তলদেশ অর্থাৎ পায়ের তলা।' আমার জিজ্ঞাসা — কার তলদেশ বা পায়ের তলা? শীতলাঠাকুরের? মনসাঠাকুরের? ধর্মঠাকুরের? রথের?

চুনারিটোলাকে চুন্‌রিটোলা বলেছি বলে তারাপদবাবুর ঘোর আপত্তি। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যদি চুনারিটোলাই বলি তাতে তাঁর কী সুবিধেটা হবে? এ চুনারিদের শামুক পুড়িয়েই চুন তৈরি করতে হবে এমন কি কথা আছে? তারা কঙ্কর পুড়িয়েও তো ঘুটিং চুন তৈরি করতে পারত — যে চুন কলি ফেরাবার কাজে ব্যবহার হয় না। সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল কখন তারা ওখানে বাস করতে আরম্ভ করল আর তাদের পাড়ার নাম চুনারিটোলা হল? আমি কলকাতার নকশার সাহায্যে প্রমাণ করেছি কলকাতায় ইংরেজ আগমনের বহু পরে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ঐ দুটি ব্যাপার ঘটেছিল। সুতরাং ১৫-১৬ শতকে বিদ্যমান 'কলিকাতা' নামের সঙ্গে চুনারিটোলার কোনোই সম্বন্ধ নেই।

সুনীতিবাবু তাঁর মুল প্রবন্ধে 'চুনাপুখুর' লিখে, পরে অনবধানতাবশত ভুল করে একবার 'চুনারীপুখুর' লিখে ফেলেছিলেন (আমার প্রবন্ধের ২২ পৃ দ্র)। সুনীতিবাবুর ভুল থেকে ইঙ্গিত পেয়ে তারাপদবাবু 'চুনাপুকুর'কে বলেছেন, চুনারিদের পুকুর। তিনি লিখেছেন : 'একটা পাড়ে চুনারিদের বসবাস থাকায় নাম চুনাপুকুর মাত্র, ঐ পুকুরের শামুক ইত্যাদি পুড়িয়ে চুন তৈরির জন্য চুনাপুকুর মোটেই নয়' অর্থাৎ ঐ পুকুরের পাড়ে চুনারিরা (এক ঘর না একাধিক ঘর তা তিনি বলেন নি) বাস করত মাত্র, জাতব্যবসা করত না অর্থাৎ ঐ পুকুরের শামুক ইত্যাদি পুড়িয়ে চুন তৈরি করত না। তাহলে তারা চুন তৈরি করতে যেত কোথায়? মাত্র এক ঘর চুনারি থাকলে ওটা তাদের খাস বা পারিবারিক পুকুর ছিল। ও পুকুর তারা সরতো অর্থাৎ স্নান, কাপড় কাচা, বাসন মাজা ইত্যাদি কাজের জন্য ব্যবহার করত মাত্র। আর যদি অনেক ঘর চুনারি ঐ পুকুরের পাড়ে বাস করত তাহলে তো ওখানে একটা রীতিমতো চুনারিদের পাড়া গড়ে উঠেছিল বলতে হবে। যদি পাড়া গড়ে উঠে থাকে তাহলে ঐ অঞ্চলের নাম হতো 'চুনাপুকুর লেন' নয়, চুনারিপাড়া বা চুনারিটোলা লেন। কিন্তু কলকাতায় একই অঞ্চলে পরস্পরের কাছাকাছি একই নামেই দুই পাড়ার সহ-অবস্থান কস্মিনকালে দেখা যায় নি। কলকাতার সীমানার মধ্যে একই অঞ্চলে দুটো শাঁখারিটোলা, দুটো কলুটোলা, দুটো কাঁসারিপাড়া, দুটো ধর্মতলা, দুটো কসাইটোলা, দুটো ডোমটুলি, দুটো আহিরিটোলা, দুটো কম্বুলিয়াটোলা, দুটো জেলেটোলা বা জেলেপাড়ার সাক্ষাৎ মেলে না। তাহলে এক বউবাজার স্ট্রিটেই পাশাপাশি দুটো চুনারিপাড়া বা চুনারিটোলা থাকা অসম্ভব। আর যদি মাত্র এক ঘর চুনারি ঐ পুকুরের পাড়ে বাস করত ধরে নিই, তাহলে সেখানে কলিচুনের কাজ না করার দরুণ তারা 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে কোনোই সাহায্য করল না। প্রমাণ হিসেবে নিরর্থক হয়ে গেল।

তারাপদবাবু বলেছেন, যেমন তাঁতিপুকুর থেকে অপভ্রংশে তাঁতপুকুর, তেমনি 'চুনারিপুকুর' থেকে অপভ্রংশে 'চুনাপুকুর' হয়েছে। কলকাতায় 'আরী', 'আরি', 'আড়ি', 'ইরি'- অন্ত আঞ্চলিক নামের অপভ্রংশের উদাহরণ নেই। উদাহরণ, আহিরিটোলা (আহিটোলা নয়), আহিরিপুকুর

(আহিপুকুর নয়), চুনারিটোলা (চুনাটোলা নয়), কাঁসারিপাড়া (কাঁসাপাড়া নয়), মুরারিপুকুর (মুরাপুকুর নয়), শাঁখারিটোলা (শাঁখাটোলা নয়), হাড়িপাড়া (হাড়পাড়া নয়), বাগমারি বাজার (বাগমা বাজার নয়)। যখন সারা কলকাতায় এ রকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মাত্র 'চুনারিপুকুর'-এর অপভ্রংশে 'চুনাপুকুর' হয়েছে একথা আমি মানতে প্রস্তুত নই। শ্রীবিনয় ঘোষও চুনারিপুকুর লেন লেখেন নি, চুনাপুকুর লেন লিখেছেন।

আশ্চর্যের বিষয় তারাপদবাবু বাংলার মানুষ হয়ে 'নুনিয়া' ও 'চুনিয়া' শব্দ দুটি শোনেননি। আমি তাঁকে এই দুটি শব্দের জন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান দেখতে বলি। তাছাড়া, বর্ধমান জেলার উত্তরাংশে দু-একটি গ্রামে 'চুনারি' ও 'চুনিয়া' দুই সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। এখনও আছে কিনা জানি না। তবে স্বীকার করি 'চুনিয়া' শব্দ বাংলা দেশে চলল না, 'চুনারি' শব্দই চলে গেল। বিহারে কিন্তু এখনও 'চুনিয়া' শব্দ চলে।

বিদেশিদের লেখা বইয়ের উপর তারাপদবাবুর এত রাগ কেন তা তাঁর প্রবন্ধের এই অংশে এসে বুঝতে পারলাম। তারা সব ভুল লেখে, সঠিক খবর দেয় না! কয়েকটি ভুলের উদাহরণ তিনি O'Malley সাহেবের হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার থেকে বার করে দেখিয়ে দিয়েছেন। ভুলগুলি পরে আলোচনা করছি। কিন্তু তার আগে বলা প্রয়োজন যে, ঐ গেজেটিয়ারটি আগাগোড়া ভাল করে পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে, তার একটি লাইনও ও'ম্যালি সাহেবের লেখা নয়। তিনি ছিলেন প্রধান সম্পাদক মাত্র। আগাগোড়া লিখেছেন একজন সুদক্ষ ও পণ্ডিত বাঙালি সন্তান — রায়বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্তী, এম. এ., বি. এল। ইনি শুধু Bengal Civil Service-এরই সদস্য ছিলেন না, Asiatic Society of Bengal-এর Fellow ও Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland-এর Member ছিলেন। তিনি ১৯১৬ সালে একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নাম : *History of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1747-1915* — বইখানি তাঁর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ফল। মনোমোহন চক্রবর্তীর অপর একটি মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ হচ্ছে *History of Mithila during the Pre-Mughal Period*। সুতরাং তিনি একটা মুর্খ হেঁজিপেজি লোক ছিলেন না। নিজের দেশকে ভাল করে চিনতেন ও ভালবাসতেন। এইরকম একজন বাঙালি নিজের দেশ সম্বন্ধে ভুল তথ্য দেবেন তা সম্ভব হতে পারে না। অন্য জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়নেও তাঁর সাহায্য সাহেব সম্পাদকরা নিয়েছেন।

এবার তারাপদবাবুর আবিষ্কৃত ভুলগুলি দেখা যাক। প্রথম ভুল, গ্রামের নাম Raspur না লিখে Rāspur লেখা হয়েছে। আমাদের দেশে ছাপা বইয়ে অজস্র মারাত্মক মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটে থাকে তা সকলেই জানেন। সরকারি বা বেসরকারি এখানে-ছাপা একটা বইও দেখানো যাবে না যাতে ভূরিভূরি ছাপার ভুল নেই। Rāspur যে ছাপার ভুল তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ আছে। ঐ গেজেটিয়ার থেকে যে অংশ আমি আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছি সেখানে ভারতচন্দ্রের পাণ্ডুয়াকে লেখা হয়েছে Pāndua। কিন্তু অন্যত্র ঐ একই পাণ্ডুয়া লেখা হয়েছে Pandua। প্রথম 'a'-এর মাথায় দীর্ঘস্বর 'আ'-সূচক কোনো চিহ্ন নেই। এরকম তো আকচারই ঘটে থাকে। রসপুরের মাথায় যেখানে দীর্ঘস্বরের চিহ্ন বসান উচিত হয় নি সেখানে বসেছে ভুলক্রমে, আবার পাণ্ডুয়ার মাথায় যেখানে বসান উচিত ছিল সেখানে বসে নি। এতে 'মহাভারত অশুদ্ধ' হয় নি।

আমি আমার প্রবন্ধে এই ছাপার ভুল অনুসরণ করে একবার 'রসপুর নয়, রাসপুর', আর একবার 'রসপুর বা রাসপুর'— মাত্র এই দু'বার রাসপুর লিখেছি (পৃ ৩৩)। কিন্তু আর কখনও রসপুর ছাড়া রাসপুর লিখি নি। লিখি নি এইজন্য যে আমার ভালভাবেই জানা আছে যে, স্থানীয় লোকেরা রাসপুর বলেন না, রসপুরই বলেন।

কিন্তু সবসময় স্থানীয় লোকে যা বলে সেইটিই যে ঠিক নাম বা উচ্চারণ তা না-ও হতে পারে। অনেকসময় ভুল নাম বা উচ্চারণটারই অনবরত ব্যবহারের ফলে ঠিক নাম বা উচ্চারণটি লোকে ভুলে যায়, ভুলটাই ঠিক হয়ে দাঁড়ায়। যদি কোনো পণ্ডিতব্যক্তি তাদের ভুল ধরিয়ে দেন তো যারা শোনে তারা হাসে। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি যে কটি প্রাচীন সার্ভে ম্যাপ ও রেকর্ড দেখেছি প্রত্যেকটাতেই গ্রামের নাম 'মনোহরপুর' পেয়েছি, কিন্তু সেই 'মনোহরপুর' আমাদের মুখে মুখে 'মনোহরপুকুর' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যদি কেউ মনোহরপুকুরবাসীদের বলেন 'আপনারা ভুল করছেন — আপনাদের পাড়ার নাম মনোহরপুকুর নয়, মনোহরপুর' — কেউ তাঁর কথা মানবেন? সেই রকম লোকে ভুল বলে বলে আড়কুলিকে আড়পুলিতে পরিণত করেছে, গদসাকে করেছে গড়চা, দক্ষিণ শহরকে করেছে দক্ষিণেশ্বর (এক্ষেত্রে আরোও সুবিধে হয়েছে রাসমণি মন্দিরে দ্বাদশ শিব থাকার দরুণ), বড় নগর (ফার্সিতে লেখা হতো Barahnagar – বড়ানগর) হয়েছে 'বরানগর', তা থেকে সাধুভাষায় 'বরাহনগর', উল্টাডিঙ্গা বা ডিঙ্গি আমাদের মুখে মুখে হয়েছে উল্টোডাঙা, বালাগড় হয়েছে বলাগড়, ইত্যাদি। আরও বহু উদাহরণ দিতে পারতাম কিন্তু এইই যথেষ্ট। অতএব স্থানীয় লোকে ভুল বলে বলে যদি রাসপুরকে রসপুরে দাঁড় করিয়ে থাকেন তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

গেজেটিয়ার ছাড়াও আমার 'রাসপুরে' বিশ্বাস হবার আরও একটি কারণ হল এই যে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর প্রণীত 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে'র ১৯৫০ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (পৃ ৯০-৯১) শিবায়ন রচয়িতা কবি রামকৃষ্ণ রায়ের আত্মপরিচয়সূচক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন। তার শেষের দুই পঙ্‌ক্তির তিনি নিম্নলিখিত পাঠ দিয়েছেন :

নিবাস বন্দিনু আমি রাসপুর দেশ।
এত দূরে ভাইরে বন্দনা হৈল শেষ॥

তারপরই লিখেছেন : 'কবির বাসস্থান রাসপুরগ্রাম দামোদর নদীর পূর্বতীরে হাওড়া জিলার আমতা থানায় অবস্থিত।' শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যও কি আমার মতো ভুল করলেন?

'আমরাজুড়ি'র জন্য মনোমোহন চক্রবর্তী দায়ী নন, আমিই দায়ী। গেজেটিয়ারে ঠিকই লেখা আছে Amragori (আমরাগোড়ি) আমি ভুল করে 'আমরাজুড়ি' নকল করেছি।

বাকি রইল Hu (হু) দেবতা। এটাও মনোমোহন চক্রবর্তীর ভুল বা অজ্ঞানতা নয়, ছাপার ভুল। অতি সহজেই বোঝা যায় Itu ছাপায় Hu হয়েছে। t-এর মাথার মাত্রাটা নেমে এসে দুই দাঁড়ির মধ্যখানে বসে H সৃষ্টি করেছে।

আগের দুটি হল ছাপার ভুল। এবার তারাপদবাবু একটি তথ্যের ভুল দেখিয়েছেন। গেজেটিয়ারে লেখা আছে : 'No old remains have *yet* been found in this district।' এর উপর তারাপদবাবুর টীকা হচ্ছে : 'জেলা গেজেটিয়ারে এ বিষয়ে লেখার পর এখন যদি হাওড়া জেলার কোনো স্থানে কোনো প্রাচীন প্রত্নবস্তু পাওয়া যায় — তাহলে ধরে নিতে হবে যে ওগুলো মিথ্যে — ও'ম্যালির জেলা গেজেটিয়ারে যেহেতু উল্লেখ নেই।' একেই বলে নেই-

১৪

আঁকড়ে তর্ক। এরকম কথা কেউ বলেছে বা বলতে পারে বলে আমার জানা নেই। যদি কেউ বলে থাকে বা ভবিষ্যতে বলে তাকে তারাপদবাবু যত ইচ্ছা গালাগালি দিতে পারেন। কিন্তু ও'ম্যালি বেচারা বা মনোমোহন চক্রবর্তী কী দোষ করলেন? তিনি বলেছেন — 'have *yet* been found'। 'yet' মানে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত। এটা তাঁর বলা ভুল হয়েছে না ঠিক হয়েছে — এইটিই বিচার্য। যদি তারাপদবাবু দেখাতে পারতেন যে ১৯০৯ সালের আগেই হাওড়ায় একাধিক প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে তবেই তিনি বলতে পারতেন যে বিলেতি সাহেবের ভুল হয়েছে। কিন্তু তা তো তিনি দেখাতে পারেন নি। তবে সাহেবের ভুলটা হল কোথায়?

এতক্ষণে দেখা গেল দু-একটা ছাপার ভুল ছাড়া বিলেতি সাহেবের লেখা গেজেটিয়ারে তথ্যগত কোনো ভুল নেই।

এরপর তারাপদবাবু আমার লেখা ছোট কলিকাতার ইতিহাসের ভিতর থেকে কয়েকটি ভুল বার করেছেন। তিনি বলেছেন :

১. ও-গ্রামের নাম 'ছোট কলিকাতা' নয় — কলিকাতা'। ৪০ বছর আগেকার সেটেল্‌মেন্ট রেকর্ডে 'কলিকাতা' নাম আছে।

২. 'ছোট কলিকাতা' নাম বড় কলিকাতা থেকে আলাদা করবার জন্য স্থানীয় লোকেরাই দিয়েছে — সাহেবরা নয়। সাহেবরা দিলে সেটেল্‌মেন্ট রেকর্ডে ছোট কলিকাতাই লেখা হতো, কলিকাতা লেখা হতো না।

৩. ছোট কলিকাতার সাহেবরা যদি নীলকুঠি বানিয়ে থাকে তো আশ্চর্যের বিষয় সাহেবের লেখা গেজেটিয়ারে তার কোনো উল্লেখই রইল না।

৪. আমতা থানার বাসিন্দারা রসপুর-কলিকাতার নাম জানে না — এটি একটি হাস্যকর যুক্তি (?)।

৫. কলিকাতা রসপুর গ্রামের 'পাড়া' ছিল না — চিরকালই একটি স্বতন্ত্র গ্রাম ছিল।

৬. সাহেবরা কুঠি নির্মাণের সূত্রেই রাজমিস্ত্রি, ছুতারমিস্ত্রি ও চুনারিদের আনে নি। তারা আশপাশের গ্রামেই ছিল।

৭. দারোগা দুজনের কেউই 'রসপুর-কলিকাতা' বা 'কলিকাতা-ভোগদিয়া' গ্রামকে দুটি গ্রাম বলেন নি, একটিমাত্র গ্রামই বলেছেন।

৮. কলিকাতা গ্রামের আমি যে-ইতিহাস দিয়েছি তা আমার নিছক কল্পনামাত্র।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য :

১. আমিই শুধু 'ছোট কলিকাতা' লিখি নি। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে শ্রীবিনয় ঘোষ রসপুর কলিকাতা প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছেন 'ছোট কলিকাতা'। সুনীতিবাবুও লিখেছেন : 'এই গ্রামকে ছোট কলিকাতা বলিতেও শোনা যায়।' আমি নিজে প্রথমবার ঐ গ্রামে গিয়ে সেখানকার একাধিক সাইনবোর্ডে 'ছোট-কলিকাতা' লেখা দেখেছি। তাই রসপুর কলিকাতাও লিখেছি, আবার ছোট কলিকাতাও লিখেছি।

২. গ্রামের লোকেরাই যে ছোট কলিকাতা নাম দিয়েছে তাও হতে পারে। এ সম্ভাবনা আমি অস্বীকার করছি না। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে এ নাম সাহেবদেরই দেওয়া। কারণ এই, গ্রামবাসীদের কাছে 'ছোট' কথার যা অর্থ সাহেবদের কাছে তার বিপরীত অর্থ। গ্রামবাসীরা

নিজেদের গ্রামকে 'ছোট' বলে নগর কলিকাতার চেয়ে ছোট বা হীন করতে যাবে কেন? তাতে তাদের অসম্মান। কিন্তু সাহেবরা যদি একটা অখ্যাত কলিকাতা গ্রামকে 'ছোট কলিকাতা' বলে তাহলে সেই গ্রামকে — যেখানে তারা কলকাতা থেকে এসে বসবাস করেছে, তাকে— নিজেদের চোখে তারা বড়ই করে। কেননা তাদের কাছে কলকাতার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহারণ হচ্ছে 'সুখসাগর' গ্রাম — যাকে সাহেবরা আদর করে 'ছোট কলিকাতা' বলত।

এই ছোট কলিকাতা নাম সাহেবদের আদরের নাম — ওরফের মতো বিকল্প নাম। আসল নাম যখন কলিকাতা তখন সেটেল্‌মেন্ট রেকর্ডে একটা মিথ্যা বা বিকল্প নাম লেখা হবে কেন? নদীয়া জেলার সেটেল্‌মেন্ট রেকর্ডে গ্রামের নাম সুখসাগর না লিখে কি ছোট কলিকাতা লেখা হয়েছিল?

৩. এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রথমত, গেজেটিয়ার সাহেবের লেখা নয়, বাঙালির লেখা। দ্বিতীয়ত, নীলকুঠি এতকাল আগের ঘটনা যে যখন গেজেটিয়ার লেখা হয় তখন তা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। কলিকাতা গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে মাত্র জনকয়েক সেখানে এককালে একটা নীলকুঠি ছিল এছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন নি। 'শিবায়ন' কাব্যের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন : 'এই পরগণা (বালিয়া — রা. মি.) বা রাজ্যে পৃথক রাজবংশ ছিল ... বিলুপ্ত রাজবংশের স্মৃতি পর্যন্ত এখন বিদ্যমান নাই।' এটা একটা বহিরাগত অজ্ঞাত সাহেবদের নীলকুঠি নয় — একটা স্থানীয় রাজবংশ — তারও স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত। একটু পরেই সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন : 'কবির পুত্র ও পৌত্রের দানপ্রাপ্ত ভূমির কিয়দংশ কলিকাতা গ্রামে অবস্থিত বটে— মহানগরীর অবিকল এক নামধারী বালিয়া পরগণার অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র গ্রাম রসপুরের অদূরে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। নামটি ছাড়া ইহার কোনো প্রকার ঐতিহ্য পাওয়া যায় না।' শ্রীবিনয় ঘোষও লিখেছেন : 'গ্রামের সম্বল বলতে কিছু নেই। জীর্ণ শীর্ণ গ্রাম, কঠোর জীবন সংগ্রামের সুস্পষ্ট ছাপ তার সর্বাঙ্গে ... দামোদর সংলগ্ন গ্রামটি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকে, দু-শ বছরে তার অবনতি ছাড়া কোনো উন্নতি হয় নি।'

এই অবস্থায় গেজেটিয়ার-প্রণেতারা কলিকাতার কথা কি লিখবেন? তাছাড়া তাঁরা খুব সম্ভব কলিকাতা গ্রামের নামই শোনেন নি।

৪. আমি ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে তিনবার কলিকাতা গ্রামে গেছি, শেষবার গিয়েছি গত বছর — প্রত্যেকবার ভিন্ন পথে বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়ে। সব গ্রামেরই প্রাচীন লোকদের জিজ্ঞাসা করেছি কলিকাতা ওরফে ছোট কলিকাতার নাম। সকলেই বলেছেন রসপুরের কথা শুনেছেন, অনেকেই বলেছেন সে-গ্রাম দেখেছেন, কিন্তু একজনও বলেন নি যে কলিকাতা বা ছোট কলিকাতার নাম শুনেছেন। আমার এক আত্মীয়ার বাপের বাড়ি খড়োপে — তাঁর বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। বিয়ের পরেও তিনি বহুবার বাপের বাড়ি গিয়েছেন। তিনি আজ পর্যন্ত কলিকাতা বা ছোট কলিকাতার নাম শোনেন নি। আমার আর-এক আত্মীয়ের বাড়ি বসন্তপুরে। তাঁর বয়স এখন ৫৫ বা তার বেশি। মাসের মধ্যে অন্তত দু-বার স্বগ্রামে গিয়ে থাকেন। তিনিও আজ পর্যন্ত কলিকাতা বা ছোট কলিকাতার নাম শোনেন নি। সুতরাং মনোমোহন চক্রবর্তী বা ও'ম্যালি সাহেব যে শুনবেন না তা তার বিচিত্র কি! কাছের জিনিসকে বড় করে দেখাই স্বাভাবিক। তাই তারাপদবাবু হাওড়া জেলায় বাখারি চুন তৈরির ব্যাপারটা যত বড়

করে দেখেছেন, নাম-ঐতিহ্যহীন কলিকাতা গ্রামকেও তত বড় করে ভেবেছেন। আসলে দুটিই অতি ক্ষুদ্র। এটা হতে পেরেছে উগ্র স্বস্থান-প্রীতির জন্য।

৫. আমি মানছি কলকাতাকে রসপুর গ্রামের 'পাড়া' বলাটা আমার ভুল হয়েছে। বলা উচিত ছিল 'গ্রাম'। কিন্তু এটা গোড়া থেকেই মৌজা ছিল কি? ১৬৮৪ সালের যে-দলিলের কথা তারাপদবাবু নিজ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন এবং যেটি 'শিবায়ন' কাব্যের ভূমিকায় ছাপা হয়েছে তার ভাষা থেকে বোঝবার উপায় নেই কলিকাতা তখন গ্রাম ছিল, না মৌজা? ঐ দলিলে রসপুরকে প্রথমে মৌজা বলা হয়েছে, পরে গ্রাম। আমি বলেছি সাহেবদের কারবারের শ্রীবৃদ্ধির ফলে কলিকাতা পাড়ার সমৃদ্ধি হলে এই পাড়া একটি স্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত হয়। পাড়া মানে গ্রাম ধরলে আমার মনে হয় আমি ভুল লিখি নি, ঠিকই লিখেছি। এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে জানা দরকার মৌজা ও গ্রামের মধ্যে সম্বন্ধ কি। আমার যতদূর জানা আছে, মৌজা মাত্রই গ্রাম — অর্থাৎ সে যুগপৎ গ্রাম ও মৌজা। কিন্তু গ্রাম মাত্রই মৌজা নয়। এমন গ্রামও আছে যা স্বতন্ত্র গ্রাম হয়েও অন্য একটা মৌজার অন্তর্গত। যেমন বাঁকুড়া জেলার রায়বাঘিনী গ্রাম — যেখানে শঙ্খবণিক বা শাঁখারিরা বাস করেন। এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রাম কিন্তু মির্জাপুর মৌজার অন্তর্গত, তারই একটা অংশ। চলতি কথায় মির্জাপুর গ্রামের 'পাড়া'র মতো। এই অর্থেই আমি কলিকাতা গ্রামকে রসপুরের পাড়া বলেছিলাম। আমার মতে কলিকাতা রসপুর থেকে স্বতন্ত্র গ্রাম হয়েও রসপুর মৌজার অন্তর্গত বা অংশ ছিল। সাহেবদের দৌলতে এটা স্বতন্ত্র মৌজা হয়।

৬. যেখান থেকেই হোক কলিকাতা গ্রামে এনে এই কারিগরদের বসাতে হয়েছিল। কারণ একটা বিরাট কুঠিবাড়ি তৈরি করা ২-৪ মাসের কর্ম নয়, কয়েক বছর লেগে থাকবে। কিন্তু কোথা থেকে তাদের আনা হয়েছিল সেকথা তো আমি বলি নি। বলব কী ক'রে? আমি তো নিজেই জানি না, গ্রামবাসীদের কেউই জানেন না। তবে কলকাতা থেকে যে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় নি, সেকথা নিশ্চিত। কারণ, ক্রমবর্ধমান কলকাতা শহরে যখন এইসব কারিগরদের চাহিদা বেড়েই চলেছে — কাজের অভাব নেই, তখন সুখের কলকাতা শহর ছেড়ে পচা পাড়াগাঁয়ে তারা পড়ে থাকতে যাবে কেন? দ্বিতীয়ত, আর যাদেরই শহর কলকাতা থেকে রসপুর কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হোক বা না-হোক, চুনারিদের তো কিছুতেই নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা, সুনীতিবাবু বলেছেন : 'কলিকাতা গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তুত হইত।' অর্থাৎ তারপরে হতো না। শহর কলকাতা থেকে গ্রাম কলকাতায় সাহেবরা যায়, আমি লিখেছি, অষ্টাদশ শতকের শেষ কিংবা ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। তার বহু আগেই তো শহর কলকাতায় চুন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। চুনারিরা তখন কলকাতায় কই যে যাবে?

৭. আমি স্বীকার করছি আমার বোঝাবার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সে-ভুলের জন্য দারোগা বাবুরাই দায়ী, আমি নই। দুই দারোগাই যে-দুটি গ্রামের উল্লেখ করেছেন সে-দুটির মধ্যে একটি করে হাইফেন বসিয়েছেন। অন্তত সুনীতিবাবু সেই রকমই লিখেছেন। যদি হাইফেন না বসাতেন আমার ধোঁকা হতো না। যদি লিখতেন রসপুর কলিকাতা কিংবা কলিকাতা ভোগদিয়া, আমি দুটিকে আলাদা-আলাদা গ্রাম বুঝতাম। হাইফেন চিহ্নের ব্যবহার তো এর ঠিক উল্টোটাই বোঝায়। *Chamber's Dictionary*-তে hyphen-এর অর্থ এইরকম দেওয়া আছে :

'n. a short stroke (-) joining two syllables or words' ; *Oxford Dictionary*-তে hyphen-এর অর্থ এইরকম দেওয়া আছে : 'n. Sign (-) used to join two words together ; (v. t.) join (words) with hyphen ; write (compound word) with hyphen.' । আমিও তো ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছি যে মধ্যে হাইফেন বসালে দুটি স্বতন্ত্র শব্দকে জুড়ে এক করা হয়। কিন্তু তারাপদবাবুর কথায় এখন বুঝছি আমার এ শিক্ষা ও ইংরেজি অভিধানের লেখা ভুল হয়ে গেছে।

৮. তারাপদবাবু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন ঐ ইতিহাস আমার মনগড়া বা কল্পনা নয়। তিন-তিনবার সেখানে গিয়ে বিভিন্ন লোকের মুখে টুকরো খবর শুনে সেগুলিকে জুড়ে ঐ ইতিহাস রচনা করেছি। এটি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের একটি অসম্পূর্ণ কাঠামো মাত্র। ঐ গ্রামের একজনও আমার পরিচিত ছিলেন না। দু-চার দিন যে কারও বাড়িতে থেকে অনুসন্ধান করব তারও উপায় ছিল না। দু-এক ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদে যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশি আর কী যোগাড় করতে পারতাম? আমি কলিকাতাবাসী হয়েও তো চেষ্টা করেছি। হাওড়া জেলাবাসীরা কী করেছেন আজ পর্যন্ত?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস কলিকাতা গ্রামের ইতিহাস রচনা করতে হলে সাহেবদের নীলকুঠিকেই কেন্দ্র করে করতে হবে। কারণ এই নীলকুঠিই হচ্ছে ঐ ক্ষুদ্র গ্রামের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা — (ধর্মঠাকুরের মন্দির নয়) — কি স্থাপত্যশিল্প কি অর্থনীতি সবদিক দিয়েই।

আমার লেখা ইতিহাস যদি কাল্পনিক হতো তাহলে তাকে ছাপিয়ে প্রকাশ করবার মতো বোকামি কখনোই করতে সাহস করতাম না। আমার প্রবন্ধের ৩৪ পৃষ্ঠায় 'ঙ'-র পূর্ব পর্যন্ত— 'অর্থাৎ বড় কলিকাতা নাম থেকেই ছোট কলিকাতা নামের উৎপত্তি হয়েছে' — এই পর্যন্ত লিখেই ছেড়ে দিতাম। ঐ স্থানের ইতিহাস না-জুড়লেও আমার প্রবন্ধের অঙ্গহানি হতো না। জুড়লাম এই ভরসায় যে যা আমি ছাড়া আর কেউ করল না, যা আমি এত পরিশ্রমের ফলে পেলাম, তাকে সাধারণ্যে প্রকাশ করলে যাঁরা এই গ্রামের প্রকৃত ইতিহাস জানেন তাঁরা এর মধ্যে ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন। আমার প্রত্যাশা যে নিষ্ফল হয় নি তার প্রমাণ রসপুর থেকে ২৫. ২. ৭০ তারিখে লেখা শ্রীপাঁচুগোপাল রায়ের চিঠি ('রসপুর কলিকাতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অসম্ভব') এবং শ্রীতারাপদবাবুর এই প্রতিবাদ-লিপি। কিন্তু দুটি প্রতিবাদই নেতিবাচক। ইতিবাচক কোনোটিতেই কিছু পেলাম না।

আমি সরকারি তক্‌মা এঁটে লোকজন নিয়ে দূর অপরিচিত গ্রামে সন্ধান করতে যাই নি। যাঁরা সেসব সুবিধে নিয়েই যান তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল সরকারি রিপোর্ট থেকেই তুলে দিচ্ছি। ১৯৬১ সালের সেন্সাস-সূত্রে বাঁকুড়া জেলার মির্জাপুর মৌজার রায়বাঘিনী গ্রামের শঙ্খশিল্প সম্বন্ধে যে সমীক্ষা-পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে *(Handicrafts Survey Monograh on Conch-shell Products)* তার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেসব সরকারি কর্মচারী সমীক্ষা করতে গিয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে তাঁরা লিখেছেন :

> When people's memory is too feeble to recall an event of couple of years ago and when the yard stick of time is constituted by measures of a score or two (এক কুড়ি, দুকুড়ি) one is wholly perplexed to record the unrecorded history of the village and its people. Even if a history is linked together from the loose annals of the simple village folk, one cannot guarantee

its authenticity in the absence of any written documents, numismatic evidence or archaeological finds. The history that is built borders more or less on village legends or myths.

আমার সংগৃহীত ইতিহাসও না-হয় 'পৌরাণিক' কাহিনী (myth) হল। তাতে দোষ কি? বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম একক প্রচেষ্টা তো বটে। ছোট কলিকাতার ক্ষেত্রেও কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক বা মুদ্রা সংক্রান্ত প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে লিখিত দলিল একটা ছিল, কিন্তু আমার জানা ছিল না। তারাপদবাবু এই দলিলের সন্ধান না-দিলে আমি জানতেই পারতাম না। এর জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দলিলটি শুধু আমারই অজানা নয়। আমার বিশ্বাস বাংলা দেশের কোনো ঐতিহাসিকই এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলের কথা জানেন না। জানতেন শুধু শ্রীপাঁচুগোপাল রায়। কিন্তু, আমার যতদূর জানা আছে তিনি কোনো দৈনিক কাগজে বা সাময়িকপত্রে এই দলিলটি প্রকাশ করেন নি। তাঁরই উদ্যোগে 'শিবায়ন' কাব্য দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় কাব্যের ভূমিকায় ঐ দলিলটির নকল ছাপিয়ে দিয়েছেন। শ্রীবিনয় ঘোষ রসপুর গ্রামের কথা লিখতে গিয়ে এই দলিলটির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ১৬৮৪ সালের এই দলিলে যে কলিকাতা গ্রামের উল্লেখ আছে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে তার উল্লেখ নেই। মনে হয় তিনিও জানতেন না, নচেৎ কলিকাতা গ্রামকে দুশো বছরের গ্রাম বলতেন না, বলতেন প্রায় তিনশো বছরের গ্রাম। সুতরাং এই দলিলের অস্তিত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছাড়া সমগ্র বাংলা দেশে কেউ জানে না। আমি এই অসংখ্য লোকদের মধ্যে একজন মাত্র।

এখন এই দলিলটি কত নির্ভরযোগ্য বিচার করে দেখা যাক। এই দলিলটিতে আমি কতকগুলি গুরুতর অসংগতি দেখতে পাচ্ছি, যথা :

১. যে-দলিলটি শিবায়নের ভূমিকায় ছাপা হয়েছে তাতে বর্ধমানের মহারাজা শ্রীযুত কৃষ্ণরাম রায় লিখছেন : 'তোমারদিগের ইষ্টদেবতী শ্রীশ্রী ৺(রাধাকান্ত বিগ্রহ ঠাকুর) ছিলেন তাহা আমি শেবা করিতে লইলাম তুমি পুনরায় ৺ প্রকাষ করিয়া শেবা করহ।' কী কারণে মহারাজা ঠাকুরকে সেবা করতে নিলেন তাঁর দলিলে তার কোনো উল্লেখ নেই। সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন : 'যে মর্মান্তিক ঘটনা এই সনদে আভাসে বর্ণিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার স্মৃতি বংশ পরম্পরায় সম্যক জাগরূক রহিয়াছে। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রসপুর আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক বিগ্রহ ঠাকুরকে লইয়া যান। তৎকালে কবি রামকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। তিনি আক্রমণকালে বিগ্রহ দেবালয় হইতে সরাইয়া ঘুঁটের গাদায় লুকাইয়া রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে মর্মাহত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্বে জগন্নাথ প্রমুখ পুত্রেরা "ধরাগলায়" বর্ধমান যাইয়া মূল বিগ্রহের পরিবর্তে নূতন বিগ্রহ প্রকাশের ও দেবোত্তর সম্পত্তির সনদ আদায় করিয়া আনিয়াছিলেন।' এই কাহিনী সম্পাদকদ্বয় ঐ বংশের শ্রীপাঁচুগোপাল রায় বা অন্য কারো কাছ থেকে শুনে তাঁরা যেমনটি বলেছেন তেমনটি লিখেছেন, গল্পের সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা বিচার না করেই। তিনশো বছর আগে লোকদের মধ্যে ধর্মসংস্কার প্রবল ছিল। বর্ধমানরাজ যে এই সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। উল্টোদিকে

প্রমাণ রয়েছে তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও ধার্মিক ছিলেন। নচেৎ কবি রামকৃষ্ণের পুত্রগণের কাতর প্রার্থনায় তিনি বিচলিত হতেন না এবং তাঁদের নতুন বিগ্রহ স্থাপন করে শুধু তাঁকে সেবা করবারই অনুমতি নয়, ঐ দেবতার সেবার জন্য ৮৫ বিঘা দেবোত্তর জমি দান করতেন না। এইরকম এক ধার্মিক ব্যক্তি দস্যুর মতো একজন নিরীহ গরিব লোকের গ্রাম আক্রমণ করে জোর করে তাঁর ইষ্টদেবতাকে লুঠ করে নিয়ে যাবেন কেন? এটা সম্ভবপর নয়। ৺রাখালদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত ও ১৯১৪ সালে প্রকাশিত বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস, 'বৰ্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত'-এ এই ঘটনার আভাস মাত্র নেই। শুধু এইটুকু আছে — শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম রায় ১৬৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চেতোয়া বরদার বিদ্রোহী রাজা শোভা সিংহের হাতে নিহত হন। তিনি যে বীরপুরুষ ছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহ করা তাঁর স্বভাব ছিল একথা শুধু ঐ ইতিহাস থেকেই নয়, অন্য কোনো সূত্র থেকেই জানা যায় না। সমস্ত বর্ধমান রাজবংশে একমাত্র কৃষ্ণরামের পৌত্র কীর্তিচন্দই বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি বহু যুদ্ধ করেন এবং প্রত্যেকটিতে জয়ী হয়ে শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মত সিংহের তালুক চেতোয়া ও বরদা, কবি ভারতচন্দ্রের পিতার রাজ্য ভুরুশুট ও মনোহরশাহী পরগনা, রাজা রঘুনাথ সিংহের রাজ্য চন্দ্রকোণা ও বয়রা এবং তারকেশ্বরের কাছে বলগড়ে (বালিগাড়ি) ও ঘাটালের কাছে বরদ রাজ্য অধিকার ক'রে নিজ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করেন। বিষ্ণুপুররাজকেও তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজত্ব কেড়ে নিতে পারেন নি। কৃষ্ণরাম রায় পৌত্র কীর্তিচন্দের ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিলেন না।

২. বর্ধমানরাজের সঙ্গে কবি কৃষ্ণরামের কী সম্বন্ধ ছিল দেখা যাক। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪৮ ভাগ, প্রথম সংখ্যায় ইংরেজি ১৯৪১ সালে শ্রীপাঁচুগোপাল রায় রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি লেখেন : 'কিম্বদন্তী এই যে তিনি (রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র) বৰ্দ্ধমান রাজ সরকারে কোনোও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ মহারাজার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে মহারাজা তাঁহাকে ভূমিসম্পত্তি দান করেন।' এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যাচ্ছে কবি বর্ধমানরাজের কর্মচারী ছিলেন। একজন আশ্রিত কর্মচারীর পূজিত গৃহদেবতাকে কোনো ধর্মপরায়ণ হিন্দু রাজা জোর করে কেড়ে নিয়ে যেতে পারেন? দ্বিতীয়ত, এই প্রবন্ধে কবির ইষ্টদেবতাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবার কোনো উল্লেখ নেই। বরং উল্টোকথা আছে। কবির পুত্র মহারাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে মৃত কর্মচারীর পুত্র হিসেবে মহারাজা তাঁকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫০) এইরকম লিখেছেন : 'বৰ্দ্ধমান রাজপরিবারের সঙ্গে (কবি) রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে রামকৃষ্ণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই তাঁহার পুত্র বৰ্দ্ধমান রাজসরকারে সাহায্যপ্রার্থী হইলে বৰ্দ্ধমান মহারাজা তাঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন।' এখানেও কবির গৃহদেবতা লুণ্ঠনের কোনো উল্লেখ নেই। শ্রীপাঁচুগোপাল রায়ের ও শ্রীভট্টাচার্যের বিবরণ হুবহু এক। লক্ষণীয় যে এই দুই লেখার কোনোটিতেই বর্ধমানরাজের অধীনস্থ কর্মচারীর গৃহদেবতা লুণ্ঠনরূপ মহাপাতকের উল্লেখ ও নিন্দা নেই।

৩. শিবায়নের ভূমিকাতে লেখা হয়েছে : 'এই (বালিয়া) পরগণা বা রাজ্যে পৃথক রাজবংশ ছিল — বর্ধমানরাজ বোধহয়, সর্বপ্রথম, দক্ষিণ রাঢ়ের এই প্রাচীন রাজ্য আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক দখল করেন — বিলুপ্ত রাজবংশের স্মৃতি পর্যন্ত এখন বিদ্যমান নাই'। ঐ রাজবংশের দু-জন

রাজা — রণসিংহ রায় ও পরবর্তী রাজা চৈতন্য সিংহের উল্লেখের পর ভূমিকায় লেখা হয়েছে : 'সুতরাং ঠিক ১০৯০ সনেই রাজা কৃষ্ণরাম বালিয়া পরগণা বলপূর্বক অধিকার করেন। বিলুপ্ত রাজবংশের কুলদেবতা ছিলেন বোধহয়, 'সিংহবাহিনী' — কৃষ্ণরাম 'নিজ বালিয়ায়' (অর্থাৎ বালিয়া পরগনার রাজধানীতে) ঐ দেবতার নামে **বৃহৎ দেবোত্তর দান** করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই রসপুর আক্রান্ত হইয়াছিল — দেখা যাইতেছে, আক্রমণের সাফল্য, বিজিতের দেববিগ্রহ অধিকার করিয়া পর্যবসিত হইল। ... **কবি রামকৃষ্ণ পরগনার মধ্যে রাজতুল্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন বলিয়াই তাঁহার কুলদেবতা কাড়িয়া লওয়া হয়।**' এই কাহিনী আমার কলিকাতা গ্রামের ইতিহাসের চেয়ে কোনো অংশেই কম বিচিত্র বা কম অসম্ভব নয়।

প্রথমত, আমরা এখানে দেখছি বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম শুধু রসপুরই আক্রমণ করেন নি। তার ঠিক আগেই বালিয়া পরগনা আক্রমণ করে জোর করে সে রাজ্য অধিকার করেন। তাহলে মহারাজ কৃষ্ণরাম তাঁরই পৌত্র কীর্তিচন্দের মতো যুদ্ধবাজ ও পররাজ্য গ্রাসকারী ছিলেন— পররাজ্য আক্রমণ করাই ছিল তাঁর স্বভাব — কিন্তু পূর্বেই বলেছি বর্ধমান রাজ-ইতিহাস সেকথা বলে না। দ্বিতীয়ত, পূর্বে যে-কারণ দেখানো হয় নি, এখানে তা দেখানো হয়েছে। এখানেই আমরা বর্ধমানরাজের রসপুর আক্রমণের কারণটি জানতে পারছি। কারণটি হচ্ছে, কবি রামকৃষ্ণ 'রাজতুল্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ' ছিলেন। তাহলে তিনি বর্ধমানরাজের অধীনে ছিলেন না, রাজার মতো স্বাধীন ছিলেন। অথচ কিছু পূর্বেই আমরা দুজনের লেখা থেকেই জানতে পেরেছি যে কবি বর্ধমান রাজসরকারে চাকরি করতেন। তাহলে তিনি রাজতুল্য কী করে হতে পারেন? তৃতীয়ত, আক্রমণের ফলের মধ্যে তফাৎ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বালিয়া পরগনার রাজার রাজ্য আক্রমণ করে কেড়ে নেওয়া হল, কিন্তু সেই রাজবংশের কুলদেবতা 'সিংহবাহিনী'কে কেড়ে নিয়ে যাওয়া তো হলই না, বরং ঐ দেবতার সেবার জন্য 'বৃহৎ দেবোত্তর' দান করা হল। তারপরেই কবি রামকৃষ্ণের রসপুর আক্রমণ করে তাঁর কুলদেবতাকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হল। দুটি ক্ষেত্রে এরকম আচরণের পার্থক্যের কারণ কী? বিজিত রাজার রাজ্য ধ্বংস করে তাঁর কুলদেবতা কেড়ে নিয়ে যাবার নজির মহারাজা মানসিংহ স্থাপন করেছিলেন। বর্ধমান মহারাজ কৃষ্ণরাম যদি বালিয়ারাজের রাজ্য ধ্বংস করে তাঁর কুলদেবতা সিংহবাহিনীকে কেড়ে নিয়ে যেতেন কেউ দোষ দিত না। কিন্তু তাঁর দেবতা কাড়া হল না, সেই পরগনার যিনি রাজা নন, রাজতুল্য পুরুষমাত্র (প্রকৃতপক্ষে অধীনস্থ কর্মচারীমাত্র) তাঁর কুলদেবতাকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হল। সিংহবাহিনীকে কেড়ে নিয়ে যেতে বোধহয় মহারাজার ধর্মসংস্কারে বেধেছিল, কিন্তু রাধাকান্তজীকে কেড়ে নিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র বাধল না। এটাও কি বিশ্বাস করতে হবে?

৪. এইসব অসংগতি ছাড়া আরও একটি কারণে উল্লিখিত দলিলটিকে প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। শিবায়নের ভূমিকাতে লিখিত হয়েছে : 'এই বংশের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর দেবোত্তর সম্পত্তির মূল সনদের একটি প্রাচীন নকল রক্ষিত আছে।' তাহলে যে-সনদ ভূমিকায় ছাপা হয়েছে সেটি মূল সনদ নয়, তার এক প্রাচীন নকল। কত প্রাচীন, নকলকারীর নামধাম, নকলের তারিখ কিছুই উল্লিখিত হয় নি। শুধু বলা হয়েছে প্রাচীন নকল। মূল সনদটি রক্ষিত হল না, অথচ এই প্রাচীন নকলটি সযত্নে রক্ষিত হল — এর কারণ কী? লোকে মূলকেই সযত্নে রক্ষা করে, নকলকে নয়। এক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। জানি না ভূসম্পত্তির ব্যাপারে নকল দলিল আদালতে প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হতে পারে কিনা!

৫. আরও আশ্চর্যের বিষয় — নকলে লেখা আছে: '(সাক্ষর) মহারাজা শ্রীযুত কৃষ্ণরাম রায়।' এ কখনো হতেই পারে না। কৃষ্ণরাম রায় কখনো নিজেকে 'মহারাজা' পরিচয় দিয়ে সনদে স্বাক্ষর করতেই পারেন না। কারণ, কৃষ্ণরাম রায় 'মহারাজা' তো বহু দূরের কথা, 'রাজা'ও ছিলেন না। ছিলেন 'চৌধুরী' মাত্র। তাঁর পৌত্র কীর্তিমান কীর্তিচন্দও 'রাজা' উপাধি পান নি। কীর্তিচন্দের উত্তরাধিকারী তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীচিত্রসেন রায় এই বংশে সর্বপ্রথম 'রাজা' উপাধি পান দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে কীর্তিচন্দের জীবদ্দশায়। রাজা চিত্রসেন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী ও খুড়তুতো ভাই রাজা তিলকচন্দ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান রাজবংশে সর্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি পান। এই বংশে শুধু 'মহারাজা' বা 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাব কেউ পান নি। ('বর্দ্ধমান রাজ-বংশানুচরিত' দ্রষ্টব্য)।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য নকল দলিলটি সন্দেহাতীত নয়। অতএব আমি ঐ দলিলের প্রমাণে ইং ১৬৪৮ সালে কলিকাতা নামক গ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি না। সুতরাং আমার লেখা রসপুর কলিকাতার ইতিহাস সত্য হোক মিথ্যা হোক, কিংবদন্তিমূলক কিংবা 'পৌরাণিক' যাই হোক-না-কেন, যতক্ষণ না অন্য কেউ সঠিক ইতিহাস দিতে পারছেন ততক্ষণ যেমন আছে তেমনই থাকবে, একজনের গবেষণার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে। যে মুহূর্তে সত্য ইতিহাস পাব সেই মুহূর্তেই আমার রচিত ইতিহাস ত্যাগ করব।

কিন্তু তারাপদবাবুর এইসব তর্কবিতর্ক মূল বিষয়ের — অর্থাৎ কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের — পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর। বৃক্ষের কাণ্ডটিকে অক্ষত রেখে তার শাখা-প্রশাখাকে কেটে ফেলবার চেষ্টার সমান। কাণ্ডের মূলে কুঠারাঘাত না-করে মাত্র ডালপালাকে ছেঁটে ফেললে কাণ্ডের কোনো ক্ষতি হয় না। আমি যদি স্বীকারও করে নিই তারাপদবাবুর সব কথাই ঠিক, আমার সব কথাই ভুল, তাহলেও মহানগরী কলিকাতা ও রসপুর কলিকাতা — এই দুই কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি সুনীতিবাবুর থিয়োরি অনুসারে প্রমাণিত হয় না। মাত্র দুটি কাজ করলেই প্রমাণিত হয়। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে যদি কলিকাতা গ্রামের প্রথম উল্লেখ সাহিত্যে পাওয়া গিয়ে থাকে, সুনীতিবাবু মাত্র একটি লিখিত দলিল থেকে প্রমাণ দিন যে ১৪৯৫ সালের পূর্বেই এই গ্রামে কলিচুন তৈরি হতো। পরে তৈরি হতো দেখালে চলবে না। সেইরকম রসপুর কলিকাতা গ্রামের প্রথম উল্লেখ যদি ১৬৮৪ সালের দলিলে পাওয়া যায় তাহলে তারাপদবাবুও একটি লিখিত দলিল থেকে প্রমাণ দিন যে ১৬৮৪ সালের আগে থেকেই ঐ কলিকাতা গ্রামে চুন তৈরি হতো। মাত্র এই দুটি ছোট্ট কাজ করলেই দুই কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি সুনীতিবাবুর থিয়োরি অনুসারে সত্য বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু সুনীতিবাবু বা তারাপদবাবু দুজনের কেউই তো এই প্রমাণ দিতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও সুনীতিবাবু লিখেছেন : 'আমার মত পরিবর্তনের কোনো কারণ দেখি না।' তাঁর পক্ষে একথা বলা কতদূর ন্যায়সংগত হয়েছে তার বিচার সুধী পাঠকবৃন্দই করবেন।

৪ পাঁচুগোপাল রায়

'এক্ষণ' পত্রিকায় ১৩৭৬ সালের ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে', প্রবন্ধ লইয়া সাহিত্যিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। গবেষণার গভীর অরণ্যে প্রবেশ

করা আমাদের দুঃসাধ্য এবং সে ইচ্ছাও পোষণ করি না। তবে প্রসঙ্গক্রমে ঐ পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় আমার দলিল এবং শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রীরাধারমণ মিত্র মহাশয় যে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু না-বলিয়াও থাকা যায় না। রসপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কলিকাতা এবং তথাকার চুনারিদের সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ করাও কর্তব্য বোধ করি। আমি মিত্র মহাশয়ের সকল উক্তি উদ্ধৃত না-করিয়া বন্ধনীর মধ্যে কেবল পত্রিকার সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ করিব।

শ্রীমিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন : 'চুনিয়াদের বংশধর কেউ নেই। চুন তৈরি বন্ধ, এর অর্থ পেশাগত বংশধর কেউ নেই। চুন তৈরি যে বন্ধ তা ঠিক। অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি সে গ্রামে সোমবছরে এক ভাঁটি চুনও হয় কিনা সন্দেহ (৬ : ৯৬)।' তবে এখনও হয়— ১. বংশধর বলতে পেশাগত বংশধর এবং স্বল্প পরিমাণ উৎপন্ন হওয়াকে 'বন্ধ' এরূপ বিকৃত অর্থ বোধগম্য হওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। ২. 'পাড়া' মানে গ্রাম (৬ : ১০৬) ভাবাও যায় না। পাড়া গ্রামের অংশ বলিয়া সকলেই জানেন।

শ্রীমিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন : 'আমি প্রথমবার যখন সে গ্রামে যাই তখন সেই বিরাট কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। (বাং ১৩৪৫ সালের পূর্বে নয়) শেষবার গিয়ে দেখি সে ভগ্নস্তূপ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে (৪ : ৩৪)।' আমার বয়স এখন ষাট বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু, ৩. বাল্যাবধি প্রায় একইরূপ দেখে আসছি, সামান্য তারতম্য হওয়া অসম্ভব নয়। ৪. কলিকাতা গ্রামে বসু, মিত্র উপাধিধারী চুনারিরাই হাতেকলমে চুন তৈরি করেন। তাঁহারা মহাজন নন বা জাতিতে কায়স্থ নন — একান্তই চুনারি জাতি সম্প্রদায়।

বিনয়বাবু ও তারাপদবাবু মোট ১৩টি গ্রামে চুনারিদের বাসের কথা জানতে পেরেছেন। ৫. হাওড়া জেলায় আর কোথাও চুনারিদের বাস নাই এমন কথা তাঁহারা বলেন নাই। ৬. অতএব হাওড়া জেলায় ১০১০টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৩টি গ্রামে চুনারিদের বাস, শ্রী মিত্র মহাশয়ের এই হিসাব সঠিক নাও হইতে পারে। ৭. কলিকাতা গ্রামের চুনারিদের না হয় সাহেবরা আনিলেন (৪ : ৩৪), অন্য গ্রামের চুনারিরা কি করিয়া আসিলেন?

ইং ১৯৫০ সালে শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় 'শিবায়ন' কাব্যের সম্পাদক ছিলেন না — ৮. শ্রীমিত্র মহাশয় লক্ষ করিলে দেখিতে পাইতেন 'শিবায়ন' কাব্য প্রকাশিত (বাং ১৩৬৩) হইবার পর মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে সেই সংস্করণে উক্ত উদ্ধৃতিটি (৬ : ১০৩) ঐরূপ দেওয়া নাই। ১৯৫৮ খ্রি. তৃতীয় সংস্করণে উদ্ধৃতিটি এইরূপ :

> মিরাস বন্দিনু বাস্তু রস্বপুর দেশ।
> এতদূরে ভাইরে বন্দনা হৈল শেষ॥

ইহা ছাড়া মূল 'শিবায়ন' কাব্যটি যাহা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে — তাহাতে কোথাও 'রাসপুর' বলিয়া উল্লেখ নাই। ৯. আশ্চর্যের বিষয়, মিত্র মহাশয়ের দৃষ্টি এই আসল পুস্তকখানিতেও আকর্ষিত হইতে পারে নাই।

শ্রীমিত্র মহাশয় বলিয়াছেন : 'তিন তিনবার সেখানে গিয়ে বিভিন্ন লোকের মুখে শুনে সেগুলিকে জুড়ে ইতিহাস রচনা করেছি। ঐ গ্রামের একজনও আমার পরিচিত ছিলেন না। দু-চারদিন যে কারও বাড়িতে থেকে অনুসন্ধান করব তার উপায় ছিল না (৬ : ১০৭)।'

১০. মিত্র মহাশয়কে ২৫. ২. ৭০ তারিখে আমি যে-পত্র লিখি তাহাতে তাঁহাকে আর-একবার আসিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। যদি আসিতেন, তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া সুখী হইতে পারিতাম। পত্রখানির নকল আমি রাখি নাই। ১১. তবে বোধ হয় অবাস্তব (অসম্ভব নয়) লিখিয়াছিলাম। ১২. আমার দলিলখানি কোনো দৈনিক অথবা সাময়িকপত্রে প্রকাশ করিলেই-বা কি হইত? (৬ : ১০৮)। 'শিবায়ন' কাব্যের ভূমিকায় প্রকাশিত দলিল এবং আশুতোষবাবুর মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের নূতন সংস্করণগুলি তো তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া আছে।

এইবার আমার দলিল এবং শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ ঠাকুরের প্রসঙ্গে আসি। শ্রীমিত্র মহাশয় দলিলের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩. দলিল খানি যথার্থই নকল। মহারাজার নিজের স্বাক্ষর থাকিলে হয়ত 'মহারাজা' শব্দটি ব্যবহৃত হইত না (৬ : ১১২)। মনে করি শব্দটি নকলকারীই বসাইয়াছেন। ১৪. পুঁথি হইলে অন্য কথা, দলিল নকলকারী হয়ত তৎকালে নিজের স্বাক্ষর এবং তারিখ দিয়া রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই (৬ : ১১১)। ১৫. মূল দলিল না-থাকিবার কারণ সম্ভবত এই যে, ইংরাজ রাজসরকার যখন নিষ্কর জমিসমূহের উপর কর ধার্য করিতে চাহিলেন তখন উত্তরাধিকারগণের সহিত আদালতে মোকদ্দমা হয়। তাহাতে ঐ দলিলখানির সহিত অন্যান্য দলিল আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল। ঐ সকল দলিলের একখানি প্রাচীন তালিকা আমার নিকট আছে। মূল দলিল না-পাওয়া গেলেও দলিলে লিখিত জমিগুলির ফসলের প্রাচীন ছাড়পত্রও আছে। বাংলা ১২৯৩ সালে ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষ্কর জমিসমূহের স্বীকৃতিস্বরূপ যে 'তায়দাদ' দেওয়া হয় তাহাতে ঐ দলিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। মূল দলিল না-থাকিলে অথবা দলিলের বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য না হইলে এরূপ 'তায়দাদ' দেওয়া সম্ভব হইত না। ১৬. এই দলিল ব্যতীত শ্রীসাঁতরা মহাশয় ১১৬৯ সালের অপর একখানি দলিলের উল্লেখ করিয়াছেন (৬ : ৭৩)। তাহার সম্বন্ধে মিত্র মহাশয় নীরব রহিয়াছেন। ১৭. প্রয়োজন হইলে কলিকাতা গ্রামের নাম সম্বলিত আরও দলিল দেখানো যাইতে পারে।

১৮. শ্রীমিত্র মহাশয়ের উল্লিখিত 'রাজবংশানুচরিত' পুস্তক অথবা প্রবন্ধ (বলেন নাই)প্রামাণ্য কিনা আমাদের জানা নাই। তবে বর্ধমান রাজবংশের রাজোপাধির অপর একটি তথ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৯. ১৩৬২ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে 'শ্রীশ্রীতারকেশ্বর তীর্থ কত কালের?' — শীর্ষক প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন : 'মোহন্ত মোহনগিরি একটি মূল্যবান জত্তাব দাখিল করেন। ... ঐ সকল স্থানের রাজা ভারামল্য রায় ... সন ৭৮৫ সালে এক সনন্দ দেন ও তৎপরে রাজা জগৎরাম মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র তিলকচাঁদ প্রভৃতি ... । বৃদ্ধ মোহন্তের উক্তি হইতে পাওয়া যাইতেছে, তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কার বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা জগৎরাম রায়ের রাজত্বকালের (বঙ্গাব্দ ১০৯৯-১১০৯) পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা।'

২০. শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'ও (১ম খণ্ড দ্বিতীয়ার্ধ) এই রাজোপাধির বিবরণ পাওয়া যায় : 'ঘনরাম বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের আশ্রিত অর্থাৎ বৃত্তিভোগী ছিলেন।' পাদটীকায় :

জগৎ রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র রায়।

আশীর্ব্বাদ করি তায় বসিয়া বারামে,
কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।। (পৃ ১৮০)

শ্রীযুক্ত সেন অন্যত্র লিখিয়াছেন : 'রাম হাজারার পুঁথি পাওয়া যায় নাই, ইনি রামচরিত লিখিয়া বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের কাছে মোটা পুরস্কার পাইয়াছিলেন' (ঐ, পৃ ৪০৭)। ২১. এখানে স্পষ্টতই রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের মৃত্যুর কথা আছে।' (ঐ, পৃ ১৭৫)।

চার্লস স্টুয়ার্ট প্রণীত ও দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' (সন ১৩১৬) এই রাজোপাধির কথা লিখিত হইয়াছে (পৃ ২৯২)। কিংবদন্তী অনুযায়ী রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের বর্দ্ধমান রাজসরকারে কর্ম করিবার কথা লিখিয়াছিলাম (৬ : ১১০)। কিংবদন্তী সবসময় হুবহু সত্য নাও হইতে পারে। আমি ১৯৩৭ খ্রি. অব্দে বর্ধমান রাজ স্টেটে চিঠিপত্র লিখিয়া সঠিক তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হই নাই। কিন্তু যদি কেহ পরে সঠিক তথ্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে পূর্বমত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। বিজিত রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়া তাঁহার কুলদেবতাকে মানসিংহের কাড়িয়া লইয়া যাইবার কাহিনী শ্রীমিত্র মহাশয় দিয়াছেন। ২২. মানসিংহ অধার্মিক রাজা ছিলেন না এবং অন্যান্য হিন্দুরাজ্য জয় করিয়াও তাঁহাদের কুলদেবতা কাড়িয়া লইয়া যাইবার ঘটনা আমাদের জানা নাই। এক্ষেত্রে ঐ একই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। ২৩. গোকুল মিত্রের মদনমোহন বিগ্রহ কৌশলপূর্বক লইয়া যাইবার কাহিনীও জানা যায়। পরন্তু গোকুল মিত্রের ধর্মপরায়ণতার কথাই আমাদের জানা আছে। মনে হয়, বিগ্রহের বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া বিগ্রহ অধিকৃত হইয়া থাকিবে। ২৪. রসপুরের রামকৃষ্ণের রাধাকান্ত বিগ্রহ অধিকার করিবার অনুরূপ কাহিনীই কিংবদন্তীতে জানা যায়। ২৫. এইরূপ বিগ্রহ অধিকার, তাঁহারা রাজ্য জয়ের সমতুল্য গৌরব বোধ করিতেন। ২৬. কোনো কারণের দিকে লক্ষ রাখিয়াই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই অধিকারের কাহিনী পরিত্যক্ত হইয়াছিল অথচ তাহাতে মূল প্রবন্ধের কোনো হানি হয় নাই। এই বিগ্রহ অধিকারের কাহিনী এরূপ প্রচার লাভ করিয়াছিল যে, এই কাহিনী লইয়া একসময়ে একটি গীতিকবিতা রচিত হইয়াছিল।

দেবদেবী সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কাহিনী শোনা যায়। জনসাধারণ সেগুলি কেবল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন নাই, প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে স্থান লাভ করিয়া খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। তারকেশ্বরের অনাদিলিঙ্গ শিব, রাজবলহাটের রাজবল্লভী প্রভৃতি দেবদেবীর কাহিনী এইরূপেই জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীমিত্র মহাশয় হাওড়া জেলাবাসীদের কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন : 'আমি কলিকাতাবাসী হয়েও তো চেষ্টা করেছি। হাওড়া জেলাবাসীরা কী করেছেন আজ পর্যন্ত (৬ : ১০৭)।' আমরা শ্রীমিত্রের কাছে সত্যই কৃতজ্ঞ এবং এই প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া যে-বাদানুবাদ হইতেছে তাহা হইতে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিবার সুযোগ পাইয়াছি। ২৭. তবে শ্রীমিত্র মহাশয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য বরেণ্য সুনীতিবাবুর প্রবন্ধ পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়েই তো কলিকাতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছেন। হাওড়ার অধিবাসী না-হয়েও শ্রদ্ধেয় বিনয়বাবু শ্রীমিত্রের পূর্বেই ইহার আলোচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকেরা তাঁহাদের দৃষ্টির কোনো সীমারেখা রাখেন না। আমরা হাওড়ার অধিবাসীমাত্রই সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আমরা কেবল মিত্র মহাশয়কেই নয়, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রকেই সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

প্রত্যুত্তর

মূল বিষয় ছিল কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি। সেই আসল বিষয় থেকে বহু দূরে সরে এসে এর পূর্বে অনেক অবান্তর বিষয় নিয়ে যথেষ্ট কচকচি করা হয়েছে। এত বেশি করা হয়েছে যে 'এক্ষণ'-এর পাঠকগণ হাঁপিয়ে উঠেছেন, আমিও তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। শ্রীপাঁচুগোপাল রায় মশাইয়ের প্রতিবাদ-লিপিটির অধিকাংশই সেইসব বাজে কচকচিতে ভরা। তাই তার উত্তর দেবার আদৌ প্রয়োজন কিংবা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না। অথচ না-দিলেও নয়। তাই যত সংক্ষেপে পারি তাঁর আপত্তিগুলির জবাব দিচ্ছি। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে জানি। উপায় কী?

উত্তর দেবার সুবিধার জন্য আমি শ্রীরায় মশাইয়ের আপত্তিগুলিকে ১, ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করে নিয়েছি।

১. 'বিকৃত' অর্থ বোধগম্য হওয়া যদি শ্রীরায় মশাইয়ের প্রকৃতই সাধ্যাতীত হয়ে থাকে তবে আমি নিরুপায়। কিন্তু যদি বোধগম্য করবার ইচ্ছা থাকে তাহলে একটি পরামর্শ দিয়ে আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি। পরামর্শটি এই — তিনি শ্রীবিনয় ঘোষের ও শ্রীতারাপদ সাঁতরার লেখা চুনারিদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা এবং ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের আদমসুমারির রিপোর্ট থেকে চুনারিদের সম্বন্ধে আমি যে-উদ্ধৃতি দিয়েছি সেইগুলি, একবার নয়, কয়েকবার পড়ুন। তাহলে অর্থবোধ হলেও হতে পারে। তাঁর উল্লিখিত 'বিকৃত' অর্থ আমি একাই করি নি, ১৯৬১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টও করেছে।

২. পাড়া মানে গাঁ যদি শ্রীরায় মশাই ভাবতেও পারেন না, তাহলে সাধু ভাষায় 'পল্লী-গ্রাম' ও চলতি ভাষায় 'পাড়া-গাঁ' কথা দুটি বলেন কি করে? 'পাড়া' ও 'গাঁ' — এ দুটির মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। আজ যা 'পাড়া', তাই কাল 'গাঁ, আর আজ যা 'গাঁ', তাই কাল 'পাড়া' হতে পারে ও হয়ে থাকে।

৩. নীলকুঠিকে শ্রীরায় মশাই বাল্যাবধি প্রায় একরকমই দেখে আসছেন। তাঁর চোখ দিয়ে তিনি একরকম দেখেছেন, আমার চোখ দিয়ে আমি অন্যরকম দেখেছি। বোঝা যাচ্ছে দুজনের দৃষ্টিতেই মূলত প্রভেদ। করা যাবে কী?

৪. কায়স্থেতর জাতেরও যে বসু, মিত্র উপাধি হতে পারে একথা আমার জানা ছিল না। বুড়োবয়সে জানলাম। এজন্য শ্রীরায় মশাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

৫. ১৩টি গ্রাম ছাড়া হাওড়া জেলার আর কোথাও চুনারিদের বাস 'নাই' এমন কথা বিনয়বাবু ও তারাপদবাবু যেমন বলেন নি, তেমনি 'আছে' এমন কথাও বলেন নি।

৬. শ্রীরায় মশাই বলেছেন হাওড়া জেলার ১০১০টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৩টি গ্রামে চুনারিদের বাস, আমার এই হিসাব ঠিক নাও হতে পারে। প্রথমত, হিসাব আমার নয়। ১০১০ সংখ্যাটি পেয়েছি আদমসুমারির রিপোর্ট থেকে ও ১৩ সংখ্যাটি পেয়েছি বিনয়বাবু ও তারাপদবাবু দুজনের কাছ থেকে। বিনয়বাবুর দেওয়া সংখ্যা ৯ ও তারাপদবাবুর ৪। এঁদের দেওয়া হিসাব ভুল

হয়ে থাকলে আমারও হিসাব ভুল হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিনয়বাবুর ও তারাপদবাবুর দেওয়া সংখ্যা আন্দাজি, সঠিক নয়। কারণ এ সংখ্যা তাঁরা আদমসুমারির মতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোক গুনে পান নি, বা আদমসুমারির রিপোর্ট থেকেও নেন নি।

৭. অন্য গ্রামের চুনারিরা কী করে এলেন, একথা বলার দায়িত্ব আমার নয়, শ্রীপাঁচুগোপাল রায় প্রমুখ হাওড়া জেলাবাসীদের। আমার আলোচ্য বিষয় ছিল শুধু কলিকাতা গ্রাম, অন্য গ্রাম নয়।

৮. আমি ১৯৫০ সালে প্রকাশিত শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মশাইয়ের পুস্তকে 'রাসপুর' পেয়েছি, তাই সে কথা লিখেছি। পরের সংস্করণ পাই নি।

৯. আমার দৃষ্টি আসল পুস্তকখানিতে (অর্থাৎ 'শিবায়নে') আকর্ষিত হতে পারে নি — একথা ঠিক নয়। আকর্ষিত হয়েছে।

১০. ২৫. ২. ৭০ তারিখের চিঠিতে শ্রীরায় মশাই আমাকে আর-একবার রসপুরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন সত্য। তার জন্য দেরিতে হলেও তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁর চিঠি পড়ার আগেই আমার লেখা ছেপে বেরিয়ে গেছে। তখন গিয়ে কী লাভ হতো?

১১. পত্রখানি আমিও খুঁজে পেলাম না, তাই রায় মশাই 'অবাস্তব' না 'অসম্ভব' কি লিখেছিলেন যাচাই করতে পারলুম না। যা-ই লিখে থাকুন, একই কথা।

১২. শ্রীরায় মশাই তাঁর দলিলখানি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশ করলে, আমার চোখে পড়ুক বা না-পড়ুক, বড় বড় ঐতিহাসিকদের চোখে পড়ত ও তা নিয়ে আলোচনা হতো। একদিন সে আলোচনার রেশ হয়তো আমার কানে এসে পৌঁছতে পারত।

এতক্ষণে শ্রীরায় মশাই তাঁর আসল প্রসঙ্গ অর্থাৎ তাঁর দলিল ও শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউ ঠাকুরের প্রসঙ্গ আরম্ভ করছেন।

১৩. তিনি লিখেছেন : 'দলিলখানি যথার্থই নকল।' 'যথার্থই' শব্দটি বিভ্রান্তিকর। 'যথার্থই নকল' — এই কথার সঠিক মানে হচ্ছে নকলমাত্র, আসল নয়। কিন্তু আমার মনে হয় না তিনি এই অর্থে কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন দলিলটি মিথ্যা নকল নয়, খাঁটি নকল।

কিন্তু এটি যে মূল দলিলের খাঁটি অর্থাৎ হুবহু নকল তার প্রমাণ কী? কোনো প্রমাণই রায় মশাই দেন নি। তিনি নিজে মূল দলিলখানি দেখেন নি, মূল দলিলের সঙ্গে নকল দলিলটি মিলিয়েও দেখেন নি, তবুও তিনি বলছেন এটি খাঁটি বা হুবহু নকল। এটা তাঁর বিশ্বাস, প্রমাণ নয়। তিনি যেটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন, সর্বসাধারণেও, উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে, তাঁর বিশ্বাস মতো, সেটিকে খাঁটি বা যথার্থ বলে মেনে নেবে, এটা তিনি কেমন করে আশা করতে পারেন?

তাঁর দলিলখানি যে খাঁটি নকল একথা তিনি তো প্রমাণ করতেই পারেন নি, বরং উল্টোটাই করেছেন। অর্থাৎ স্বীকার করেছেন যে আমার সন্দেহ অমূলক নয় — দলিলখানি সত্যই আসলের হুবহু নকল নয়। তিনি নিজে লিখেছেন : 'মহারাজার নিজের স্বাক্ষর থাকিলে হয়তো "মহারাজা" শব্দটি ব্যবহৃত হইত না। মনে করি শব্দটি নকলকারীই বসাইয়াছেন।' এখানে রায় মশাই দুটি জিনিস স্বীকার করেছেন — প্রথম, মূল দলিলে মহারাজার স্বাক্ষর ছিল না, নকলে তাঁর স্বাক্ষর জাল। দ্বিতীয়, নকলকারীই 'মহারাজা' শব্দটি বসিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তাঁর কথামতো

শুধু নকলটিই মিথ্যা বলে বাতিল হয়ে যায় না, আসলটিরও অস্তিত্ব থাকে না স্বাক্ষরের অভাবে। যে নকলনবীশ মূল দলিলের এমন সাংঘাতিক পরিবর্তন করতে পারে যে যেখানে স্বাক্ষর নেই সেখানে স্বাক্ষর বসিয়ে দিতে পারে ও যিনি মহারাজা নন তাঁকে মহারাজা বানিয়ে দিতে পারে, সে যে নকলে আরো কোনোরকম কারচুপি করে নি তা কে বলতে পারে? উপরোক্ত স্বীকৃতির পর রায় মশাই কী করে বলতে পারেন যে তাঁর দলিলটি খাঁটি নকল?

আমি আশা করেছিলাম যে শ্রীরায় মশাইয়ের মতো একজন প্রবীণ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই সরল সত্য কথাটি অকপটে ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন যে দলিলটি আসলের খাঁটি নকল নয়। কিন্তু তিনি তা তো করেনই নি, বরং কূটতর্কের আশ্রয় নিয়েছেন, যথা :

১৪. আমি বলেছি নকলে নকলকারীর নাম, ধাম, তারিখ ইত্যাদি কিছুই নেই। এটাকে কোনো আইনজীবী কেন, কোনো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই কোনো দলিলের নকল বলে স্বীকার করবেন না, বলবেন একটা চোতা কাগজমাত্র, যার এক কানাকড়ি মূল্যও নেই। কিন্তু রায় মশাই তা মনে করেন না। নকলকারীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি না-থাকার কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন : 'পুঁথি হইলে অন্য কথা, দলিল নকলকারী হয়তো তৎকালে নিজের স্বাক্ষর ও তারিখ দিয়া রাখিবার প্রয়োজনবোধ করেন নাই।' একথা কোনো ছোটছেলে বললে হেসে উড়িয়ে দিতে পারা যেত। কিন্তু রায় মশাইয়ের মতো একজন প্রবীণ ও বিষয়ী লোক কী করে এমন কথা বলতে পারলেন ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি। পুঁথি নকলকারীর স্বাক্ষর, সন, তারিখ না-থাকলেও চলতে পারে, কিন্তু ভূ-সম্পত্তি, যা ভোগকারীর জীবন এবং যা গেলে তাঁর মৃত্যু, সে ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলের নকলে নকলকারীর স্বাক্ষর, সাকিন, তারিখ, ইশাদীর স্বাক্ষর ও তারিখ ইত্যাদি থাকবে **না** তা হতেই পারে না। যদি হয় তা নকল বলে কদাচ গ্রাহ্য হয় না।

১৫. এরপর শ্রীরায় মশাই মূল দলিল না-থাকবার কারণ, এবং আরো দু-তিনটি দলিলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে এই দলিলগুলির দ্বারা মূল দলিলের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে না-হলেও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়। হয় কি হয় না এটা আইনের কথা। রায় মশাইয়ের উল্লিখিত দলিলগুলির সব ক'টিই আইনসিদ্ধ কিনা, যদি সবগুলি না-হয় তো কোন কোনগুলি সিদ্ধ, আবার যেগুলি সিদ্ধ তাদের কতখানি সিদ্ধ ও কতখানি অসিদ্ধ ইত্যাদি নানা আইনসংক্রান্ত প্রশ্ন ওঠে। আইনজ্ঞগণ কিংবা আদালত ঐ দলিলগুলি পরীক্ষা করে তবেই কোনোরূপ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। আমি আইনজ্ঞ-না হওয়ায় এইসব আইনঘটিত প্রশ্নের বিচার বা মীমাংসা করবার অধিকার ও ক্ষমতা আমার নাই। সুতরাং সেগুলি নিয়ে তর্কবিতর্কের মধ্যে যাবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। আমার বিচার্য বিষয় ছিল মূল দলিলের তথাকথিত নকলটি খাঁটি নকল কিনা। ওটা যে খাঁটি নকল নয় তা দেখাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাজ শেষ হয়েছে।

তবুও আনাড়ি হিসাবেই দু-একটি কথা এখানে না-বলে পারছি না। রায় মশাইয়ের লেখার মধ্যেই একটি অসংগতি ও একটি ভুল আমার চোখে পড়েছে। তিনি বলেছেন মূল দলিল না-থাকবার কারণ এই যে সেখানি অন্যান্য দলিলের সঙ্গে আদালতে দাখিল করা হয়েছিল এবং এই সকল দলিলের একখানি তালিকা তাঁর কাছে আছে। তাহলে এ বিষয় নিঃসন্দেহ যে ঐ দলিলখানি আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। অথচ তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে : 'মূল

দলিল না থাকিবার কারণ সম্ভবত এই যে' ইত্যাদি। সুনিশ্চিত বিষয়ে আবার 'সম্ভবত' অর্থাৎ অনিশ্চয়তা কেন? এখানে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর মূল দলিলটি ফেরত নেওয়া হয়নি কেন?

আর ভুলটি হচ্ছে এই। রায় মশাই লিখেছেন : 'বাং ১২০৯ সালে (অর্থাৎ ইং ১৮০২ সালে) ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষ্কর জমিসমূহের স্বীকৃতিস্বরূপ যে তায়দাদ দেওয়া হয়' ইত্যাদি। একথা একেবারেই ভুল। বাং ১২০৯ সনে, ইং ১৮০২ সালে নিষ্কর জমিসমূহের স্বীকৃতিস্বরূপ তায়দাদ দেওয়া ইংরাজ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাং ১২০৯ সনে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্রের আমল। যদি ঐ সময়ে কেউ তায়দাদ দিয়ে থাকেন তো তিনিই দিয়ে থাকবেন। ইংরাজ সরকার সে-সময় পর্যন্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই তোলেন নি। তুলেছিলেন এর প্রায় ৩০ বছর পরে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের আমলে।

১৬. শ্রীরায় মশাইয়ের অনুযোগ শ্রীতারাপদ সাঁতরা বাং ১১৬৯ (ইং ১৭৬২) সালের আর-একখানি দলিলের কথা যা উল্লেখ করেছিলেন আমি সে-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করি নি। কেন করতে যাব? সে তো শহর কলিকাতা পত্তনের বহু পরের দলিল, আগের নয়। আগের হলে করতাম।

১৭. রায় মশাই বলেছেন প্রয়োজন হলে কলিকাতা গ্রামের নাম সম্বলিত আরো দলিল দেখানো যেতে পারে। আমার মতে কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা সেসব দলিলের কোনোটাই ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের আগের নয়।

১৮. আমি যে 'বর্দ্ধমানরাজবংশানুচরিত'-এর উল্লেখ করেছি সেটা পুস্তক, প্রবন্ধ নয়। সে পুস্তক প্রামাণ্য কিনা রায় মশাইয়ের জানা নেই। তাহলে রায় মশাইয়ের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তা জানা।

১৯. ২০. ২১. এরপর শ্রীরায় মশাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে বর্ধমানের জগৎরাম রায়, কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ও কৃষ্ণরাম রায় 'রাজা' বা 'মহারাজা' উপাধিধারী ছিলেন। প্রমাণ কী? প্রমাণ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসুকুমার সেন ও কবি ঘনরাম। ভট্টাচার্য জগৎরামকে 'রাজা' ও কীর্ত্তিচন্দ্রকে 'মহারাজা' আখ্যা দিয়েছেন। ঘনরাম কীর্ত্তিচন্দ্রকে 'মহারাজ চক্রবর্ত্তী' ও শ্রীসুকুমার সেন কীর্ত্তিচন্দ্রকে একবার 'মহারাজা' ও আর-একবার 'রাজা' ও কৃষ্ণরাম রায়কে 'রাজা' বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু ভট্টাচার্য ও শ্রীসেন — এ দুজনের কারুর কথাই প্রামাণ্য বলে ধরা যায় না। এঁরা দুজনেই সাহিত্যিক — একজনও ঐতিহাসিক নন। সাহিত্যিকেরাও, সাধারণ লোকেদের মতো, 'রাজা' ও 'মহারাজা'র মধ্যে কোনো তফাত দেখতে পান না। যাঁকেই একসময়ে 'রাজা' বলেন তাঁকেই আর একসময় 'মহারাজা' বলতে তাঁদের বাধে না। আবার সময়ে সময়ে উল্টোটাও করে বসেন। প্রথমে একজনকে 'মহারাজা' বলে পরে তাঁকেই 'রাজা' বলেন, যেমন শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন। জমিদারমাত্রকেই আমাদের দেশে সাধারণ লোকে, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে, রাজা বা মহারাজা বলত, উদাহরণ কবি ঘনরাম। এমনকী ছোটখাটো রাজাকেও সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর বলে প্রশস্তি করতে দেখা গেছে। আবার কোনো দীর্ঘকাল স্থায়ী জমিদার বংশের উত্তরপুরুষেরা যদি সত্যসত্যই বংশপরম্পরায় 'রাজা' বা 'মহারাজা' উপাধি দীর্ঘকাল ভোগ

করে এসে থাকেন, যেমন বর্ধমান রাজবংশ করেছেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের পূর্বপুরুষদেরও, যাঁরা কস্মিনকালেও রাজোপাধি পান নি, তাঁদেরও ভুল করে 'রাজা' বা 'মহারাজা' বলা হতো। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোকে এটা খতিয়ে দেখতে যেত না কোন জমিদার, কখন, কার কাছে থেকে, কী খেতাব পেলেন। অভিজাত শ্রেণীর প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি, অজ্ঞতা ও অতিশয়োক্তি — এই গণ্ডগোলের প্রধান কারণ।

২২. ২৩. ২৪. ২৫. এরপর শ্রীরায় মশাই রাজারাজড়াদের অপর রাজা বা 'রাজ্যতুল্য-ব্যক্তি'র কুলদেবতা জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবার রীতির কথা আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজা মানসিংহের ও গোকুল মিত্রের উল্লেখ করেছেন।

গোকুল মিত্রের ব্যাপার আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। কারণ তিনি রাজাও ছিলেন না এবং অন্য কারুর গৃহদেবতাকে জোরজবরদস্তি করে কেড়েও নেন নি। তাঁর ব্যাপার স্বতন্ত্র ও আমাদের পক্ষে অবান্তর।

মহারাজা মানসিংহকে শ্রীরায় মশাই বর্ধমানের কৃষ্ণরাম রায়ের সমপর্যায়ে ফেলেছেন। মানসিংহ মাত্র একটি রাজারই ঠাকুর কেড়ে নিয়ে যান, দ্বিতীয় কারুর করেন নি। কৃষ্ণরাম রায়ও মাত্র রামকৃষ্ণ রায়ের ঠাকুর কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, বালিয়া পরগনার রাজা বা অন্য কোনো রাজার কাড়েন নি। কেন দুজনে মাত্র একবার হলেও পরের ঠাকুর কেড়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের হাত কলঙ্কিত করেছিলেন? রায় মশাইয়ের মতে 'এইরূপ বিগ্রহ অধিকার (অধিকারে?), তাঁহারা রাজ্যজয়ের সমতুল্য গৌরব বোধ করিতেন।'

এই মত প্রকাশ করে রায় মশাই হিন্দু হয়েও ধার্মিক হিন্দুরাজাদের মুখে এমন চুনকালি মাখিয়েছেন যা অন্য কোনো হিন্দু দূরে থাক, কোনো ধর্মান্ধ অহিন্দুও করেছেন বলে আমার জানা নেই।

শ্রীরায় মশাই হিন্দুরাজাদের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ঠিকমতো বুঝতে না-পেরেই তাঁদের মাথায় মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়েছেন। পরের গৃহদেবতাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবার চেয়ে ঘোরতর মহাপাতক কোনো ধার্মিক হিন্দু কল্পনা করতে পারে না। রায় মশাই নিজেই স্বীকার করেছেন মহারাজা মানসিংহ ধার্মিক ছিলেন। তাহলে তিনি এমন জঘন্য পাপাচরণ কখনোই করতে পারেন না। তিনি চাঁদ রায় কেদার রায়ের রাজ্য জয় করে সেই রাজ্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। কারণ তাঁদের কোনো পুরুষ-উত্তরাধিকারী ছিলেন না। একজনের এক কন্যা ছিলেন, তিনি মুসলমানকে বিবাহ করেছিলেন। হিন্দু পুরুষ-উত্তরাধিকারীর অভাবে কেই-বা তাঁদের রাজ্য চালাবে আর কেই-বা তাঁদের গৃহদেবতার সেবা করবে? তাই বাধ্য হয়ে তিনি তাঁদের কুলদেবতাকে বিজিত রাজ্যের রাজধানীতে ফেলে রেখে না-গিয়ে শুধু তাঁর সেবা করবার উদ্দেশ্যেই নিজ রাজধানী অম্বরে নিয়ে গিয়েছিলেন, কেড়ে নিয়ে যান নি। সেই মানসিংহ-ই কিন্তু মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বিগ্রহকে নিয়ে যান নি। প্রতাপের রাজ্য তাঁর প্রাক্তন কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন, তাছাড়া রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং দেবতা রেখে গেলে তাঁর সেবা না-হবার কোনোই কারণ ছিল না। তাই তিনি নিয়ে যান নি। যদি বুঝতেন, না-নিয়ে গেলে বিগ্রহের সেবা হবে না তাহলে নিশ্চয়ই নিয়ে যেতেন।

আর-একটি দৃষ্টান্ত। রাজা সীতারাম রায়কে পরাস্ত করে তাঁর রাজ্য দান করা হয় নাটোরাধিপতিকে। তাঁরাই বংশানুক্রমে সীতারাম-পূজিত সমস্ত বিগ্রহের সেবা বরাবর করে এসেছেন। হিন্দু রাজা পরের পূজিত দেববিগ্রহকে কেড়ে নিয়ে গেছেন, এমন একটিও দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাই বর্ধমানের কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক রসপুরের রামকৃষ্ণ রায়ের রাধাকান্তজী বিগ্রহ লুঠ করে নিয়ে যাবার কাহিনী সম্পূর্ণ উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য মনে হয়। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রাজা ছিলেন না, বর্ধমান সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীমাত্র ছিলেন, তাঁর রাজ্য ছিল না, সেই রাজ্য কৃষ্ণরাম রায় গ্রাস করেন নি। তাঁর বংশধররা ছিলেন, তাঁরা ঠাকুরের সেবা অনায়াসেই নির্বাহ করতে পারতেন। তবে কেন কৃষ্ণরাম রায় তাঁর আশ্রিত কর্মচারীর বিগ্রহকে লুঠ করে নিয়ে গিয়ে মহাপাতক ভাগী হতে যাবেন? তিনি যে ধার্মিক ছিলেন, বালিয়া পরগনার বিজিত রাজার কুলদেবতার প্রতি আচরণেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি তাঁর রাজ্য গ্রাস করলেও তাঁর কুলদেবতাকে নিয়ে গেলেন না, সেইখানেই রেখে গেলেন এবং যাতে তাঁর সেবার বিন্দুমাত্র বিঘ্ন না-হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দিয়ে গেলেন। প্রকৃত ধার্মিক রাজার উপযুক্ত কাজ যা তাই করলেন। সেই রাজাই আবার রসপুরের বেলায় বিনা কারণেই ঠাকুরকে ডাকাতি করে নিয়ে যাবেন কেন?

তবে রক্ষা এই যে কাহিনীটি কিংবদন্তীমাত্র, মানসিংহ কি সীতারামের বৃত্তান্তের মতো ঐতিহাসিক নয়। আর-একটি কথা। যদি কৃষ্ণরাম রায় কবি রামকৃষ্ণের রাধাকান্তজীউকে কোনো অজ্ঞাত কারণে সত্য সত্যই নিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে সেই ঠাকুরের বর্ধমান ঠাকুরবাড়িতে আজও থাকবার কথা। এখন তিনি সেখানে আছেন কি? এ সম্বন্ধে শ্রীরায় একটি কথাও বলেন নি। যদি না-থাকেন, বুঝতে হবে গল্পটি নিছক বানানো।

২৬. ১৯৪১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে শ্রীরায় মশাই ঠাকুর কেড়ে নিয়ে যাবার কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নি। না-করবার কারণ, সেই লেখার তিরিশ বছর পরে ও 'শিবায়ন' কাব্যের ভূমিকা লেখার চোদ্দ বছর পরেও, প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি প্রকাশ করেন নি। লিখেছেন : 'কোনো কারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ... এই অধিকারের কাহিনী পরিত্যক্ত হইয়াছিল।' কারণটি তাহলে এখনও অব্যক্ত রয়ে গেল। এরকম কৈফিয়তের মূল্য কী? আর প্রয়োজনই-বা কী ছিল? কারণ যাই হোক, ব্যাপারটা তো এই যে সে-গল্প তিনি না-লিখে চেপে গেছেন। চেপে গিয়েও পরম আত্মতুষ্টির সঙ্গে লিখেছেন : 'অথচ তাহাতে মূল প্রবন্ধের (প্রসঙ্গের বা বিষয়ের?) কোনো হানি হয় নাই।' বলিহারি যাই! গল্পটির হাত, পা, মাথা সবই কাটা গেল, শুধু ধড়টি পড়ে রইল। অথচ বলেন কিনা কোনো হানি হয় নি!

২৭. আমি সুনীতিবাবুর প্রবন্ধ পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েই কলিকাতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছি — শ্রীরায় মশাইয়ের এই উক্তি সত্য, যদি তিনি কলিকাতা মানে রসপুর কলিকাতা মনে করে থাকেন। আর যদি কলিকাতা মানে শহর কলিকাতা ধরে থাকেন, তাহলে তাঁর উক্তি ভুল। সুনীতিবাবুর প্রবন্ধ পড়ার সঙ্গে আমার শহর কলিকাতা সম্বন্ধে গবেষণার কোনোই সম্পর্ক নেই।

৫. অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

বছর তিনেক আগে 'দেশ' সাপ্তাহিকে পুনর্মুদ্রিত অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি'-শীর্ষক একটি পুরানো লেখা উপলক্ষ্য করে শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র মহাশয় 'এক্ষণ' পত্রে (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটিতে রাধারমণবাবু সুনীতিকুমার-প্রস্তাবিত 'কলিকাতা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ভ্রান্ত বলে রায় দেন। ১. তিনি সুনীতিবাবুকে উপহাস করে বলেন, 'কলিকাতা' শব্দটির যা-তা একটি ব্যুৎপত্তি যদি খাড়া করতেই হয় তাহলে 'কোল কা হাতা' মেনে নিয়ে আপত্তি কি? ২. যতদূর বুঝতে পেরেছি, রাধারমণবাবু বলতে চান : স্থানের নামের সার্থকতা খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম, স্থানের নামকরণের মূলে কারণ থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই; 'কলিকাতা' নামটির ব্যুৎপত্তি আর এই নামকরণের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা মূঢ়তা। ৩. এ ছাড়া আরো অনেক কথা তাঁর প্রবন্ধে আছে, যার সঙ্গে 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি বিচারের কোনোই সম্পর্ক নেই। রাধারমণবাবুর প্রবন্ধের জবাবে অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তব্য 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি — কৈফিয়ৎ' নামে 'এক্ষণ' পত্রে প্রকাশিত হয় (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৭)। ৪. রাধারমণবাবু তাঁর প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়কেও টেনে আনেন। সুনীতিবাবুর 'কৈফিয়ৎ'-এর সঙ্গে সুকুমারবাবুর একটি চিঠিও এক-ই সংখ্যাতে ছাপা হয়, আরো ছাপা হয় শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা মহাশয়ের একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ, আর সবশেষে রাধারমণবাবুর দীর্ঘ প্রত্যুত্তর।

৫. ভাষার কোনো শব্দই অর্থহীন নয়। ব্যুৎপন্ন হোক প্রায় অব্যুৎপন্ন হোক, ভাষায় প্রচলিত শব্দ মাত্রেই সার্থক। স্থানের নামও ভাষার শব্দ ('Place-names are part of language' – F. T. Wainwright), তাও অর্থহীন নয়। স্থানের নাম নিয়ে বিদেশে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ বইও লেখা হয়েছে। বিলাতে এজন্য একটি স্থায়ী সমিতিই আছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা অসংখ্য স্থানের নামের অর্থ নির্ণয় করেছেন, তথাকথিত বহু অর্থহীন নামের অর্থ তাঁরা জানতে পেরেছেন, আর তা থেকে অনেকক্ষেত্রে ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠীও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। স্থানের নামের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে এমন অনেক তথ্য জানা গিয়েছে যা লিখিত ইতিহাসে বা সাহিত্যে লিপিবদ্ধ নেই। এখনও অনেক স্থানের নামের অর্থ জানা যায় নি, কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকেরা হাল ছেড়ে দেন নি, সেসব নাম অর্থহীন বলে রায় দেন নি। তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, স্থানের নাম আদৌ অর্থহীন নয়, স্থানের নামকরণ অকারণ নয়। কালক্রমে অর্থ লোকে ভুলে যেতে পারে, দেশের নাম দেশবাসীর কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে, আর তার নানা কারণ থাকতে পারে; কিন্তু আজকের দিনে লোকের কাছে কোনো স্থানের নাম অর্থহীন মনে হলেই যে নামটি আদৌ অর্থহীন, এমন ধারণা ভুল। স্থানের নাম থেকে সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায় ভাষাবিষয়ক তথ্য, আর পরোক্ষে পাওয়া যায় স্থানের পরিচয়-নির্দেশক বা বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক কোনো সংকেত। স্থানের নামের অর্থের মধ্যে নিহিত থাকতে পারে তার প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক বা অন্যবিধ কোনো বৈশিষ্ট্য যা এখন লুপ্ত, প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে লোকাযাত্রাসম্পর্কীয় কোনো তথ্য, লিখিত ইতিহাসে বা সাহিত্যে যার সন্ধান মেলে না। ৬. সুনীতিবাবু তাঁর 'কৈফিয়ৎ'-এর 'প্রথম অংশে' (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের

মাঝামাঝি) দু-চারটি কথায় ভাষাতাত্ত্বিকদের এই সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করেছেন। রাধারমণবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি ভাষাতত্ত্বের কিছুই জানেন না। সম্ভবত সেই জোরেই তিনি সুনীতিবাবুর ঐ সংক্ষিপ্ত উক্তিকে তাঁর 'ব্যক্তিগত মতামত' বলে হেলাভরে উপেক্ষা করতে পেরেছেন।

৭. স্থানের নামের ব্যুৎপত্তি বিচার মানে আদৌ শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার, আর এটা মুখ্যত ভাষাতত্ত্বের প্রশ্ন। বিচারে ভুল হয়েছে কিনা তার বিচার হবে সর্বাগ্রে ভাষাতত্ত্বের আসরে। সেখানে যদি ধোপে না টেঁকে তবে সঙ্গে সঙ্গে বরবাদ হবে। আর যদি টিঁকে যায়, তাহলে, স্থানের নামের ক্ষেত্রে, দেখতে হবে ব্যুৎপত্তিগত অর্থটির যৌক্তিকতা বা উপযোগিতা আছে কিনা, বা এককালে ছিল কিনা, অর্থাৎ নামের অর্থ থেকে যা জানা যাচ্ছে, তার কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন ঐ স্থানে আছে কিনা বা ছিল কিনা বা থাকা সম্ভব ছিল বলে পারিপার্শ্বিক থেকে অনুমান করা চলে কিনা — historical possibility আছে বা ছিল কিনা। যদি এরকম কোনো প্রয়াস না-মেলে লিখিত ইতিহাসে বা সাহিত্যে, যদি historical possibility-ও অনুমান করা না-চলে, তাহলে প্রশ্নটি আপাতত অমীমাংসিত থেকে যায় ; কিন্তু অন্য সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি না-জানা পর্যন্ত আগের ব্যুৎপত্তি তখনই অগ্রাহ্য হতে পারে না, যদি তা ভাষাতত্ত্বানুমোদিত হয়। একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। সবগুলি অর্থই বিচার করে দেখতে হবে। যেটি স্থানবিশেষে প্রযোজ্য সেইটি সেই ক্ষেত্রে গ্রাহ্য। কিন্তু যদি দেখা যায় কোনোটিই খাটছে না, তাহলে নতুন করে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে অনুমানও একটা প্রমাণ, অবশ্য সংগত অনুমান। অনুকূলে লিখিত প্রমাণ মেলে না বলেই কোনো স্থানের নামের প্রস্তাবিত ব্যুৎপত্তি অগ্রাহ্য হয় না, বিশেষত যেক্ষেত্রে সংগত আর অনুকূল অনুমানের অবকাশ থাকে। নামটি অব্যুৎপন্ন মৌলিক শব্দ হতে পারে, কিন্তু ভাষাতে তার অর্থ থাকবেই, কালক্রমে বিস্মৃত হতে পারে হয়তো। সেক্ষেত্রে বিস্মৃত অর্থের পুনরুদ্ধার ভাষাতাত্ত্বিকদের একটা বড় কাজ।

৮. 'কলিকাতা' একটি স্থানের নাম, একটি শব্দ। এই নামটি ইংরেজরা তাদের ভাষা থেকে আমদানি করে নি, তারা এদেশের লোকের মুখেই শুনেছে। স্থানীয় লোকেরা কিংবা প্রতিবেশীরা কিংবা এদেশে আগত ভিন্‌দেশীরা, যারাই নামটি দিয়ে থাকুক, তারা ইংরেজ নয়। ইংরেজরা এদেশে আসবার আগেই কলিকাতা তার নামটি পেয়ে গিয়েছে। আবুল ফজলের বইতে 'কলিকাতা' উপস্থিত।[১] এই 'কলিকাতা' পরগনার নাম কি মৌজার নাম কি গ্রামের নাম, তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। নামটি যারা দিয়েছে তারা শব্দটির অর্থ বুঝেই দিয়েছে, আর অকারণে দেয় নি, স্থানটির কোনো একটা পরিচয়-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই দিয়েছে। কী সেই অর্থ? নামের অর্থ থেকে স্থানটি সম্পর্কে কী জানা যায়, কী অনুমান করা যায়? সুনীতিবাবু তাঁর প্রবন্ধে এই প্রশ্নেরই উত্তর জানতে চেষ্টা করেছেন। তিনি কোনো 'থিয়োরি' হাজির করেন নি।

৯. 'কলিকাতা'-র গঠনে সুনীতিবাবু দুটি উপাদান পেয়েছেন — 'কলি' আর 'কাতা'। এই

....

১. রাধারমণবাবু অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় -প্রস্তাবিত পাঠান্তরের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ফারসী-জানিয়ে অধিকাংশ পণ্ডিতই 'কলিকাতা' পাঠ মেনে নিয়েছে।

দুইয়ের যোগে 'কলিকাতা' সমস্তপদটি হয়েছে। সমস্যমান পদ দুটিই বাংলাতে সার্থক শব্দ — মূলে এরা যেখান থেকেই এসে থাকুক। 'কলি' বা 'কলিচুন'-এর ব্যবহার বাংলাতে ইংরেজদের এদেশে আসার আগেও হয়েছে, এখনও হয়ে থাকে। বস্তুটি আর তার নাম বাংলাতে অজ্ঞাত নয়, লোক ব্যবহারে আর লোকমুখে চলে আসছে। বাংলার অঞ্চলবিশেষে লোকমুখে 'কাতা' আর 'শামুককাতা' প্রয়োগসিদ্ধ, ছেলেবেলাতে আমরাও শুনেছি। 'শামুকের খোল' অর্থে 'কাতা' বা 'শামুক-কাতা' আর 'শামুকের খোল পোড়ানো চুন' অর্থে 'কাতা-চুন' লোকমুখে আমরা শুনেছি।[২] 'কলিকাতা' নামশব্দটির দুটি অবয়বই যখন ভাষাতে সার্থক, তখন গোটা শব্দটিকে স্বয়ংসিদ্ধ মৌলিক শব্দ বলা চলে না, সাধিত শব্দই বলতে হয়। আর সমস্যমান পদ দুইটির যখন অর্থ আছে, তখন সমস্তপদটিও নিশ্চয়ই সার্থক। 'কলিকাতা'-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'কলি বা কলিচুনের জন্য কাতা বা শামুকের খোল' (তৎপুরুষ) কিংবা 'কলি ও চুন' (দ্বন্দ্ব)। এই অর্থ থেকে আর কলিকাতায় চুন-সম্পৃক্ত কয়েকটি স্থানের নাম পেয়ে সুনীতি-বাবু অনুমান করেছেন, কলিকাতায় এককালে শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হতো আর তা থেকেই স্থানের নাম হয়ে থাকবে 'কলিকাতা'। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে স্থানের নাম অর্থহীন নয়, নামকরণ অকারণ নয় ; সুতরাং 'কলিকাতা' নামের অর্থ থেকে কলিকাতার সঙ্গে শামুকের খোল পোড়ানো চুনের সম্পর্ক অনুমান করা চলে, এই অনুমান অর্থত অপরিহার্য। এই অনুমান অসংগত প্রমাণ করতে হলে 'কলিকাতা' শব্দটির অন্য ব্যুৎপত্তি তথা অন্য অর্থ হাজির করতে হবে। রাধারমণবাবু সে চেষ্টা করেন নি।

১০. এই অনুমানের পরিপোষক কোনো সাক্ষ্য লিখিত ইতিহাসে বা সাহিত্যে মেলে কি? না, আজও পর্যন্ত মেলে নি। কিন্তু লিখিত ইতিহাস বা সাহিত্য সর্ববিধ অস্তিত্বেরই সাক্ষ্য দেয় না। ইতিহাসের পুঁথিতে, দলিল-দস্তাবেজে লিপিবদ্ধ নেই এমন অনেক কিছুরই বাস্তবে অস্তিত্ব ছিল। নানা সূত্র থেকে নানা উপায়ে এই অলিখিত ইতিহাসের উপাদান জানতে পারা যায়। কলিকাতার সঙ্গে শামুক পোড়ানো চুনের সম্পর্ক অনুমান উদ্ভট কল্পনা নয়, এই অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে 'কলিকাতা' নামশব্দটির অর্থ।

কলিকাতায় এককালে শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হতো, পুঁথিপত্রে এমন কোনো প্রমাণ না-পেয়ে সুনীতিবাবু অন্য সূত্র থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা জানতে চেষ্টা করেন। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন (বঙ্গাব্দ ১৩৪৫), বাংলা দেশে 'কলিকাতা' নামে অন্তত আরো দুটি স্থান আছে — একটি পূর্ববঙ্গে, আর-একটি পশ্চিমবঙ্গে, হাওড়া জেলাতে।

....

২. আমার মনে হয়, 'কাত আর 'কাতা' একই শব্দ—'কাত'-র প্রসারে 'কাতা'। 'কাত' পাচ্ছি কাতল মাছে। শব্দটি হয়তো কোনো অনার্য ভাষার শব্দ। মূলে 'কাত' শব্দে সম্ভবত বোঝাত গাত্রবর্ম, protective covering. বা ঐ জাতীয় কিছু। কাতল মাছের গায়ে বড় বড় আঁশ, এই আঁশ হচ্ছে তার বর্ম, তার protective armour। এই থেকে 'কাতল' শব্দের 'কাত'-র অর্থ দাঁড়িয়ে যায় আঁশ, শল্ক। ওড়িয়া ভাষাতেও শুনেছি প্রায় অনুরূপ একটা শব্দ আছে, যার অর্থ শল্ক বা বর্ম। শামুকের খোলও, তার বর্মবিশেষ, তার protective armour। 'শামুকের খোল' অর্থেও তাই 'শামুক-কাতা' বা 'কাতা' শব্দের প্রয়োগ হয়। শুনেছি, উত্তরবঙ্গের একটি প্রাণীকে বলে 'বনকাতা', এর গায়েও নাকি বড় বড় আঁশের মতো আছে। 'কাত' বা 'কাতা'-র মূল যে-অর্থ আমি অনুমান করেছি, তা অবশ্যই ভাষাতত্ত্বের দরবারে বিচারসাপেক্ষ।

পূর্ববঙ্গের কলিকাতা থেকে তিনি তাঁর অনুমানের পরিপোষক কোনো তথ্য পান না, কিন্তু হাওড়া জেলার কলিকাতার যে-খবর তিনি দারোগাবাবুর মারফত পান তাতে নিজের অনুমানের যৌক্তিকতায় তাঁর প্রত্যয় জন্মে। সুনীতিবাবুকে দারোগাবাবু জানান যে, হাওড়ার কলিকাতায় শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হয়ে থাকে, আর তখনও (১৩৪৫) কয়েকটি পরিবার এই কাজে লিপ্ত আছেন। এই সংবাদ পেয়ে (আর তার আগেই আজকের কলিকাতা শহরের মধ্যে কয়েকটি স্থানের নামের অবয়বে চুন-চুনারির উপস্থিতি লক্ষ করে) সুনীতিবাবু নিশ্চিত হন যে, তাঁর প্রস্তাবিত ('কলিকাতা' নামশব্দের) ব্যুৎপত্তি তথা অর্থ থেকে যে-অনুমান তাঁর কাছে অপরিহার্য বোধ হয়েছে, বাস্তবে তার ভিত্তি ছিল। অর্থাৎ হাওড়ার কলিকাতা গ্রামে এখনও যেমন শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হয়, আজকের শহর কলিকাতা যখন বিদেশীদের মুখে Calcutta রূপ লাভ করে নি তখন সেই ইংরেজহীন কলিকাতাতেও, আকবর বাদশাহেরও আগে থেকে, শামুকের 'কাতা' পুড়িয়ে 'কলি'-চুন তৈরি হতো।[৩] তাহলে, যেখানেই এই চুন তৈরি হতো সেখানকারই নাম 'কলিকাতা' হয় নি কেন? নদীর পাড়ে হাট অনেক স্থানেই আছে বা ছিল, কিন্তু এখন প্রত্যেক স্থানেরই নাম তো 'নৈহাটী' নয় (< নদীহট্টিকা)? দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে জায়গা নষ্ট করতে চাইনে।

রাধারমণবাবু বলতে পারেন : (ক) সুনীতিবাবু 'কলিকাতা' শব্দটির যে ব্যুৎপত্তি তথা অর্থ নির্দেশ করেছেন, তা ঠিক কি বেঠিক আমি বলতে পারিনে, তবে পুরানো পুঁথিপত্রে তার স্বপক্ষে লিখিত প্রমাণ না-পাওয়া পর্যন্ত আমি ঐ ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজি নই। কিংবা, (খ) সুনীতিবাবু 'কলি' আর 'কাতা' শব্দ দুটির (আর তা থেকে 'কলিকাতা' শব্দটির) যে-অর্থ ধরেছেন, সে-অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থ থাকতে পারে, আর সেই অর্থ জানতে পারলেই 'কলিকাতা' নামের রহস্যভেদ সম্ভব হবে। সে অন্য অর্থ কী হতে পারে? রাধারমণবাবু ভেবে দেখুন। সংগততর অন্য অর্থ না-জানা পর্যন্ত সুনীতিকুমার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা বিবেচ্যই থেকে যাচ্ছে। রাধারমণবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি ; কিন্তু যত বড় পণ্ডিতই হোন, পাণ্ডিত্যের জোরে তিনি একথা বলতে পারেন না যে সুনীতিবাবু যেন-তেন-প্রকারেণ একটা ব্যুৎপত্তি খাড়া করতে চেষ্টা করেছেন।

১১. 'বিশ্বকোষ'-এর প্রবন্ধকারের অনুসরণে রাধারমণবাবু সুনীতিবাবুর বক্তব্যকে 'উষ্ণ মস্তিষ্কের প্রলাপ' বলেও উড়িয়ে দিতে পারেন না। কারো কথাই শেষ কথা নয়। মতে না মিললেই শিষ্টজনেরা অপভাষণের আশ্রয় নেন না।[৪]

১২. রাধারমণবাবু hyphen-এর ব্যবহার নিয়েও কিছু বলেছেন। হাইফেন ব্যবহারের রীতি ভারতীয় ভাষায় আগে ছিল না, সম্ভবত ইংরেজি থেকে এসেছে। সাধারণত সমস্তপদের

....

৩. পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন তৈরির ব্যাপারটা যে কল্পকাহিনী বা ইদানীংকার ঘটনা নয়, আর এই চুনের ব্যবহারও যে এদেশে নতুন নয়, তার বহু প্রমাণ শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে দিয়েছেন।

৪. কাল মার্কস তাঁর একটি লেখাতে (১৮৫৩) ভারতবর্ষকে 'the source of our languages, Our religions' বলেছিলেন। যেহেতু মার্কস একথা বলেছেন, অতএব প্রত্যেক মার্কসবাদীকেই মেনে নিতে হবে যে ভারতবর্ষ হচ্ছে ইউরোপের সমস্ত ভাষা আর ধর্মের আদি জননী! অন্য কথা শুনলেই বলতে হবে 'উষ্ণ মস্তিষ্কের প্রলাপ'।

অবয়বগুলিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করবার জন্য, তাছাড়াও ব্যাকরণের বইতে ধাতু প্রত্যয় বিভক্তি উপসর্গ ইত্যাদি বিশেষভাবে নির্দেশ করতে হাইফেনের ব্যবহার করা হয়। (রোমক লিপিতে সংস্কৃত লেখা বা ছাপার বেলাতে অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন, যদিও হাইফেনের ব্যবহার ভারতীয় ভাষায় আবশ্যিক কিছু নয়)। সমাস উভয়পদার্থপ্রধান দ্বন্দ্বও হতে পারে, উত্তরপদার্থপ্রধান তৎপুরুষও হতে পারে (কর্মধারয় ও তৎপুরুষের অন্তর্গত), অন্য প্রকারেরও হতে পারে। 'রসপুর-কলিকাতা' বলতে 'রসপুর ও কলিকাতা' (দ্বন্দ্ব) বোঝাতে পারে, আবার 'রসপুরের পার্শ্ববর্তী কলিকাতা'ও (তৎপুরুষ, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) বোঝাতে পারে। প্রসঙ্গ ধরে অর্থ বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে Chamber's আর Oxford-কে সাক্ষী মানা বৃথা।

১৩. রাধারমণবাবু প্রশ্ন করেছেন : 'শামুক-পোড়া চুন খেতে যাঁদের আপত্তি তাঁরা শাঁখ-পোড়া চুন কি করে খেতেন? শাঁখও তো শামুকের মতো জৈব পদার্থ। ছোট জীবটির চুন খেতে আপত্তি হল আর বড়টির খেতে আপত্তি হল না?' (রাধারমণবাবুর জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের দেশের বাড়িতে কখনও শামুক-পোড়া চুন আসত না, আমার মা পাথুরে চুন দিয়েই পান খেতেন। মা এখনও বেঁচে আছেন, রাধারমণবাবু আমার বাড়িতে ইতিপূর্বে এসেছেনও ,অনুগ্রহ করে, আর একটিবার এসে আমার মায়ের মুখে শুনে যেতে পারেন)। শামুক-পোড়া চুন খেতে আপত্তি, অথচ শাঁখের চুন খেতে আপত্তি নয় কেন — এ প্রশ্নের উত্তর নেই। এটা ঘটনা, এইমাত্র বলা যেতে পারে। গোরু হিন্দুদের পূজনীয় গোমাতা। গোরুর ল্যাজ ধরে বৈতরণী পার হতে হয়। এমন পবিত্র জীবের চামড়া কিন্তু অপবিত্র, পুজোর ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অথচ, বাঘ আর হরিণ, শাস্ত্রে পবিত্র জীব বলে কীর্তিত না-হলেও তাদের চামড়া পরম পবিত্র ; বাঘের বা হরিণের চামড়ার আসনে বসে পুজো করতে পারলে ব্রাহ্মণেরা খুশিই হন। এই বৈষম্যের ব্যাখ্যা কী? আচার বা সংস্কার কি সর্বক্ষেত্রেই যুক্তি মেনে চলে?

১৪. রাধারমণবাবু বলেছেন, তারাপদবাবু তাঁর প্রবন্ধে 'সুনীতিবাবুর বিরুদ্ধে একটি কথাও' বলেন নি, 'বরং তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা' করেছেন। এটা কি শিষ্টোচিত উক্তি? মনে হয়, অহেতুক ক্ষোভের বশে রাধারমণবাবু আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। তারাপদবাবু হাওড়া জেলার বাগনানের বাসিন্দা। রাধারমণবাবু হাওড়া জেলার ব্যক্তিবিশেষের অপকর্ম দেখে সমস্ত হাওড়াবাসীর উপরই চটে গিয়েছেন, বলেই ফেলেছেন : 'আমি কলিকাতাবাসী হয়েও তো চেষ্টা করেছি। হাওড়া জেলাবাসীরা কী করেছেন আজ পর্যন্ত?' dis paides hoi gerontes। আমার বিশ্বাস, বর্ষীয়ান রাধারমণবাবুর এই উক্তিতে হাওড়াবাসীরা কিছু মনে করবেন না।

যাই হোক, আমি এখানে তিনজন বিদেশী পণ্ডিতের লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, স্থানের নাম নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান, তাঁরা এই উদ্ধৃতিতে ভাববার খোরাক পাবেন।

I. Local names — whether they belong to provinces, cities and villages, or are the designations of rivers and mountains — are never mere arbitrary sounds, devoid of meaning. They may always be regarded as records of the past, inviting and rewarding a careful historical interpretation.

In many instances the original import of such names has faded away, or has become disguised in the lapse of ages ; nevertheless, the primeval meaning

may be recoverable and whenever it is recovered we have gained a symbol that may prove itself to be full-fraught with instructions ; ... the name of district or of a town may speak to us of events which written history has failed to commemorate. A local name may often be adduced as evidence determinative of controversies that otherwise could never be brought to a conclusion. (Chapter I).

The fundamental principles to be borne in mind is an axiom which alone makes the study of local names possible, and which has been tacitly assumed in the title of this volume, and through out the preceding chapters. This axiom asserts that local names are in no case arbitray sounds. They are always ancient words, or fragments of ancient words — each of them, in short, constituting the earliest chapter in the local history of the place to which they severally refer.

... No interpretation of a name can be admitted, however seemingly appropriate, until we have first satisfied ourselves of the historical possibility, not to say probability, of the proposed etymology. (Chapter XVII).

—*Words and places : or, Etymological Illustrations of History, Ethnology, and Geography* by the Rev. Isace Taylor. Macmillan. London 1864.

II. The analysis of place-names is frequently a valuable means of ascertaining whether a people have been long settled in a particular region or not. The longer a country has been occupied, the more do the names of its topographical features and villages tend to become purely conventional and to lose what descriptive meaning they originally possesed. (e.g., the more or less transparent analysis of such names of cities in America as New York, Philadelphia, Washington, New Orleans. Indianopolis, St. Louis, San Francisco, Buffalo, as contrasted with such at present meaningless European names as London, Paris, York, Leeds, Rouen, Rheims, Rome, Naples.)

Thus, it is by no means an accident that a considerable number of village names among the Nootke are incapable of satisfactory analysis, whereas the names of topographical features among such less settled tribes as the Paiute and Ojibwa are in practically every case readily interpreted.

— *Time Perspective in Aboriginal American Culture : A Study in Method* by Edward Sapir, Canada, Department of Mines, Geological Survery, *Memoir* 90, *Anthropological Series no* : 13, 1916.

III. Place-names supply in full measure linguistic information of a kind that is absent in archaeology and usually ignored or blurred in the historical record. They also supply fairly precise conclusions on the intensity of settlements, linguistic boundaries, origins and relationships, with occasional comments on social and economic conditions. This information is primarily linguistic, of course, but its political and social implications are often less ambiguous and more convincing than the equivalent implications inherent in archaeological material. (pp.3-4).

... By their nature the only direct information they [place-names] can supply is linguistic informaiton. It is true that they may be used to provide information

of a non-linguistic character, information that is often of very considerable interest to the historian, but this can only be by implication or assumption, never by direct inference. (p. 10).

... As they are names attached to places, not to objects, they may quickly become identificatory labels rather than descriptive words, and so they tend to lose their original meanings for those who use them. Which is why the great majority of place-names in Britain now have no meaning in terms of ordinary words for the millions of people who daily use them. Ordinary words fall out of use after they cease to be meaningful, but place-names remain in use for centuries after they have become meaningless as words, for they still effectively perform their basic function of identification (pp.10-11) ...

... conclusions about political and social developments reached by indirect inference from place-names are on the whole more reliable than similar conclusions reached by indirect inference from archaeological evidence (p. 47).

... On balance, in other words, the historian may prefer to put his trust in conclusions drawn from place-name evidence. This does not mean that the historian or anyone else is entitled to collect examples of British Anglo-Saxon, Pictish, Scandinavian and other groups of place-names, put them indiscriminately on maps, and then hopefully expect that simple answers to complicated questions will leap automatically to his eye. Other considerations must be taken into account if reliable conclusions are to be drawn form place-names, and it cannot be too strongly stressed that their interpretation in terms of non-linguistic conclusions offer many hazards to the unwary (pp. 56-57).

... The fundamental purpose of names is to provide a means of identification : this is the function that dictates their formation and keeps them alive. We may not know the immediate requirments of indentification behind an individual place-name, but if our interpretation of it or an assumption based on it conflicts with these underlying requirements we are likely to go astray. (p. 57).

—*Archaeology and Place-names and History* by F. T. Wainwright, Routledge and Kegan Paul, London. 1962.

প্রত্যুত্তর

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে কয়েকজন যখন আমার সমালোচনার প্রতিবাদ করেছেন তখন শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলালই-বা বাদ থাকেন কেন! তাই তিনিও এতদিন পরে একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। এত দেরি হবার কারণ কী বুঝলাম না। যে প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন তা তো আমার পূর্ববর্তী প্রত্যুত্তরের পরই পাঠাতে পারতেন। যদি তিনি এতদিন ধরে পুঁথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে বার করতেন যে ১৬৯০ সালের আগে, বা সেই সাল বরাবর, এমনকি তারপরেও, কলকাতায় শামুক-পোড়া কলিচুন তৈরি হতো বা কলিচুনের ব্যবসা ছিল, তাহলে দেরি হবার একটা সংগত কারণ থাকতে পারত। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে তার চিহ্নমাত্রও দেখলাম না। বরং তিনি স্বীকার করেছেন যে সুনীতিবাবু এমন কোনো লিখিত প্রমাণ কোনো দলিলে পান নি।

তাহলে সুনীতিবাবুর মূল প্রবন্ধের যে-সমালোচনা আমি করেছিলাম সেটা অ-খণ্ডিতই থেকে গেল। তবে এ লেখার অর্থই-বা কী আর মূল্যই-বা কী?

মূল্য কিছু না-থাকলেও অর্থ একটা আছে। তাঁর প্রবন্ধটি গৌণত আমার লেখার প্রতিবাদ, মুখ্যত সুনীতিবাবুর মূল প্রবন্ধের পক্ষে জোর ওকালতি। সুনীতিবাবুর 'কৈফিয়ৎ' পড়ে অনিলবাবু সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছে তাতে অনেক কিছুই বলা হয় নি, অনেক কথা বাদ পড়ে গেছে। তাই তিনি লেখনী ধারণ করে সুনীতিবাবুর লেখার উপরে চুনকাম করেছেন। এটি সুনীতিবাবুর 'কৈফিয়ৎ'-এর 'কৈফিয়ৎ'।

তাই ভাষাতত্ত্বের দাবি ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনটি ইংরেজি পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আমাকে এক দীর্ঘ লেকচার দিয়েছেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কী কারণে সুনীতিবাবু 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি' প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং কী কারণে নিছক ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে ঐ প্রবন্ধটি সার্থক। কারণ জেনে আমার বা পাঠক সাধারণের কোনো লাভ নেই। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সার্থক কিনা বলতে পারি না, তবে তথ্য ও সত্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ অসার্থক একথা জোর করেই বলতে পারি। ভাষাতত্ত্ব কী বলে কী না-বলে তা কলকাতা নামের ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর। সুতরাং ঐসব অবান্তর বিষয়ের প্রত্যুত্তর দিয়ে আমার সময় ও পরিশ্রম নষ্ট করার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যদি না-দিই তাহলে তার অর্থ হতে পারে যে আমার জবাব দেবার কিছু নেই বলেই জবাব দিতে পারলাম না। তাই এই প্রত্যুত্তর।

অনিলবাবুর প্রতিবাদের যে যে অংশের আমি উত্তর দিয়েছি, সুবিধার জন্য সেগুলিকে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করেছি।

১. উপহাস করে বলি নি, seriously বলেছি। উপহাস করে আমি যা বলেছি বলে অনিলবাবু লিখেছেন সেটা আমার কথার বিকৃতি। আমি লিখেছিলাম : 'যদি মাত্র "কলিকাতা" নামের একটা যেমন-তেমন ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করাই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে 'কোল কা হাতা' বা 'কোলি কা হাতা' ত চমৎকার ব্যুৎপত্তি। কিন্তু সুনীতিবাবু কি এ ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করবেন? করবেন না।' এ থেকে কি বোঝায় আমি সুনীতিবাবুকে উপহাস করেছি, না বলেছি তিনি যা-তা একটা ব্যুৎপত্তি খাড়া করতে চেয়েছেন?

২. স্থানের নাম সম্বন্ধে আমি যা বলতে চাই তা অনিলবাবু বুঝতে পারেন নি। আমি বলেছিলাম: 'নাম একটি মনগড়া (arbitrary) চিহ্ন, যা বস্তু বা ব্যক্তি বা স্থানের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাকে অন্য বস্তু বা ব্যক্তি বা স্থান থেকে পৃথক ক'রে সনাক্ত করবার জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামের সঙ্গে বাস্তবের মিল হয় না। ... স্থানের নামের ক্ষেত্রে এ অসংগতি আরো বেশি প্রকট ও ব্যাপক। বস্তুত ব্যক্তির নামের মানে তবু বোঝা যায়। স্থানের নামের মানে বহু ক্ষেত্রে বোঝাই যায় না। ... 'কলি' ও 'কাতা' এই দুই শব্দের টেনেবুনে একটা অর্থ দাঁড় করালেও এটা সত্য নয় যে গোটা নামটা 'কলিকাতা' নামক স্থানের বাস্তব বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করছে।' এখানে আমি যা বলেছি আর অনিলবাবু আমার বক্তব্য বলে যা চালাবার চেষ্টা করেছেন — দুটো কি এক জিনিস?

নাম যে একটা মনগড়া চিহ্ন, কোনো বস্তু ব্যক্তি বা স্থানকে সনাক্ত করবার জন্য, আমার এ-কথার সমর্থন পাচ্ছি অনিলবাবুর প্রবন্ধের শেষে দেওয়া তৃতীয় ইংরেজি উদ্ধৃতিতে। সেখানে বলা হয়েছে : *'The fundamental purpose of names is to provide a means of identification.'*

৩. সুনীতিবাবুর প্রবন্ধে এই রকম কথা অনেক আছে বলেই আমার প্রবন্ধে আছে।

৪. আমি টেনে আনি নি। সুনীতিবাবুই অধ্যাপক সুকুমার সেনের প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই আমাকে করতে হয়েছে।

৫. 'ভাষার কোনো শব্দই ... যার সন্ধান মেলে না' (পৃ ৬৩-৬৪)। এখানে প্রায় আধ পৃষ্ঠা ধরে শ্রীকাঞ্জিলাল ভাষাতত্ত্বের প্রশস্তি গেয়েছেন। ভাষাতত্ত্বের দাবি, ভাষাতত্ত্বের কৃতিত্ব ও আবিষ্কার ইত্যাদির কথা বলে প্রবন্ধের শেষে তিনটি ইংরেজি বই থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সে-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিচে পরপর দিলাম। সংকীর্ণ অর্থে ভাষাতাত্ত্বিক না-হয়েও শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অল্পবিস্তর ভাষাজ্ঞান থাকে। কারণ ভাষা কোনো গোষ্ঠীবিশেষের সম্পত্তি নয়, মানুষমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি। ভাষাতত্ত্ব এমন একটা গুপ্তবিদ্যা নয় যে গোটাকতক বিশেষভাবে দীক্ষিত লোক ছাড়া অপরের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমি ভাষাতাত্ত্বিক না-হলেও ভাষাচর্চা বহুকাল যাবৎ করে আসছি এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু যে পড়াশুনা করি নি তাও নয়। সুতরাং আমি মনে করি ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমারও কিছু বলবার অধিকার আছে।

(ক) 'ভাষার কোনো শব্দই অর্থহীন নয়। ... স্থানের নামও ভাষার শব্দ, তাও অর্থহীন নয়। ... তাঁরা (ভাষাতাত্ত্বিকেরা) এ বিষয়ে একমত যে, স্থানের নাম আদৌ অর্থহীন নয়, স্থানের নামকরণ অকারণ নয় (পৃ ৬৩)।'

অনিলবাবু তিনটি ইংরেজি পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথমটিই উপরোক্ত দাবি করেছে। এই বইটি আজ থেকে ১০৬ বছর আগে ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। এত প্রাচীনকালে তাঁকে যেতে হল কেন? হালের কোনো বইয়ে কি একথা নেই? তা থেকে উদ্ধৃতি দিলেন না কেন? অন্য যে-দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাদের মধ্যে তো এমন কথা পেলাম না! তাহলে অনিলবাবু একথা বলেন কী করে যে সকল ভাষাতাত্ত্বিকই এ-বিষয়ে একমত?

খাঁটি বিজ্ঞান ছাড়া প্রত্যেক বিশেষ শাস্ত্রই নিজের সম্বন্ধে অনেককিছু লম্বা-চওড়া দাবি করে থাকে। যজুর্বেদ সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে যজ্ঞের কত মহিমাই না প্রচারিত হয়েছে। সেসব কথা সত্য হলে বলতে হয় যে এমন কোনো জাগতিক ব্যাপার নেই যা যজ্ঞের দ্বারা সম্পন্ন না-হতে পারে। যেসব সংস্কৃত পণ্ডিত বংশ-পরম্পরায় এই শাস্ত্রের চর্চা করে আসছেন তাঁদের অনেকেই যজ্ঞের শক্তিতে সত্যই বিশ্বাস করেন। সেইরকম মন্ত্রও নাকি অনেককিছু করতে পারে বলে দাবি করা হয়। তাই এখনও অনেকে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করেন। তন্ত্রশাস্ত্রেও কত অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধাই-এর কথা বলা হয়ে থাকে। অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাই বলে কি সকলকেই মেনে নিতে হবে? ব্রতকথার মতো, দর্শন, প্রাচীন, মনস্তত্ত্ব, ন্যায় ইত্যাদি শাস্ত্রেরও ফলশ্রুতি আছে। প্রত্যেকে অনেক কিছুই দাবি করে থাকে। কিন্তু দাবি করলেই কি সব দাবি সত্য প্রমাণিত হয়? সামুদ্রিক শাস্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষ অনেককিছু বলতে পারে ব'লে দাবি করি। কিন্তু সত্যই পারে কি? যদি একটা কথা ঠিক হয় তো পাঁচটা ঠিক হয় না। সে পাঁচটা মিথ্যা হলেও মানুষ ভুলে যায়, যে একটি সত্য হয় তাকেই মনে করে রাখে। ভাষাতত্ত্বও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতোই, তার চেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক নয়। সুতরাং ভাষাতত্ত্ব যদি দাবি করে সব নামেরই অর্থ আছে এবং সে-অর্থ বাস্তবসম্মত তাহলে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তা মেনে নিতে পারে না। মানলে নিজের বুদ্ধি ও যুক্তিকে অন্ধ বিশ্বাসের কাছে বলি দিতে হয়।

ভাষাতত্ত্বের দাবি দর্শনশাস্ত্র স্বীকার করে না। নাম জিনিসটা কী তাই নিয়ে দর্শনশাস্ত্রে তিনটি মতবাদ আছে : ১. প্রথমটিকে বলে নামসর্বস্ববাদ (Nominalism), ২. দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ভাববাদ (Conceptualism), ৩. তৃতীয়টির নাম হচ্ছে বাস্তববাদ (Realism)।

Nominalism বলে নাম নামমাত্রই, অর্থাৎ কতকগুলি শব্দের অর্থহীন সমষ্টিমাত্র, তার পিছনে কোনো ভাব (idea) কিংবা বাস্তব কিছু নেই। Conceptualism বলে যে প্রত্যেক নামের পিছনে একটি ভাব বা concept আছে। এই ভাব বাস্তবানুগ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। 'শশশৃঙ্গ' বা 'আকাশ কুসুম' বললে একটা একটা ভাব বা idea বোঝায়। কিন্তু সেই ভাবের পিছনে কোনো বাস্তব সত্য নেই। সুবর্ণগ্রাম ও সুবর্ণগিরি আর দুটি এইরকম উদাহরণ। Realism বলে নামের পিছনে একটা ভাব (idea) তো থাকেই সে-ভাবের পিছনে বাস্তব কিছু থাকে। Realism-এর অলৌকিক ও উদ্ভট একটা মানেও আছে। কিন্তু তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই।

সুতরাং নামমাত্রের পিছনে বাস্তব কিছু আছে, এটা কতকগুলি নাম সম্বন্ধে সত্য, সব নাম সম্বন্ধে নয়। কতকগুলি নাম অবাস্তব ভাব প্রকাশ করতে পারে। আবার কতকগুলি নাম একেবারেই নিরর্থক, কতকগুলি শব্দের সমষ্টিমাত্র।

এই কারণেই শ্রীঅনিল কাঞ্জিলাল এবং তাঁর দেওয়া প্রথম ইংরেজি উদ্ধৃতিটির লেখক প্রত্যেক নাম সম্বন্ধে যা লম্বা দাবি করেছেন তা আমি মানতে পারি না। এবং এই কারণেই আমি ভাষাতত্ত্বকে ফলিত জ্যোতিষের সঙ্গে তুলনা করেছি। ফলিত জ্যোতিষের যেমন কোনো কোনো গণনা সত্য হতে পারে কিন্তু সব গণনা নয়, তেমনি ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্থানের নাম সেই সেই স্থানের বাস্তব বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপের নির্দেশ দিতে পারে, কিন্তু সব নাম পারে না। তাই যদি হয় তাহলে ভাষাতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র বলা চলে না। বিজ্ঞান ঘটনাসমূহের মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করে। এই সম্বন্ধ যে-শাস্ত্রে স্থাপন করা যায় না তা বিজ্ঞানই নয়। ভাষাতত্ত্ব, নাম ও সেই নামের অর্থ (অবশ্য যেখানে অর্থ করা যায়) দ্বারা ব্যক্ত বাস্তবের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পারে না বা এখনও পর্যন্ত পারে নি। তাই ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানপদবাচ্য হতে পারে না। যদি সে নিজেকে বিজ্ঞান বলে দাবি করে তাহলে বলতে হয় সে ভ্রান্তবিজ্ঞান (Pseudo Science)। একটি উদাহরণেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে 'কলিকাতা' নাম। যেখানে কলিচুন তৈরি হয় সে-জায়গার নাম যেমন কলিকাতা হতে পারে, যেখানে হয় না সে-জায়গার নামও হতে পারে, যেমন ভোগদিয়া কলিকাতা। এখানে কলিচুনের সঙ্গে কলিকাতা নামের কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। আর একটি উদাহরণ অনিলবাবু নিজেই দিয়েছেন — নৈহাটি নাম। নৈ বা নই শব্দের অনিলবাবু মানে করেছেন নদী। 'নই' শব্দের আর-একটি মানেও আছে, সেটি হচ্ছে নূতন। সুতরাং নৈহাটি মানে 'নদীর কূলে হাট' এবং 'নূতন হাট' দুই-ই হতে পারে। যে মানেই ধরা যাক না কেন, নৈহাটির সঙ্গে নৈহাটি নামক স্থানের কার্য-কারণ বা অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা দেশে আর-একটি নৈহাটি গ্রাম আছে — বর্ধমান জেলার কাটোয়ার উত্তরে।

(খ) 'ভাষাতাত্ত্বিকেরা অসংখ্য স্থানের নামের অর্থ নির্ণয় করেছেন। ... অনেক স্থানের নামের অর্থ জানা যায় নি।' (পৃ. ৬৩)

নির্ণীত ও অনির্ণীত অর্থের মধ্যে আনুপাতিক হার জানতে পারলে আমরা লাভবান হতাম। এই পরিসংখ্যানগত গবেষণা যদি কেউ করেন তিনি আমাদের প্রভূত উপকার করবেন।

(গ) 'স্থানের নামের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে এমন অনেক তথ্য জানা গিয়েছে যা লিখিত ইতিহাসে বা সাহিত্যে লিপিবদ্ধ নেই।' (পৃ. ঐ)।

এরকম সাধারণ উক্তি না-করে অনিলবাবু যদি গোটাকতক উদাহরণ দিতেন, বিশেষ করে, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে, তাহলে আমরা জিনিসটা বুঝতেও পারতাম, লাভবানও হতাম। শুধু ফাঁকা আওয়াজে চিঁড়ে ভেজে না। তাছাড়া ইতিহাস বা সাহিত্যে না-থাকলে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার তথ্যের যাচাই হবে কী দিয়ে? যাচাই না-করেই সেই তথ্যগুলিকে আমাদের মেনে নিতে হবে? অনিলবাবু যে তৃতীয় ইংরেজি উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন তাতে আছে : 'Place-names supply in full measure linguistic informantion of a kind that is absent in archaeology and *usually ignored or blurred in historical record'*–; এখানে 'absent in historical record' একথা নেই। তাছাড়া সাধারণ বা অনৈতিহাসিক সাহিত্যের উল্লেখমাত্র নেই। তারপরেই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে : 'By their nature the only direct information they (place-names) can supply is linguistic informantion. It is true that they may be used to provide information of a non-linguistic character, information that is often of very considerable interest to the historian, *but this can only be by implication or assumption, never by direct inference.*

৬. অনিলবাবু ভুল বুঝেছেন। আমি ভাষাতত্ত্বের কিছু জানি না বলে সুনীতিবাবু তাঁর কৈফিয়ৎ-এ সংক্ষেপে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন তা বুঝতে না পেরেই সুনীতিবাবুর উক্তিকে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত বলে হেলাভরে উপেক্ষা করেছি — এটা ঠিক নয়। বুঝেই বলেছি। শ্রীকাঞ্জিলালের মনে থাকতে পারে সুনীতিবাবুর 'কৈফিয়ৎ'-এর অনেক আগে তিনি তাঁর বাড়িতে সুনীতিবাবুর নামতত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত আমাকে শুনিয়েছিলেন। তখনও আমি তাঁর কথায় আমল দিই নি। তাঁর বক্তব্য শুনে গিয়েছিলাম মাত্র। আর (৫ : দর্পণ)-তে দেখিয়ে দিয়েছি যে তিনজনের মধ্যে মাত্র একজন লেখক ঐ রকম দাবি করেছেন, বাকি দু-জন করেন নি। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের মত ছাড়া সকল ভাষাতাত্ত্বিকের সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতে আগেও পারি নি, এখনও পারি না। আমাকে ভুল বোঝাই অনিলবাবুর এই আলোচ্য প্রবন্ধের কারণ তাতে সন্দেহ নেই।

৭. 'স্থানের নামের ব্যুৎপত্তি ... ভাষাতাত্ত্বিকদের একটা বড় কাজ।' (পৃ ৬৪)

এই দীর্ঘ অনুচ্ছেদে অনিলবাবু যা বলেছেন তা আমি মানতে অক্ষম। এটি অনিলবাবুর নিজের মত এবং এ-মতের কোনো মূল্য আছে বলে মনে করি না। তিনি নিজে একজন নামকরা ভাষাতাত্ত্বিক হলেও বরং অন্য কথা ছিল। তিনি তা নন। সুতরাং সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিকদের মুখপাত্র হয়ে একথা বলার তাঁর অধিকার আছে একথা স্বীকার করি না। তিনি জনকতক নামকরা দায়িত্বশীল ভাষাতাত্ত্বিকের লেখা থেকে যদি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতেন যে তাঁদেরও এই মত তাহলে নয় কথা ছিল। তিনি তা করেন নি। সুতরাং তাঁর কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

(ক) 'যদি এ রকম কোনো প্রয়াস (প্রমাণ?) না-মেলে লিখিত ইতিহাসে বা সাহিত্যে, যদি historical possibility-ও অনুমান করা না-চলে, তাহলে প্রশ্নটি আপাতত অমীমাংসিত
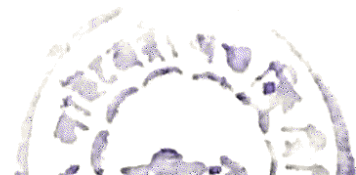
থেকে যায়, কিন্তু অন্য সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি না-জানা পর্যন্ত আগের ব্যুৎপত্তি তখনই অগ্রাহ্য হতে পারে না, যদি তা ভাষাতত্ত্বানুমোদিত হয়।' (পৃ. ঐ)

কোনো সত্যসন্ধানী, এমনকী কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই, একথা মানতে পারেন না। কোনো শাস্ত্রই নিজে উদ্দেশ্য হতে পারে না, সব শাস্ত্রই উপায়। সকলেরই উদ্দেশ্য — সত্য। সত্য আবিষ্কার। সত্যের উপরে কোনো শাস্ত্রই নয় — ভাষাতত্ত্বও নয়। ভাষার বাইরে স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক প্রমাণ দ্বারা যদি কোনো ব্যুৎপত্তি না-টেঁকে, তাহলে তখনই তাকে বিদায় করা কর্তব্য। অন্য ব্যুৎপত্তির অপেক্ষায় তার মুহূর্তমাত্র টিঁকে থাকবার অধিকার নেই, থাকতে পারে না। সে-অধিকার স্বীকার করলে সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। এমন অযৌক্তিক কথা কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বলতে পারেন — এ আমি বিশ্বাস করি না। আর দেখছিও যে আমার বিশ্বাস সত্য। অনিলবাবুর দেওয়া প্রথম ইংরেজি উদ্ধৃতিটির শেষ অনুচ্ছেদে বরং অনিলবাবুর বিরুদ্ধ কথাই বলা হয়েছে : '*No interpretation of a name can be admitted, however seemingly appropriate, until we have first satisfied ourselves of the historical possibiltiy 'not to say probability, of the proposed etymology.'* — এই তো খাঁটি সত্যানুরাগীর কথা। আমি বরাবর বলে এসেছি কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি একটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্ন নয়, ঐতিহাসিক প্রশ্ন। সুনীতিবাবু শুধু ভাষার গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন, তার বাইরে গিয়ে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতক কেন, এমনকী ইংরেজ আমলেও কলিকাতা গ্রামে শামুক-পোড়ানো চুন তৈরির ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে পর্যন্ত বিচার করে দেখেন নি। সুতরাং কলিকাতা নামের তাঁর দেওয়া 'interpretation' যতই 'seemingly appropriate' হোক না কেন, admitted হতে পারে না।

ভাষাতত্ত্বের প্রয়োগ দাবা পাশা বা ফুটবল ক্রিকেটের মতো ভদ্রলোকের একটা খেলা নয় যে উভয় পক্ষকে খেলার নিয়ম বা convention মেনে চলতে হবে।

৮. 'কলিকাতা একটি স্থানের নাম ... 'থিয়োরি' হাজির করে নি। (ফুটনোট সমেত)।' (পৃ ৬৪-৬৫)

(ক) ইংরেজরা যদি 'কলিকাতা' শব্দটি — এদেশের লোকের কাছ থেকে পেয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই 'কলিকাতা' এইরূপে পায় নি, পেয়েছে Kalkata, Kulkuta বা Kulkutta-রূপে, যার বাংলা রূপ 'কল্‌কাতা'। ব্লখম্যান সাহেব KLKT (যদি এইটিকেই শুদ্ধ পাঠ বলে নেওয়া যায়)-কে Kalkata লিখেছেন, Kalikata লেখেন নি। কোনো ফারসি ভাষাভাষীই বাঙালিদের মতো 'কলিকাতা' শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন না। 'কলি' শব্দের সঙ্গে এদেশের মুসলমানগণ খুবই পরিচিত, কারণ ঐটি আরবি শব্দ। সুতরাং যদি শব্দটি 'কলিকাতা' হতো তাহলে Qualikata রূপে শব্দটি লেখা হতো, কিন্তু তা যখন লেখা হয় নি তখন আমরা বাঙালিরা যে-নামটিকে এতদিন সংস্কৃতরূপে 'কলিকাতা' বলে উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি, সেই নামের প্রথম অর্ধেকটা 'কলি' শব্দ নয় 'কল্‌' শব্দ। সেই Kalkata বা Kulkutta শব্দটিকেই ইংরেজরা Calcutta করেছে, বাংলা 'কলিকাতা'কে নয়।

(খ) যদুনাথ সরকার মশায়ের মত অত উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তিনি শুধু বড় ফারসি পণ্ডিতই ছিলেন না, বর্তমান সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঐতিহাসিকও ছিলেন। সুতরাং তিনি যখন বলেছেন, 'Calcutta is unlikely' তখন তিনি শুধু ফারসি পণ্ডিত হিসেবেই একথা

বলেন নি, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি থেকে 'historical possibility' বিচার করেই বলেছেন। তিনি এইদিক থেকে বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ষোড়শ শতকের শেষভাগে কলিকাতার বা কলিকাতা নামের অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না।

অধিকাংশ ফারসি জানা পণ্ডিত 'কলিকাতা' পাঠ মেনে নিয়েছেন — বলেছেন অনিলবাবু। কারা তাঁরা? দু-চারজনের নাম তো তিনি করতে পারতেন। তা করেন নি। আর যদি তাঁরা 'কলিকাতা' পাঠ মেনে নিয়েই থাকেন তাহলে ফারসি পণ্ডিত অর্থাৎ ভাষাপণ্ডিত হিসেবেই তা করেছেন। তাঁরা যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিক নন, বা তাঁর মতো ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিষয়টি বিচার করে দেখেন নি।

(গ) অনিলবাবু যেহেতু যদুনাথের মত মানেন না সেই হেতু স্থানটিকে 'কলিকাতা' নামেই অভিহিত করে চলেছেন। তাঁর মতে 'কলিকাতা', পরগনার নাম, কি মৌজার নাম কি গ্রামের নাম তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। আইন-ই-আকবরীতে 'কলিকাতা' নাম আছে আমি জানি না। তবুও তর্কের খাতিরে এ নাম মেনে নিয়ে বলছি যে ঐ পুস্তকে কলিকাতা, পরগনা, মৌজা বা গ্রাম কারুরই নাম নয় — একটি মহলের নাম। আর তা যদি হয় তাহলে সুনীতিবাবুর গোড়ায় ভুল হয়ে গেছে। কলিকাতা নামক গ্রামের নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে চেষ্টা না-করে তাঁর কলিকাতা মহলের নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা উচিত ছিল। তাহলে তাঁকে প্রমাণ করতে হতো যে সারা কলিকাতা মহল জুড়ে শামুক-পোড়া কলিচুন তৈরি হতো। কিন্তু তা তিনি করতে পারতেন না, যেহেতু মহল কলিকাতায় চুনাগলি চুনাপুকুর ও চুনারিটোলা পেতেন না, তাছাড়া রসপুর কলিকাতারও সাহায্য পেতেন না। বড় মুশকিলে পড়ে যেতেন।

(ঘ) 'নামটি যারা দিয়েছে তারা শব্দটির অর্থ বুঝেই দিয়েছে, আর অকারণে দেয় নি, স্থানটির কোনো একটা পরিচয়-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেই দিয়েছে।' (পৃ ৬৫)

অনিলবাবু কি বলতে চান মাত্র একটি লোক বা জনকতক লোক মিলে পরামর্শ করে এই নাম দিয়েছে? এইরকম করে স্থানের বা দেশের নাম দেওয়া হয় তার তো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমার তো ধারণা ছিল, যে-পদ্ধতিতে লোকসাহিত্য, লোকগাথা, রূপকথা ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে, সেই পদ্ধতিতেই স্থানের নামকরণ হয়। এটি লোকমানসের বা গণমানসের কাজ।

দ্বিতীয়ত, কোনো প্রদেশ ভূখণ্ড বা জনপদের আদিতে নাম হয় সেই ভৌগোলিক খণ্ডের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি দেখে নয়, সেই প্রদেশে বসবাসকারী জাতি বা উপজাতিদের নামে, যেমন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মদ্র, পঞ্চাল, কুরু, সৌবীর, কোশল, কাম্পিল্য, মিথিলা, ওড্র, গুর্জর, মালব, চেল, চের (কেরল), পাণ্ড্য, ভিলওয়াড়া, গণ্ডওয়ানা, কাটিয়াবার, কোচবিহার, নাগাভূমি, খাসিয়া পাহাড়, গারো পাহাড়, মগের মুলুক, বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ড, রোহিলখণ্ড, রাজস্থান, হিন্দুস্থান, আফগানিস্থান, তুর্কীস্থান, সিস্থান বা চিস্থান (শকস্থান), মল্লভূম, ধলভূম, গোপভূম ইত্যাদি। এখানে তো অধিবাসী থেকে স্থানের নাম হয়েছে, স্থানের প্রাকৃতিক বা অন্যরকম বৈশিষ্ট্য দেখে বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে কারণ খুঁজে বার করে একটা নামও দেওয়া হয় নি।

৯. এরপর অনিলবাবু সুনীতিবাবুর আসল বিষয়ে হাত দিয়েছেন, অর্থাৎ সুনীতিবাবুর নির্ণীত কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করে বলেছেন যে সে-ব্যুৎপত্তি ঠিকই হয়েছে। তাঁর

বক্তব্যের যথাযথ উত্তর দিতে হলে আবার পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে হয়, যেটা আমি করতে চাই না, অথচ না-করে উপায় নেই।

(ক) সংক্ষেপে অনিলবাবুর বক্তব্য — 'কলি' ও 'কাতা' এ দুটি শব্দ। 'কলি' মানে কলিচুন ও 'কাতা' মানে শামুকের খোলা। সুতরাং এই দুটি সার্থক শব্দযোগে গঠিত 'কলিকাতা' শব্দও সার্থক। তাহলে 'কলিকাতা' শব্দের মানে দাঁড়ায় 'কলি বা কলিচুনের জন্য কাতা বা শামুকের খোলা' কিংবা 'কলি ও চুন'।

কলি বা কলিচুন তো বাংলায় সর্বত্র সর্বজন বিদিত। কিন্তু কাতা? কাতা সম্বন্ধে কি এই কথা বলা যায়? অনিলবাবু লিখেছেন : 'বাংলার অঞ্চলবিশেষে লোকমুখে কাতা আর শামুককাতা প্রয়োগসিদ্ধ, ছেলেবেলাতে আমরাও শুনেছি। শামুকের খোল অর্থে "কাতা" বা "শামুক-কাতা" আর "শামুকের খোল পোড়ানো চুন" অর্থে "কাতা-চুন" লোকমুখে আমরা শুনেছি।' (পৃ. ঐ)

সুনীতিবাবু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন : ' "কাতা" শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি। ... উত্তরবঙ্গে রাজশাহী জিলায়, শামুক পোড়াইয়া, তাহাতে জল দিয়া চুনে রূপান্তরিত করিবার পূর্বে, পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে "কাতা" বলে।'

অনিলবাবু অঞ্চলবিশেষে বলেই ছেড়ে দিয়েছেন — উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ কোন্ অঞ্চলে 'কাতা' শব্দ প্রচলিত ছিল বা আছে বলেন নি। যদি সে-অঞ্চল পূর্ব বা উত্তরবঙ্গ হয়, তাহলে সেখানকার 'কাতা' শব্দ কলকাতার লোকের জানবার কথা নয়। রাজশাহী জেলায় প্রচলিত 'কাতা' শব্দ সম্বন্ধে সেই একই কথা। তাহলে ঐ অঞ্চলে প্রচলিত 'কাতা'-শব্দ যোগে 'কলিকাতা' নাম গঠিত হয় নি। তবে 'কাতা' শব্দ চুন অর্থে কলকাতা অঞ্চলে পূর্বে ব্যবহৃত হতো একথা সুনীতিবাবু প্রাচীনদের মুখে শুনেছেন বলেছেন। তাহলে এই কাতা শব্দ দিয়েই কলিকাতা নামটি গঠিত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে 'কলিকাতা' শব্দের মানে দাঁড়ায় 'কলি বা চুন' বা 'কলিচুন ও চুন'। কলিকাতা শব্দের এই দুটি অর্থের মধ্যে এই অর্থটিও অনিলবাবু দিয়েছেন। এই অর্থের বিরুদ্ধে একটি বড় আপত্তি এই যে 'কলি' ও 'কাতা' দুটি সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়, ইংরেজিতে যাকে বলে tautology ; এক্ষেত্রে ;'কাতা'কে 'কলি'র মতো একটি স্বতন্ত্র সার্থক শব্দ বলা চলে না। বস্তুত 'কাতা' শব্দের কোনো সর্ববাদীসম্মত সুস্পষ্ট অর্থ নেই। তাই সুনীতিবাবু তাঁর প্রবন্ধে কাতা শব্দের সাতটি মানে করেছেন, যথা, ১ শামুকের আড়ত, ২ চুনের কারখানা, ৩ শামুক-পোড়া, ৪ চুন, ৫ পোড়ানো শামুক, ৬ নারিকেল দড়ি, ৭ আড়ত। আবার তাঁর 'কৈফিয়ৎ'-এ সুনীতিবাবু 'কাতা' শব্দের আর-এক মানে করেছেন—'শামুক বা গুগলির খোলার আগুনে-পোড়ানো স্তূপ বা সমষ্টি'। অনিলবাবুও এই শব্দের আর এক মানে আবিষ্কার করেছেন। আর একজন মানে করেছেন 'গঞ্জ'। কাতা শব্দের এত রকম মানে করতে হয়েছে এইজন্য যে এই শব্দটি সুনীতিবাবুর ও অনিলবাবুর কথামতো বাংলার একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে মাত্র প্রচলিত ছিল এবং বহুকাল থেকেই অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

'কাতা' শব্দের যদি এই হাল হয়ে থাকে, 'কলিকাতা' শব্দের হাল তার থেকে কোনো অংশে ভালো নয়। অনিলবাবু কলিকাতার দুটি মানে করেছেন, তা আগেই উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু সুনীতিবাবু মানে করেছেন তিনটি : ১ কলি বা কলি চুনের জন্য কাতা বা শামুক পোড়া; ২ কলির বা চুনের ও কলি চুনের জন্য শামুকের আড়ত এবং চুনের কারখানা ;

৩ জোঙ্গড়া চুন, শামুক-পোড়া কলিচুনের ও অন্য চুনের কাজের জন্য 'কলি-কাতা' বা কলিচুন এবং কাতা চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত।

এগুলি কি 'কলিকাতা' শব্দের সরল প্রাঞ্জল মানে হল? একথা স্বীকার করতে কারোই আপত্তি হওয়া উচিত নয় যে 'কলি' শব্দের মতো 'কাতা' শব্দ সর্বজনবোধ্য, সর্বজনগ্রাহ্য সার্থক শব্দ নয়। সুতরাং একটি সার্থক শব্দ 'কলি' এবং একটি অসার্থক ও অপ্রচলিত শব্দ 'কাতা'র যোগে গঠিত 'কলিকাতা' শব্দ নিছক ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অসার্থক।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে আরও একটি কথা বিচার্য। সুনীতিবাবু ও অনিলবাবু দুজনেই তো 'কাতা' শব্দের মানে করেছেন শামুকের খোলা এবং কাতাচুন বা কলিচুনের মানে করেছেন শামুকের খোলা পোড়ানো চুন। কিন্তু কলিচুন তো শুধু শামুকেরই খোলা পুড়িয়ে তৈরি হয় না, ঝিনুক গুগলি ও গেঁড়ির খোলা পুড়িয়েও হয়। কেউ জোর করে বলতে পারেন না যে কলকাতায় শুধু শামুকেরই খোলা পুড়িয়ে কলিচুন তৈরি হতো, ঝিনুক গুগলি ও গেঁড়ির খোলা পুড়িয়ে হতো না। তাহলে 'কাতা' শব্দে কি ঝিনুক গুগলি ও গেঁড়ির খোলাকেও বোঝাবে? সেকথা কিন্তু সুনীতিবাবু কিংবা অনিলবাবু কেউ বলেন নি। তাহলে 'কলিকাতা' নাম 'কলি' ও 'কাতা' শব্দ যোগ করে গঠিত হয়েছে একথা বলা কি ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে ঠিক হবে?

এ সম্বন্ধে আমার শেষ কথা এই। সুনীতিবাবু তাঁর 'কৈফিয়ৎ'-এ লিখেছেন : 'শামুক-পোড়া চূন অর্থে 'কাতা-চূন' বাঙ্গালাদেশের বহু স্থলে এখনও প্রচলিত।' একথা কি সত্য? অভিধান দেখা যাক। ১ সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানে 'কাতা' শব্দের মানে দেওয়া আছে : (ক) সরু দড়ি, সূতা, নারিকেল দড়ি ; (খ) কর্ত্তা। ২ সংসদ বাঙলা অভিধানে : নারিকেল ছোবড়ার দড়ি। ৩. চলন্তিকা অভিধানে : নারিকেল ছোবড়ার দড়ি। ৪ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে : (ক) সূতা, দড়ী, নারিকেল ছোপার দড়ী ; (খ) কর্ত্তা ; (গ) কাঁচি, ক্ষুর ইত্যাদি ক্ষৌরাস্ত্র রাখিবার চর্মাধার, ভাঁড় ; (ঘ) কস্থা শব্দের প্রাদেশিক উচ্চারণ। ৫ প্রকৃতিবাদ অভিধানে : নারিকেল ছোপার দড়ী। ৬ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' : (ক) কর্ত্তা ; (খ) ছুরী, দা; (গ) ক্ষুর; (ঘ) কাটা সূতা বা দড়ি, নারিকেলের ছোপড়ার আঁশ হইতে কাটা দড়ি, নারিকেল দড়ি। ৭ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাঙলা শব্দকোষে' : (ক) নারিকেল ছোবাড় দড়ী; (খ) কাঁচী হতে খুর, নরুণ রাখিবার নাপিতের চামড়ার আধার। অধুনা ভাঁড় শব্দ চলিত হইয়াছে।

সাতটি অভিধানের একটিতেও সুনীতিবাবুর দেওয়া 'কাতা' শব্দের শামুক-পোড়া চুন, শামুকের খোলা ইত্যাদি অর্থের বিন্দুবাষ্প নেই। কোনো অভিধানকারীই কাতা শব্দের ঐ অর্থ জানেন না। এঁদের মধ্যে রাজশেখর বসু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এই তিনজন অতি প্রাচীন লোক ছিলেন। এঁদের কেউ কখনও 'কাতা' শব্দের ঐ মানে শোনেন নি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজশাহী জেলার লোক কিনা জানি না। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি অনেকদিন রাজশাহী জেলাতে ছিলেন। তিনিও 'কাতা' শব্দ শোনেন নি।

তাহলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হল যে কলিকাতার 'কাতা' শব্দ সুনীতিবাবুর অর্থে অসার্থক। সুতরাং একটি সার্থক ও একটি অসার্থক শব্দ-যোগে নিষ্পন্ন কলিকাতা শব্দ ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে একেবারেই অসার্থক। এই নামের একমাত্র সার্থক মানে হতে পারে কলিচুন ও নারিকেল দড়ি। সুনীতিবাবু নিজে লিখেছেন : ... 'কলি-চূন ও নারিকেল-দড়ি, এই দুই জিনিসের নাম হইতে "কলিকাতা" নামের উদ্ভব, এরূপ ব্যাখ্যা যদি কেহ করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া

বলিবার কিছু নাই।' শামুক চুনের জন্য আপ্রাণ লড়াই করে যদি হঠাৎ এক কথায় তা ছেড়ে দেন, তাহলে যদি লোকে এই ধারণা করে যে তাঁর সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট নিজস্ব কোনো মত নেই বা মতিস্থির নেই, যেমন-তেমন করে কলিকাতা নামের একটা মানে দাঁড় করাতে চান, তাহলে কি খুব অন্যায় হবে? আর শেষ পর্যন্ত যদি 'কাতা' শব্দের যেটি সর্বজনগ্রাহ্য ও সুবিদিত অর্থ সেইটিই নিলেন, তো প্রথম থেকে তা নিলেই তো ভাল ছিল। তাহলে শামুক-পোড়া চুনের পিছনে তাঁকে পণ্ডশ্রম করতে হতো না — কলিকাতা নামেরও একটি সরল ও সার্থক অর্থ পাওয়া যেত। কিন্তু তা করলেও কলিকাতা গ্রামে যে কলিচুন তৈরি হতো তার প্রমাণ তাঁকে দিতেই হতো। তার থেকে তিনি রেহাই পেতেন না।

১০. এরপর অনিলবাবু বলেছেন যে কলিকাতা শব্দ থেকে 'আর কলিকাতায় চুন-সম্পৃক্ত কয়েকটি স্থানের নাম পেয়ে সুনীতিবাবু অনুমান করেছেন, কলিকাতায় এককালে শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হতো'। (পৃ ৫৬-৬৬)। তারপর লিখেছেন : 'এই অনুমানের পরিপোষক কোনো সাক্ষ্য লিখিত ইতিহাসে বা সাহিত্যে মেলে কি? না, আজো পর্যন্ত মেলে নি।' (পৃ, ৬৬)। পুঁথিপত্রে এমন কোনো প্রমাণ না-পেয়ে সুনীতিবাবু জানতে চেষ্টা করেন অন্য সূত্র থেকে কোনো কথা পাওয়া যায় কিনা। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন বাংলা দেশে কলিকাতা নামে আরও দুটি স্থান আছে ইত্যাদি।

(ক) এখানে স্পষ্ট স্বীকার করা হয়েছে যে আজ পর্যন্ত পুঁথিপত্রে কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে কলিকাতা গ্রামে শামুক পুড়িয়ে চুন তৈরি হতো। এই স্বীকৃতিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই প্রমাণের অভাবে সুনীতিবাবুর অনুমান অনুমানই থেকে যায়। প্রমাণিত সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না। একথা সুনীতিবাবু নিজেই ভালোরকম করে বুঝিয়েছিলেন। তাই ভাষার বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র বাস্তব প্রমাণের খোঁজ করেছিলেন। তবে তিনি যে-প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন তা কতখানি কার্যকর হয়েছে সেকথা স্বতন্ত্র।

আর-একটি কারণে সুনীতিবাবুর কলকাতা নামের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ভাষাতত্ত্বের প্রধান শর্তটিকেই লঙ্ঘন করেছেন। অর্থাৎ তিনি কলিকাতা গ্রামের অত আগে কলিচুন তৈরির সম্ভাবনাকে (historical possibility) বিবেচনা করে দেখেন নি। আমি আমার প্রবন্ধে এই কথা লিখেছিলাম : '১৪৯৫ সাল থেকে ১৬৯০ সাল পর্যন্ত এই দুশো বছরের মধ্যে কলকাতায় যে পরিমাণ কলিচুন তৈরি হয়েছে তা কী কাজে লেগেছে? ক-টা পাকাবাড়ির দেওয়াল চুনকাম করা হয়েছে? ঐ সময়ে কলকাতা ও আশেপাশের গ্রামের ক-টা পাকাবাড়ি ছিল?' আমার এ প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত কেউ দেন নি — না সুনীতিবাবু, না শ্রীতারাপদ সাঁতরা, না শ্রীঅনিল কাঞ্জিলাল।

দ্বিতীয় আর-একটি সম্ভাবনাকে সুনীতিবাবু বিবেচনা করে দেখেন নি। কলিকাতা গ্রামের পাশেই ছিল (এখনও আছে) ধাপা ও লবণ হ্রদ ও সুন্দরবন। সেখানে অফুরন্ত বড় বড় শামুক ও ঝিনুক পাওয়া যেত, এখনও যায় এবং সেই ঝিনুক ও শামুক দিয়ে বেলেঘাটায়, দরকার হলে, এখনও কলিচুন তৈরি হয়। একথা আমি আমার জবাবে বলেছি। কলকাতার এত কাছে যখন দরকার হলে প্রচুর কলিচুন পাওয়া যেতে পারত তখন কলকাতা গ্রামের লোকেরা কষ্ট করে কলিচুন তৈরি করতে যাবে কেন? বিশেষত যখন কলকাতার পুকুরে ছোট ছোট গুগলি ও গেঁড়িই পাওয়া যায় — বড় দূরের কথা, ছোট শামুক ও ঝিনুক অত্যন্ত কম!

(খ) অনিলবাবু লিখেছেন যে কলকাতায় চুন-সম্পৃক্ত কয়েকটি স্থানের নাম দেখে সুনীতি-বাবুর ধারণা দৃঢ় হয় যে কলকাতায় শামুক-পোড়ানো কলিচুন তৈরি হতো। আমি বলি কলকাতার রাস্তার বা পাড়ার ঐ নামগুলি সুনীতিবাবুর অনুমানের সহায় মাত্র নয় — আভ্যন্তরীণ প্রমাণও। যদি তিনি নিঃসন্দেহে দেখাতে পারতেন যে ঐসব জায়গায় ঐ রকম চুন তৈরি হতো, তাহলে তাঁর অনুমান ও ঐ অনুমান-ভিত্তিক কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে যেত — তাঁকে কলকাতার বাইরে রসপুর বা ভোগদিয়ায় যেতে হতো না। জায়গাগুলি নাম হচ্ছে — ১. চুনাগলি, ২. চুনাপুকুর ও ৩. চুনারিটোলা। আমি ঐ তিনটি নামের এইরকম ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম : ১ যে-গলিতে চুনো-ফিরিঙ্গিরা বাস করে তা চুনোগলি ; ২ যে-পুকুরে চুনো মাছ পাওয়া যায় তা চুনোপুকুর আর ৩ যে-পাড়ায় চুনুরিয়া (যারা কাপড় ছোপায় তারা) থাকে তা চুন্‌রিটোলা। সুনীতিবাবু চুনারিটোলাকে চুনারিতলা লিখেছিলেন। চুনারিতলার কোনো মানে হয় না। পরে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। আমার দেওয়া চুনাগলির ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সুনীতিবাবু বা শ্রীতারাপদ সাঁতরা দুজনের কেউই আপত্তি তোলেন নি। চুনাপুকুরের কোনো সংগত মানে সুনীতিবাবু দেন নি। তারাপদবাবু একটা মানে দিয়েছিলেন — চুনারিদের পুকুর। আমি প্রমাণ করেছি, তা হতে পারে না। বাকি রইল চুনারিটোলা। সুনীতিবাবু তাঁর 'কৈফিয়ৎ'-এ আমার ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন : '**চুনারী**' শব্দের যে-ব্যাখ্যা মিত্র-মহাশয় করিয়াছেন, ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব উভয় দিক হইতেই তাহা একেবারেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি না।' এর উত্তরে আমি বলেছিলাম : '**চুনারি** শব্দটির চল্‌তি রূপ **চুনুরি**। আমার মনে হয় না চুন্‌রি ও চুনুরির মধ্যে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে।' পরে আমি প্রমাণ পাই ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব দুয়েরই দিক থেকে শব্দ দুটির মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। সেই প্রমাণটি এখানে দিচ্ছি। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ'-এ সাধুচরণ মৃত্যুশয্যায় শায়িতা কন্যা ক্ষেত্রমণিকে বলছেন : 'জননী আমার, দরিদ্রের রতনমণি, মা ... তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না মা (দীনবন্ধু রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, পৃ ৪১)।' এখানে দ্রষ্টব্য যে 'নীলদর্পণ' লেখার সময় পর্যন্ত বাংলা দেশের মেয়েদের মধ্যে চুন্‌রি শাড়ির প্রচলন ছিল এবং চুন্‌রি শাড়িকে চুনুরি শাড়ি বলা হতো। এই সাক্ষ্যপ্রমাণে চুনারিটোলার আমি-যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম সেই ব্যাখ্যা গ্রহণে কোনো দিক থেকেই আর কোনো বাধাই রইল না।

কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি আমি স্বীকারও করি যে ঐ সব ক'টি নামের আমার ব্যাখ্যা ভুল, তাহলেও কিন্তু সুনীতিবাবুর কোনো সুবিধা হয় না। চুনাপুকুরের চুন দিয়ে কোনো মানেই হয় না। চুনারিটোলার মানে যদি হয় যারা চুন তৈরি করে বা বিক্রি করে তাদের টোলা, আর চুনাগলির মানে যদি হয় যে গলিতে চুন তৈরি হয় বা বিক্রি হয় সেই গলি, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে 'চুন' শব্দে শুধু কলিচুনই বোঝাবে কেন? পাথুরে চুন ও ঘুটিং চুনও তো বোঝায়। অতএব, 'চুন' তৈরি হয় বা বিক্রি হয় সেই গলি, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে 'চুন' শব্দে শুধু কলিচুনই বোঝাবে কেন? পাথুরে চুন ও ঘুটিং চুনও তো বোঝায়। অতএব, 'চুন' শব্দ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় না যে ঐ কয়টি জায়গায় কলিচুন তৈরি বা বিক্রি হতো। তাছাড়া আমি কলকাতার বিভিন্ন নকশার সাহায্যে প্রমাণ করেছি যে ঐ জায়গাগুলির নাম কলকাতায় ইংরেজ

আসবার অনেক পরে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে, হয়েছে। সুতরাং কলিকাতা নামের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হিসাবে ঐ নামগুলি অকেজো হয়ে গেল।

(গ) এইবার বাহ্যিক প্রমাণ দেখা যাক। বাহ্যিক প্রমাণ দুটি — রসপুর কলিকাতা ও ভোগদিয়া কলিকাতা। ১৯৩৭ সালে আমতা থানার দারোগাবাবু সুনীতিবাবুকে জানান যে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য শামুকচুন রসপুর কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। এই থেকেই সুনীতিবাবু ধরে নিলেন যে কলিচুন তৈরি হওয়ার দরুণই ঐ গ্রামের নাম কলিকাতা হয়েছে। এক্ষেত্রেও তিনি ঐতিহাসিক সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখেন নি। দারোগবাবুকে জিজ্ঞাসা করেই হোক বা অন্যসূত্র থেকেই হোক তাঁর প্রথম কর্তব্য ছিল দুটি বিষয় সঠিকভাবে জানা : ১ কলিকাতা গ্রাম কত প্রাচীন, অর্থাৎ কবে থেকে ঐ গ্রামের নাম কলিকাতা হয়েছে, ২ কলিচুন ঐ গ্রামে কোন সময় থেকে তৈরি হয়ে আসছে। কারণ কলিকাতা নাম হবার পরে যদি কলিচুন তৈরি হওয়া আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে প্রমাণ হয় কলিচুন তৈরির সঙ্গে কলিকাতা নামের কোনো সম্বন্ধ নেই। শ্রীতারাপদ সাঁতরা শিবায়ন-কাব্যের ভূমিকার প্রমাণে জানিয়েছেন যে ১৬৮৪ সালে ঐ কলিকাতা গ্রামের নাম পাওয়া যায়। এই কথা সত্য হলে সুনীতিবাবুর অনুসন্ধান করে লিখিত দলিলের প্রমাণে জানা উচিত ছিল কোন সাল থেকে ঐ গ্রামে শামুকচুন তৈরির সন্ধান পাওয়া যায়। যদি তিনি এই অনুসন্ধান করতেন তবেই তাঁর গবেষণা বৈজ্ঞানিক হতো। তখন তিনি দেখতেন যে কলিচুনের ব্যবসা ঐ গ্রামে অনেক অনেক পরে আরম্ভ হয়েছে। কারণ ১৬৮৪ সালে একটি পাকা বাড়িও ঐ পল্লী অঞ্চলে থাকা সম্ভব ছিল না। অনেক পাকা বাড়ি তৈরি হবার পর কিংবা সঙ্গে সঙ্গেই কলিচুনের চাহিদা দেখা দিতে পারে এবং চাহিদা দেখা দিলেই ব্যবসা আরম্ভ হতে পারে। সুতরাং রসপুর কলিকাতার প্রমাণও বেকার হয়ে গেল।

কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে রসপুর কলিকাতায় আগে কলিচুন তৈরি আরম্ভ হয়েছে তারপর গ্রামের নাম হয়েছে কলিকাতা, অর্থাৎ কলিচুন তৈরি হওয়ার জন্যই রসপুর কলিকাতার নাম হয়েছে 'কলিকাতা', তবুও ঐ প্রমাণের বলে শহর কলকাতার নাম সম্বন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। যা একটা জায়গায় সত্য হয়েছে তা অন্য জায়গায় যে সত্য নাও হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভোগদিয়া কলিকাতা। সেই গ্রামে কোনোদিন কলিচুন তৈরি হয় নি, অথচ তার নাম হয়েছে কলিকাতা। সুতরাং কলিচুন তৈরি হবার জন্য কলিকাতা নামের উৎপত্তি — সুনীতিবাবুর এই অনুমান বা প্রকল্প (hypothesis) একেবারেই নস্যাৎ হয়ে গেল। জানতে পারা গেল যে কলিচুন তৈরি না-হলেও কোনো স্থানের নাম 'কলিকাতা' হতে বাধা নেই। অর্থাৎ কলিচুন তৈরি হওয়ার সঙ্গে কলিকাতা নামের কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই।

১১. অনিলবাবু লিখেছেন : 'হাওড়ার কলিকাতা গ্রামে এখনও যেমন শামুকের খোলা পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হয়' (পৃ ৬৬) এবং পাদটীকায় লিখেছেন : 'পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে শামুকের খোলা পুড়িয়ে চুন তৈরির ব্যাপারটা যে কল্পকাহিনী বা ইদানীংকার ঘটনা নয়, আর এই চুনের ব্যবহারও এদেশে নতুন নয়, তার বহু প্রমাণ শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে দিয়েছেন।' (পৃ ৬৬-৬৭)। প্রথমত সুনীতিবাবু যখন তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন তখন তাঁর হাতে এক রসপুর কলিকাতার প্রমাণ ছাড়া শহর কলকাতার কাছে অন্য কোনো জায়গায় শামুক পুড়িয়ে কলিচুন তৈরি হতো তার প্রমাণ ছিল না। মাত্র রসপুর কলিকাতার প্রমাণেই তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, একটু আগেই আমি দেখালাম যে এক জায়গায় যা হয়েছে অন্য আর-এক জায়গায় যে তা হতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই।

তৃতীয়ত, শ্রীতারাপদ সাঁতরার সমস্ত বক্তব্য আমি আমার প্রত্যুত্তরে ১৯০১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সরকারি আদমসুমারীর রিপোর্ট উদ্ধৃত করে এবং অন্যান্য তথ্য দিয়ে খণ্ডন করেছি। অনিলবাবু হয় আমার সে উত্তর ভাল করে পড়েন নি, আর নয়, পড়েও গোল্ডস্মিথের 'উজোড় গাঁয়ের' গুরুমশায়ের মতো আচরণ করছেন, যিনি 'though vanquished, yet could argue still'.

১২. ১৮৯২ সালে 'বিশ্বকোষ'-এ কলিকাতা নামক প্রবন্ধের লেখক (আমি তাকে গৌরদাস বসাক বলে সনাক্ত করেছি) লিখেছিলেন : 'কলিচুন হইতে কলিকাতা নাম হওয়া নিতান্ত উষ্ণ মস্তিষ্কের কথা, এরূপ প্রলাপবাক্যে কর্ণপাত করা যাইতে পারে না।' এই মন্তব্যকে অনিলবাবু অশিষ্টজনোচিত অপভাষণ মনে করেন। দুঃখের বিষয় আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। গৌরদাস বসাক মশায় কোনো ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে ঐ মন্তব্য করেন নি। তাঁর সময়ে কারা কলিচুন থেকে কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তির সমর্থক বা প্রবক্তা ছিলেন এতদিন পরে জানবার উপায় নেই। তাঁরা যেই হোন আজ তাঁরা বিস্মৃতির গর্ভে সম্পূর্ণ লীন হয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত কেউ ছিলেন না নিশ্চয়। থাকলে তাঁর নাম সময়ের বেড়া পার হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছত। এই অজ্ঞাতনামা লোকেদের থিয়োরি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যদি বসাক মশায় ঐ মন্তব্য করে থাকেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে অপভাষণ বা অশিষ্টাচারের অভিযোগ আনা যায় না। এইমাত্র বলা চলে যে ঐ থিয়োরি তাঁর কাছে এতই অসম্ভব, অসার ও উদ্ভট (abusrd বা nonsense) মনে হয়েছে যে তিনি তার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস যাঁরা এ-মত পোষণ করেন তাঁরা ঠাণ্ডা মাথায় সবদিক বিবেচনা করে দেখলে ঐ মত কখনই পোষণ করতে পারতেন না। একথা নিশ্চয় তিনি ভাবতে পারেন নি যে তাঁর প্রবন্ধ লেখার ৪৬ বছর পরে এই বাংলা দেশে আর কেউ ঐ মত পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং ৭৭ বছর পরে পুনঃপ্রচার করবেন। আমার সঙ্গে কথাবার্তার সময় সুনীতিবাবু স্বীকার করেছিলেন যে ঐ প্রবন্ধ তাঁর পড়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি পড়েন নি। আমার বিশ্বাস সুনীতিবাবু যদি ঐ প্রবন্ধ পড়তেন তাহলে ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রবন্ধ তিনি লিখতেন না। তিনি বুঝতেন যে কলিচুন তৈরি হতো বলে এই শহরের নাম কলিকাতা — এই মতবাদের আবিষ্কারের গৌরবও তাঁর প্রাপ্য নয়। এই মতবাদ তাঁর জন্মের বহু পূর্ব থেকেই বাংলা দেশে চলে আসছে।

বস্তুত, হয় সুনীতিবাবুর সমীচীনতর ব্যুৎপত্তি দেওয়া উচিত ছিল, নয় যতদিন না সমীচীনতর ব্যুৎপত্তি দিতে পারছেন ততদিন প্রশ্নটিকে 'খোলা' বা 'অমীমাংসিত'ই রাখা উচিত ছিল। অমীমাংসিত রাখলে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। যদি অন্তত তিনশো বছর ধরে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে আসতে পারে, তাহলে আরও নয় কিছুকাল অমীমাংসিত থাকত। সেইটিই হতো বিজ্ঞের কাজ। *Hobson-Jobson*-এর প্রণেতা দুজনই ভাষার মহারথী। একজন আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি ইত্যাদি উত্তর-ভারতীয় ভাষার, অন্যজন সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষাসমূহের। এঁরা *Hobson-Jobson*-এ প্রত্যেক শব্দের প্রথমেই সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন। কিন্তু কলিকাতার বেলায় এই দুই মহারথীও অম্লানবদনে স্বীকার করেছেন :

'(Calcutta) is a name *of uncertain etymology.*'। একথা স্বীকার করতে তাঁদের কোনো লজ্জা হয় নি।

অনিলবাবুর অনুযোগ যে আমি শুধু সুনীতিবাবুর মত খণ্ডন করেছি, কিন্তু আমার নিজের মত প্রকাশ করি নি। আমি তাঁকে জানাতে চাই যে সুনীতিবাবুর ব্যুৎপত্তি প্রমাণসিদ্ধ কিনা তা বিচার করাই আমার কাজ ছিল। বিকল্প কোনো সমীচীনতর ব্যুৎপত্তি দেওয়া নয়। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে এই যে কলিচুনের সঙ্গে কলিকাতা নামের কোনো সম্বন্ধ নেই, যেমন ভোগদিয়া কলিকাতার। তাছাড়া কে ঠিক করবে কোন ব্যুৎপত্তি সমীচীনতর আর কোনটি নয়? এ-বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। একজন বা একদল পণ্ডিত যাকে সন্তোষজনক বা সমীচীন মনে করেন অন্যজন বা দল তা করেন না। কয়েকটি উদাহরণ দিই।

আশা করি সকলেই স্বীকার করেন শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। আমি যতদূর জানি তাঁর মত হচ্ছে কালীক্ষেত্র থেকে কলিকাতা নাম হয়েছে। কিন্তু সুনীতিবাবু কি এই মত সমীচীন মনে করবেন? বোধ হয় না। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ড. কালীকিঙ্কর দত্ত — এই তিনজন বাঘা বাঘা ঐতিহাসিক। এই তিনজন মিলে ভারতবর্ষের যে *Advanced History* লিখেছেন তাতে লেখা আছে : '... and in 1698 they (the English) were granted the Zamindari of the three villages of Sutanuti, *Kalikata (Kalighat = Calcutta) and* Govindpur on payment of etc.' (পৃ ৬৪০)। তাহলে জানা যাচ্ছে এই তিন মহারথী ঐতিহাসিকের মতে কালীঘাট থেকেই কলিকাতা ও Calcutta হয়েছে। এই ব্যুৎপত্তি তাঁদের কাছে সমীচীন মনে হয়েছে বলেই তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু সুনীতিবাবু এ-বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন : 'কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা আধুনিক-বাঙ্গালায় এইরূপ ধ্বনিপরিবর্তন ... অসম্ভব'। স্বর্গীয় ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ভাষা ও ইতিহাস দুই দিক থেকেই বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মতে 'কালীকোঠা' থেকে কলিকাতা হয়েছে। তাঁর কাছে এ-মত খুবই সমীচীন বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ তিনজন ঐতিহাসিক তো কালীঘাটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তাঁরা তো ড. বাগচীর মত মানবেন না। আর সুনীতিবাবুও কি মানবেন? বোধ হয় না।

আর-একটি মতের উল্লেখ করব। সেটা কার মত তা বলতে পারব না, তবে বাজারে কিছুটা চালু আছে। সেটা হচ্ছে এই। পোর্তুগিজেরা ভারতবর্ষে এসে প্রথমে কালিকটে (Calicut) নামে ও সেখানে কাপড়ের কুঠি তৈরি করে। কালিকটের কাপড়কে বলা হতো ক্যালিকা (calico)। এই কাপড়ের ইউরোপের বাজারে খুব আদর ও চাহিদা ছিল। মালয়ালী ভাষায় কালিকটের আসল নাম হচ্ছে Colicudu। পোর্তুগিজেরা এই শব্দটি কীভাবে লিখতেন বা উচ্চারণ করতেন জানি না। কিন্তু ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ Samuel Purchas (১৫৭৫-১৬২৬) তাঁর ডায়েরিতে কালিকট-কে Callicutta এইভাবে লেখেন। তারপর থেকে ইংরেজ ভ্রমণকারী ও বণিকদের মধ্যে কালিকটকে Callicutta বলা ও লেখা চল হয়ে যায়। ইংরেজরা যখন বাংলা দেশে এসে দেখল যে সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের মধ্যে Kulkuta বা Kulkutta নামে এক গ্রাম আছে, আর ঐ গ্রামের শেঠ বসাকেরা সুতি কাপড় তৈরি করে, তখন তারা ইউরোপের বাজারে এ পর্যন্ত অপরিচিত এই কাপড়কে Callicutta-র calico বলে চালাবার জন্য ঐ গ্রামের নাম দেয় Calcutta, যাতে করে ইউরোপের লোকেরা ধ্বনিসাদৃশ্যের জন্য মনে করে যে Callicutta

ও Calcutta একই স্থানের নাম। আর সেইজন্যই এই তিন গাঁ নিয়ে যে-শহর গড়ে উঠল, তার নাম গোবিন্দপুর হল না, সুতানুটিও হল না, হল Calcutta। জানি না সুনীতিবাবু ও অন্যান্য পণ্ডিত এই ব্যুৎপত্তি কতখানি সমীচীন মনে করবেন। এই ব্যুৎপত্তিগুলি আমার জানা থাকা সত্ত্বেও আমি আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করি নি এইজন্য যে ঐগুলি সবই আন্দাজ (speculation) মাত্র। নিঃসন্দেহ প্রমাণ কোনোটারই নেই।

১৩. রসপুর কলিকাতার মধ্যে হাইফেন ব্যবহারের সূত্রে আমি হাইফেন সম্বন্ধে যা বলেছি অনিলবাবু তার উপরও কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন হাইফেনের ব্যবহার সম্ভবত ইংরেজি থেকে এসেছে। সম্ভবত নয়, নিশ্চয়ই। যতি বা বিরামচিহ্নের ব্যবহার আমাদের দেশে ছিল না। ইংরেজি থেকে আমদানি হয়েছে। যেটা ইংরেজি ভাষা থেকে আমদানি হয়েছে সেটা ইংরেজি নিয়মেই ব্যবহার করা উচিত। ইংরেজিতে দুটি শব্দের মধ্যে হাইফেন দিলে দুটি শব্দ জুড়ে এক করা হয়। এটা যদি দ্বন্দ্ব সমাস হয় দ্বন্দ্ব সমাস বলতে পারেন। কিন্তু তৎপুরুষ কি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় কখনোই নয়। কারণ এরূপ সমাস ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞাত। চিহ্ন নেব বিদেশীদের কাছ থেকে আর ব্যবহার করব খুশিমতো আমাদের ভাষার নিয়মে তা হয় না, হওয়া উচিত নয়। অনিলবাবু বোধ হয় স্বীকার করবেন যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ভাষা এবং এই ভাষায় প্রচলিত হাইফেন-চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম অনেকের চেয়ে একটু বেশি ভালোভাবেই জানতেন। তিনি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনে এইরকম লিখেছেন :

> ভক্তপ্রসাদ। এই কি তোমার পাঁচি? ... তা' এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?
> ভগী। আজ্ঞে, খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী।
>
> —মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, পৃ ২৫৭-৫৮।

দেখা যাচ্ছে মাইকেল খানাকুল কৃষ্ণনগরের মধ্যে হাইফেন চিহ্ন বসান নি।

১৪. (ক) আমি পাথুরে চুন দিয়ে পান খাওয়া সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই তুলি নি। সুতরাং অনিলবাবু সে-সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অবান্তর।

(খ) 'শামুক-পোড়া চুন খেতে আপত্তি, অথচ শাঁখের চুন খেতে আপত্তি নয় কেন— এ প্রশ্নের উত্তর নেই। এটা ঘটনা, এই মাত্র বলা যেতে পারে। ... আচার বা সংস্কার কি সর্বক্ষেত্রেই যুক্তি মেনে চলে?' (পৃ ৬৮)।

শ্রীতারাপদ সাঁতরা শামুক-পোড়া চুনের পরিবর্তে শাঁক-পোড়া চুন খাবার কথা বলেছিলেন। তাই তাঁকে আমি প্রশ্নটি করেছিলাম। উত্তর তারাপদবাবুর দেবার কথা। প্রশ্নটিকে অনিলবাবু নিজের গায়ে মেখে নিলেন কেন? আর যে-উত্তর তিনি দিলেন সেটা উত্তরই হল না। উত্তর হবে এই : যে দেশে যেটা সুলভ সেই দেশের লোকে সেটাই ব্যবহার করে। যেখানে শামুক-পোড়া চুন ছাড়া অন্য চুন পাওয়া যায় না, সেখানে লোকেরা শামুক-পোড়া চুনই ব্যবহার করে। আর এই চুন ব্যবহার করাই কালক্রমে সংস্কার বা সদাচারে দাঁড়ায়। যেখানে পাথুরে চুন সহজলভ্য, অন্য চুন তা নয়, সেখানে লোকে পাথুরে চুনই ব্যবহার করে থাকে এবং সেই চুন ব্যবহার করাই সদাচার বলে বিবেচিত হয়। শাঁখের চুন সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

(গ) হিন্দুর কাছে গোরুর চামড়া অপবিত্র এবং বাঘ ও হরিণের চামড়া পবিত্র হবার কারণ খুবই সহজ। হিন্দুর চোখে জীবন্ত গোরুর সব কিছুই, মায় গোময় ও গোমূত্র, পবিত্র এবং
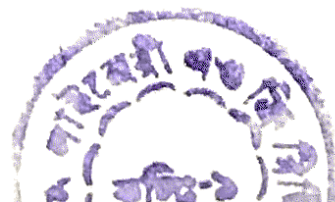
সেই কারণেই মৃত গোরুর শুধু চামড়া নয়, চামড়া, হাড়, মাংস, রক্ত সবকিছুই অপবিত্র। এই পবিত্র ও অপবিত্র বোধের একই উদ্দেশ্য — গোহত্যা নিবারণ বা নিষেধ। এই নিষেধকে ইংরেজিতে taboo ও আরবিতে 'হারাম' বলে। পবিত্র ও অপবিত্র দুই জিনিসই নিষিদ্ধ হতে পারে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানের অন্তঃপুরকে হারাম (ইং harem) বলা হয়, কেননা তা পবিত্র এবং সেই কারণেই বহিরাগতের নিষিদ্ধ। শুয়ারও মুসলমানদের চোখে হারাম, কেননা তা অপবিত্র। তাই 'হারামজাদা' গালাগালি। taboo প্রায় totem-এর সঙ্গে জড়িত থাকে। পাশ্চাত্যদেশে ট্যাবু ও টোটেম নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। বাঘ ও হরিণ শিকার করা হয় এই দুটি প্রাণীর চিত্রবিচিত্র, সুতরাং লোভনীয়, চামড়ার জন্য। সেই কারণে এদের চামড়া অপবিত্র নয়। তাছাড়া বাঘ হিংস্র জন্তু এবং মানুষ ও গৃহপালিত পশুর শত্রু। তাই বাঘ মারলে কোনো দোষ হয় না।

(ঘ) 'আচার বা সংস্কার কি সর্বক্ষেত্রেই যুক্তি মেনে চলে?' — এই প্রশ্ন করবার সময়ে বা পূর্বে অনিলবাবুর কি একবারও মনে পড়ল না যে তিনিই-না বলেছেন যে প্রত্যেক নামের পিছনে যুক্তি ও কারণ আছে? শুধু নামের পিছনেই যুক্তি থাকতে পারে, আচারের পিছনে যুক্তি থাকতে নেই? ভাষা নিয়েও যেমন একটা শাস্ত্র আছে — ভাষাতত্ত্ব, তেমনি আচার-অনুষ্ঠান নিয়েও একটা শাস্ত্র আছে — তার নাম সমাজবিজ্ঞান। এই শাস্ত্রও দাবি করে যে আচার-অনুষ্ঠানগুলি অহেতুক ও অযৌক্তিক নয়।

১৫. (ক) উক্তিটি অশিষ্টোচিত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। ও-কথা বলার প্রয়োজন হতো না যদি না শ্রীতারাপদ সাঁতরা লিখতেন : 'সত্যনিষ্ঠাই গবেষকের ধর্ম — এই কর্তব্যের টানেই আমাকে এই বাদ-প্রতিবাদে রত হতে হয়েছে।' একথা মুখে বলে কার্যত তিনি নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন নি। তাই আমি ও-কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। তিনি ও-কথা না-বললে আমিও বলতাম না।

(খ) হাওড়া জেলার ব্যক্তিবিশেষের অপকর্ম দেখে সমস্ত হাওড়াবাসীর উপরই আমি চটে গিয়েছি এবং আত্মবিস্মৃত হয়েছি এটা অনিলবাবুর ভুল ধারণা। হাওড়া জেলার ব্যক্তিবিশেষটি কে ও তিনি কী অপকর্ম করলেন বুঝলাম না। তবে আমি যে রসপুর কলিকাতায় গিয়েছি একজন হাওড়াবাসী তা বিশ্বাস করেন নি। ঐ গ্রামের আমি যে বিবরণ দিয়েছি তাকে তিনি 'কল্পনার পক্ষবিস্তার' বলেছেন। আর একজন হাওড়াবাসী আমার বিবরণকে অসম্ভব বা অবাস্তব বলেছেন। তাই হাওড়া জেলাবাসীর এই দুই মুখপাত্রকে লক্ষ্য করেই আমি এ-মন্তব্য করেছি। এটুকুও বোঝবার ক্ষমতা অনিলবাবুর নেই দেখে আশ্চর্য হয়েছি।

৬ কার্তিক লাহিড়ী

রাধারমণ মিত্র-র 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি পড়ে আমার মতো অনেক পাঠক উপকৃত হয়েছেন নিঃসন্দেহে। 'কলকাতা' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' গ্রন্থে একটি ভিন্ন মত উত্থাপিত হয়েছে। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' ফারসি ভাষায় লেখা বাংলা দেশের ইতিহাস। সম্ভবত ১৭৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকটি লেখা শেষ হয়। গ্রন্থকার মালদহ নিবাসী ছিলেন। তাঁর নাম গোলাম হোসেন। তিনি নামের শেষে 'সালেম' বা 'সালেমী' উপাধি গ্রহণ করেন। গ্রন্থটি মূল্যবান এই কারণে যে, এই গ্রন্থে মুসলমান শাসনের সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া

হয়েছে, দ্বিতীয়ত চার্লস স্টুয়ার্ট পুস্তকটি থেকে তাঁর 'হিসট্রি অব বেঙ্গল' রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সন ১৩১২-তে 'রিয়াজ-উস-সালাতিন'-এর সটীক বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। গ্রন্থটি দুভাগে বিভক্ত, প্রধান অংশের নাম 'উদ্যান-তোরণ', দ্বিতীয় অংশের নাম 'উদ্যান'।

কলকাতা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে গোলাম হোসেন সালেমী লিখেছেন — 'পূর্ব্বে কলিকাতা একটি সামান্য পল্লী মাত্র ছিল। তথায় কালীমূর্ত্তি স্থাপিত ছিলেন। তাঁহার পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ঐস্থানের আয় নির্ধারিত ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় কর্ত্তা শব্দের অর্থ প্রভু এজন্য ঐ স্থানকে লোকে কালীকর্ত্তা নামে অভিহিত করিত। কিন্তু ক্রমশ উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইয়া উহা এক্ষণ কলিকাতা নামে পরিণত হইয়াছে।' (উদ্যান-তোরণ, তৃতীয় বিভাগ, পৃ ২৪)।

মনে হয় সংবাদটি 'কলকাতা' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের নতুন করে ভাবাবে।

বক্তব্য প্রসঙ্গে

'রিয়াজ-উস-সালাতিন'-এর লেখকের যে-পরিচয় কার্তিকবাবু দিয়েছেন তার উপর আমি কিছু যোগ করছি। আমি যতদূর জানি ঐ পুস্তকের লেখকের উপাধি 'সালেম' বা 'সালেমী' ছিল না, ছিল 'সেলিম'। তাঁর পুরো নামটি হচ্ছে গোলাম হোসেন সেলিম জায়েদপুরী। তিনি অযোধ্যা প্রদেশের জায়েদপুর থেকে বাংলা দেশে এসে মালদহে বাস করেন। মালদহে তখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরাজকুঠির Resident ছিলেন জর্জ উড্‌নি। গোলাম হোসেন উড্‌নি সাহেবের ডাক মুন্‌সি (পোস্টমাস্টার) ছিলেন। উড্‌নি সাহেবের আদেশে ইংরেজি ১৭৮৬ সালে তিনি 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' রচনা করেন।

কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে গোলাম হোসেন সেলিম যে-মত প্রকাশ করেছেন অবিকল সেই মত আর-একজন মুসলমান ঐতিহাসিকও প্রকাশ করেছেন। সেই ঐতিহাসিকের নাম নবাব মহব্বৎ খাঁ। তিনি *A General History of India from the time of the Ghaznivides to the accession of Mahammad Akbar at the close of the year 1806* এই নামে (অবশ্য ইংরেজি ভাষায় নয়, পারসিক ভাষায়) একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি লিখেছেন : 'Calcutta formerly was only a village, the revenue of which was assigned for the expenses of the temple of Kali, which stands there.' (ইলিয়টের ইংরেজি অনুবাদ)।

গোলাম হোসেন সেলিম ও নবাব মহব্বৎ খাঁ দুজন মুসলমান ঐতিহাসিকেরই মত এক। দুজনেই হিন্দুদেবী কালীর সঙ্গে কলিকাতা গ্রামের (অতএব শহরের) সম্বন্ধ স্থাপন করতে চান। হিন্দু জনসাধারণও সেই সম্বন্ধ বরাবর স্বীকার করে এসেছেন। তাঁরা কালীদেবীকেই কলিকাতা শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মেনে এসেছেন। আগে যখন রাত্রে কলকাতায় কেল্লা থেকে তোপধ্বনি হতো তখন বাঙালি হিন্দুরা 'বোম্ কালী', আর হিন্দুস্থানীরা 'বোম্ কালী কালকাত্তা-ওয়ালী' বলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠতেন। কিন্তু আধুনিক বাঙালি হিন্দু পণ্ডিতগণ কালীমাতার সঙ্গে কলিকাতার সম্বন্ধ নানা কারণে মানতে চান না। এই দুই মুসলমান ঐতিহাসিকের মত আমার জানা থাকা সত্ত্বেও আমি আমার প্রবন্ধে তার উল্লেখ করি নি। কেননা উক্তি দুটি কিংবদন্তিমূলক, যাথার্থ্য প্রমাণ করবার উপায় নেই।

র চ না প্র স ঙ্গ

কলকাতার বাড়ি, বাগান ও বাগানবাড়ি

এক্ষণ, ১৪ : ৩-৪, শারদীয় ১৩৮৭

কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়

বিভাব, শারদীয় ১৩৮৪। প্রবন্ধটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত হয়। প্রস্তাবিত স্মারকগ্রন্থটির পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলে রচনাটি 'বিভাব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ সালে কলকাতা : জি. এ. ই. পাবলিশার্স প্রকাশিত 'বাংলার তিন মনীষী' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থের উৎসর্গ-এ রাধারমণ মিত্র জানিয়েছিলেন : আমার মাতুল ও পালকপিতা যাঁর অনাড়ম্বর ভোগবিলাসহীন কঠোর আদর্শজীবন আমার জীবনকে বহুল পরিমাণে গঠিত করেছে, যিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে (১৯১৩ সাল) ইহলোক ত্যাগ করেছেন, যাঁর জন্ম হয়েছিল পরের উপকার করার জন্যই, আমি আজ যা কিছু হয়েছি একমাত্র যাঁর কৃপাতেই হয়েছি, এই সংসারে যাঁর নাম কেউ কখনও শোনেনি সেই নিঃস্বার্থ মহান কর্মবীর ললিতমোহন নাগচৌধুরীর শ্রীপাদপদ্মে দীন হীনের এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্য নিবেদন করলাম।

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর

কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস, ১৯৭৭। বিচিত্র-বিদ্যা-গ্রন্থমালা : ৭ সংখ্যক পুস্তিকা। ভূমিকা থেকে জানা যায়, 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সার্ধ-জন্মশতবর্ষ পূর্তি স্মারকগ্রন্থের জন্যে রচিত হয়, পরিকল্পনাটি পরে কার্যকরী না-হওয়ায় "ঐতিহাসিক" পত্রিকার দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়'। প্রবন্ধ দুটির গ্রন্থরূপ পুস্তিকাটি।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

পরিচয়, ১৫ : ১ : ২, ভাদ্র ১৩৫২। 'রাধারমণ মিত্রর প্রবন্ধ ১' আকাদেমিয়া প্রকাশিত সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

লালবিহারী দে

'বাংলার তিন মনীষী' সংকলনে রচনাটি সম্পর্কে লেখক জানিয়েছিলেন, লালবিহারীর জন্মভিটা বর্ধমানের সোনাপলাশি গ্রামে ১৯৫২ সালে আয়োজিত লালবিহারী দে-র 'সর্বপ্রথম স্মৃতিসভায়' পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনের মধ্যে ছিলেন মুরমুন (বর্ধমান) গ্রামের জাহেদ আলি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড জন কেলাস, চলচ্চিত্র পরিচালক নিমাই ঘোষ। রচনাটি বর্ধমান থেকে প্রকাশিত 'নতুন পত্রিকা'-র শারদীয় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হলে দেখা যায় মুদ্রণ প্রমাদ আছে। পরে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হয়ে 'বিভাব' পত্রিকার বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৮-তে মুদ্রিত হয়।

হরিনাথ দে

বিভাব, বৈশাখ, ১৩৮৫। সংশোধিত হয়ে 'বাংলার তিন মনীষী' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

David Hare

কলকাতা : মনীষা গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮।

'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এক্ষণ, ৭ : ৬, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৬
সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত সূত্র। স্বাক্ষরিত তারিখ ১৩. ৪. ১৯৭০
কার্তিক লাহিড়ী, পূর্বোক্ত সূত্র।
তারাপদ সাঁতরা, পূর্বোক্ত সূত্র। স্বাক্ষরিত তারিখ ৬. ৪. ১৯৭০
পাঁচুগোপাল রায়, এক্ষণ, ৮ : ৫ ; পৌষ-মাঘ ১৩৭৭। স্বাক্ষরিত তারিখ ১৫. ১১. ১৯৭০
অনিলকুমার কাঞ্জিলাল, পূর্বোক্ত সূত্র। স্বাক্ষরিত তারিখ ২১. ২. ৭১
লেখকের প্রত্যুত্তর উল্লিখিত সংখ্যা দুটিতেই প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য অকাদেমি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সুধা বসু পুরস্কার-প্রাপ্ত এই গ্রন্থের লেখক রাধারমণ মিত্রের
জন্ম গত শতাব্দীতে, মৃত্যু ১৯৯২-এ।
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার গৌরবময় অধ্যায়ের অন্যতম নায়ক,
এদেশের এককালের মার্কসবাদী চেতনার সম্প্রসারণে সক্রিয়,
শ্রমিক ও যুব আন্দোলনের অগ্রপথিক এবং বাগ্মী।
কলকাতা শহর নিয়ে তাঁর গবেষণা প্রায় চার দশকের। এই শহর
তাঁর নখদর্পণে ; তিনি নিজেই এক সমকালীন কিংবদন্তি।
বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর বহু বছরের একাগ্র শ্রম ও মননের
একটি অধ্যায় মাত্র। প্রচলিত গবেষণার যান্ত্রিক ছকের
বাইরে ও মনগড়া সব উপাখ্যান তছনছ করে এই
লেখক প্রথম কলকাতার সত্যিকার ইতিহাস রচনার পথ
দেখালেন। বইটি গড়ে উঠেছে লেখকের নিজস্ব জিজ্ঞাসায়,
সরেজমিন তদন্তে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত এই
গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হল কলকাতার বাড়ি,
বাগান ও বাগানবাড়ি, কলিকাতায় রামমোহন, কলিকাতায় বিদ্যাসাগর,
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, লালবিহারী দে, হরিনাথ দে রচনাগুলি এবং
David Hare (ইংরেজী) প্রবন্ধটি। সেই সঙ্গে 'কলিকাতা' নামের
ব্যুৎপত্তি নিয়ে আরও কিছু বিতর্ক ও চিঠিপত্র। বাংলাসাহিত্যে
বইটি অনন্য।

ISBN-81-86263-48-9

9 788186 263488 >

ইতিহাস / কলকাতা
দাম ১৬০ টাকা

সুবর্ণরেখা